কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

সমগ্র জগদ্ব্যাপী এক বিবাট আন্দোলন উপস্থিত। সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য অভিজাত এবং আভিজাত্যের কেন্দ্র নগব হইতে সভ্যতাকে পতিত, নিবন্ন কৃষক শ্রমজীবীব পল্লী-কুটিরে প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য দেশে এই নব গণ-বিগ্রহের সর্ব্বপ্রথম পুরোহিত হার্ডার এই দেবতার পূজা-পদ্ধতি প্রকাশ কবিলেন। সেই চৈতন্যকে অধিক উপলব্ধি করাইবার জন্য সীলাব তাঁহাব নাট্য-পুরাণেব সৃষ্টি করিলেন। হার্ডেন সেই দেবতার প্রচাব করিলেন যে পাশ্চাত্য 'ব্যক্তি সর্ব্বস্বতা' এবং প্রাচ্য 'সমূহজ্ঞানের' সমবায় না হইলে রুশিয়ার উন্নতি অসম্ভব এবং সেই উন্নতিকে অসংখ্য স্বাভাবিক এবং স্বাধীন পল্লীসমাজেব বিকাশ তথা প্রাণশক্তির উপর প্রতিষ্ঠা কবিতে হইবে। পুস্‌কিনেব ভাবোন্মত্ততা, তুর্গনিভের 'অতিমাত্র শিল্প ও সার্ব্বজনীনত্বকে' অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে টলষ্টয়ের অভূতপূর্ব্ব দবিদ্রপ্রেম, ডষ্টয়ভেস্কির হীনতা এবং পাপের মধ্যেও বিশুদ্ধ আত্মত্যাগ।

* * *

কিন্তু ভারতবর্ষে সেই গণচৈতন্য উপাসনার আদিগুরু আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ। তিনিই প্রথম তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টি সহায়ে আবিষ্কার করিয়াছেন যে ভাবতের উচ্চবর্ণেরা মৃত, নীচবর্ণেরাই যথার্থ জীবিত। কেন?—না এই অভিজাত সম্প্রদায়েব আব নূতনত্ব জ্ঞান আদৌ নাই। এই নূতনত্ব হীনতাই প্রকৃতির নিয়মে মৃত্যুর চিহ্ন। এক রকমের চাল চলন পোষাক, ধর্ম্মে স্বাধীনতা নাই, জীবনে তাহার কার্য্যকারিতা

নাই, নূতন আবিষ্ক্রিয়া নাই, কেবল গ্রামফোনের মত কথার কচ্‌কচি, যন্ত্রের মত প্রাণ হীন, প্রতি বিষয়ে শব্দ প্রমাণ কেবল "যেনাস্য পিতরো জাতাঃ'—আর এর ফল পর্য্যুসিত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

* * *

যেখানে প্রাণ, চৈতন্য যেখানে মূর্ত্ত, সেই গণবিগ্রহের স্তুতি—যা আচার্য্য বিবেকানন্দ ভারত-ভারতীকে শুনাইয়াছেন তাহা আজ আমরা উদ্বোধন পাঠকের নিকট উপহার প্রদান করিব। "আর্য্য বাবাগণের জাঁকই কর. প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন আমরা "ডম্‌ম্‌ম্‌" বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশহাজার বছরের মমি" যাদের 'চলমান শ্মশান" বলে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন। ভারতে যা কিছু বর্ত্তমান জীবন আছে, উহা তাদেরই মধ্যে, আর 'চলমান শ্মশান" হচ্চ তোমরা—তোমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার মিউসিয়ম, তোমাদের আচার, ব্যবহার, চাল, চলন দেখলেও বোধ হয়, যেন ঠান্‌দিদির মুখে গল্প শুন্‌ছি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু মরীচিকা, তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল, লঙ্‌ লুঙ্‌ লিট সব এক সঙ্গে। বর্ত্তমান কালে, তোমাদের দেখ্‌ছি বলে, যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতা জনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ লোপ লুপ্‌। স্বপ্ন রাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরি কচ্ছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্ত মাংস হীন কঙ্কাল কুল তোমরা, কেন শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হুঁ তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব্ব পুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্ব্বকালের অনেকগুলি রত্ন পেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই, এখন ইংরাজ রাজ্যে অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার

কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে। বেরুক মুদির দোকানে থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে; নীরবে সয়েছে, তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা একমুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্‌টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধর্‌বে না, এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম॥ অতীতের কঙ্কালচয়!—এই সাম্‌নে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্ন পেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি,—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অম্‌নি শুন্‌বে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি "ওয়াহ গুরু কি ফতে।"

* * *

ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবন কোথা হইতে আসিবে তাহা আচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া, ভারতের ছোট জাত কেন পূজার্হ আচার্য্য তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন—"ঐ যারা চাষা-ভূষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোট-জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ কোরে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রম ফলও তারা পাচ্ছে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্ত্তন হয়ে যাচ্ছে। দেশ সভ্যতা, প্রাধান্য, ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমরা নীরব, অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকজান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের

ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য! আর তুমি, কে ভাবে এ কথা। স্বামীজি! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি? তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্ম্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি, নির্ভীক কার্য্যকারিতা। আমাদের গরীবরা যে ঘর দুয়ারে দিন রাত মুখ বুজে কর্ত্তব্য কোরে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কায হাতে এলে অনেকেই বীর হয়। ১০ হাজার লোকের বাহবার সামনে, কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজ্ঞাতেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা, ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি! তোমাদের প্রণাম করি।"

* * *

গরীবদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি—এই কথাটি স্বামীজি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন—"গরীব নিম্ন জাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইউরোপ উঠ্তে লাগলো। রাশি রাশি, অন্য দেশের, আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড! বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী, এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝ্লে বা না বুঝ্লে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে, কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভা মাত্র, দেশের বাহার! কোটী কোটী গরীব নীচ যারা তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না, কায়-মন-বাক্যে যদি এক হয়। একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে, এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিষ যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে,

সে জিনিষ প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ, বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি।"

* * *

তাই আচার্য্য রুদ্র বিষাণের গভীরনাদে জড়নিদ্রা পরিহারের জন্য ব্যাকুলকণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন—"ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটি মাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারানসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

(২)

মানুষ দুঃখ চায় না—চায় সুখ। কারণ সুখ জিনিষটা মানুষের স্বরূপ লক্ষণ, তাকে না আকাঙ্ক্ষা করে সে থাকতেই পারে না। অমৃতের সন্তান অমৃতকেই চায়, এ তার জন্মগত স্বত্ব। মরণকে উপেক্ষা করে সে অমর সুখের সন্ধানে ছুটচে, কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই মরণই তার সাম্নে এসে দাঁড়াচ্চে। সে যত্ন করে সংসার কাননে ঘুরে ঘুরে একটী সুখ-কুসুম হয়ত চয়ন কল্লে অমনি মরণ এসে সে কুসুম ছিন্ন করে তার হাতে তুলে দিলে দুঃখের ফল। বিজলী যেমন দমক দিয়ে দিশেহারা পথিকের চক্ষে নিবিড়তর তিমির আনে, তেমনি সংসারের এই ক্ষণিক সুখ মানুষের জীবনটাকে দুঃখতর করে তোলে।

* * *

অনন্ত সত্তা হচ্চেন অনন্ত সুখ স্বরূপ। সেই অনন্ত সুখকে আমরা পেতে চাচ্চি ইন্দ্রিয়ের সসীমতার মধ্য দিয়ে। সসীমতার মধ্য দিয়ে সেই সুখ চাচ্চি বলে, যে সুখ আমরা পাই, তা ফুরিয়ে যায়। ফুরিয়ে যাওয়া মানে সেই প্রিয় বস্তুর অভাব হওয়া। এই অভাব বোধের নামই

দুঃখ। কিন্তু দুঃখকে আমরা চাই না কেন, আর সুখকেই আমরা চাই কেন? তার কারণ মানুষের স্বভাব হচ্চে নিজের "আমি"টাকে সর্ব্বদা অনুভব করা, জাগিয়ে রাখা। ফল বল, ফুল বল, চন্দ্র বল, সূর্য্য বল, আকাশ বল, প্রাণ বল, এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত এই আমার 'আমি'টাকে নিয়ে। আমি না থাক্‌লে কিছুই থাকে না—সে থাকার প্রয়োজন কি?

* * *

এখন এই আমির প্রকৃত স্বরূপ হচ্চে অসীম সুখ। আর সেই সুখ যখন অসীম তখন তার সত্তাও অনাদি অনন্ত। তাই মানুষ চায় অনন্ত জীবন। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল দেশকাল নিমিত্তে নিজের আমিত্ব আরোপ করে সে লক্ষ বার মরণকেই ভ্রমে জড়িয়ে ধর্‌চে, তার অনন্ত জীবনের অভাব হচ্চে আর আস্‌চে তার পরিবর্ত্তে দুঃখ। আবার যার সত্তা হ'ল অসীম, তার জ্ঞানও হ'ল অসীম। তা না হলে নিজ সত্তা জ্ঞানের অভাবে সে শূন্য। সে যত বড় তার জ্ঞানও তত বড়। এই 'আমি'র অনন্ত সত্তাজ্ঞান প্রতিরুদ্ধ হয়ে অভাব এসে তাকে দুঃখ দিয়ে যাচ্চে। জানাতেই মানুষের আনন্দ। সে চায় তার জ্ঞান অপ্রতিহত হ'ক, সে অনন্ত সুখ লাভ করুক কিন্তু গণ্ডির মধ্যে সে নিজেকে রেখেছে বলে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক এসে তার সাম্‌নে সসীমতার অসংখ্য প্রাচীর সাজিয়ে তার অনন্ত সুখের অন্তরায় হয়ে রয়েছে—ফলে সেই একই অভাব ও দুঃখ।

* * *

মানুষ দুঃখকে ঘৃণা করে, কিন্তু দুঃখ যে কানে কানে সর্ব্বদা তার একটা উপদেশ দিয়ে যাচ্চে সেটা বধির মানুষ শুন্‌তে চায় না। দুঃখ বলে—ওরে মানুষ আমি আসি তোর অন্তরের বস্তু জাগাবার জন্য, তোর গণ্ডি ভেঙ্গে দেবার জন্য। চোক কানের সসীম সুখের মধ্যে তুই আপনাকে বদ্ধ কর্‌তে চাস্, আমি তাই তোর চির সাথী হয়ে সেই সান্ত সুখের অন্তরায় হয়ে ফিরি। আমি কেবল আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জানিয়ে দিই 'ও তোর স্বরূপ নয়, তুই যে অনন্ত সুখের অধিকারী, অল্পে ত সুখ নাই, যা অল্প তা মর্ত্ত্য। তুই কেবল না বুঝে চোখের জল ফেলিস্। যত দিন

তুই আমায় ঘৃণা করবি তত দিন আমার স্পর্শ কেবল তোকে যাতনা দিয়ে যাবে, মরণের সাগরজলে তোকে ডোবাবে আর তুল্‌বে।'

* * *

'কিন্তু কেমন করে তোমায় ঘৃণা না করে পারি! তুমি যে আমার স্বরূপের অভাব থেকে ওঠো, তোমায় আমি কি করে চাইতে পারি?' দুঃখ বলে—ঐ 'ভাব' আর 'অভাব' দুটো রেখা টেনে তুই নিজের সুখের অন্তরায় হয়েছিস্। যখন ভাব আর অভাব হবে তোর সমান, তখন তোর যথার্থ স্বরূপ উঠ্‌বে ফুটে; একবার আমায় ঘৃণা না করে ভালবেসে দেখ্, আমার তাপে পুড়্‌লে, আমার আগুনে জ্বললে, আমার ঘর্ষণের স্পর্শ পেলে 'ধূপ' কেমন গন্ধ দেয়, 'প্রদীপ' কেমন আলো করে, চন্দন কেমন অমৃত হয়। সাপ ভূমির উপর বুকে হেঁটে চলে কিন্তু যখন আঘাত পায় তখন গর্জ্জে শির তুলে দাঁড়ায়। মেঘে জল থাক্‌লে ফল কি? কিন্তু যাই বিদ্যুৎ গিয়ে মেঘের বুক ছিঁড়ে দেয় তখন তার ধারায় হয় জগৎ তৃপ্ত।'

* * *

ওগো দুঃখ শিক্ষা গুরু
মোক্ষ পথ দেও দেখায়ে,
রুদ্র স্পর্শে মুক্ত কর
সুখ আবরণ সরায়ে।
হৃদয় লৌহ তন্ত্রী নীরব
বাজেনা পরশ কোমলে
যাতনা কঠোর তীব্র তালে
বাজাও আঘাতি সবলে।
ঋতু বসন্ত সুখ নগরীর
শীতের তোরণ তুমি হে
অখিল রাজ মন্দির দ্বারে
তাপস তাপ রূপেতে হে।

———

অদ্বৈতবাদ ও ব্যবহারিক প্রামাণ্য।*

(অধ্যাপক—শ্রীসুধেন্দুকুমার দাস এম, এ।)

"Every attempt to solve the laws of causation, time and space, would be futile, because the very attempt would have to be made by taking for granted the existence of these three. What does the statement of the existence of the world mean then? "This world has no existence." What is meant by that? It means it has no *absolute existence*. It exists only in relation to my mind, to your mind, and to the mind of everyone else. We see this world with the five senses, but if we had another sense, it would appear as something still different. It has, therefore, no real existence; it has no unchangeable, immoveable, infinite existence. Nor can it be called *non-existence*, seeing that it exists, and we have to work in *and through it*. It is a mixture, of existence and non-existence." (Maya and Illusion.)

"This State of things has been called Maya. It has neither existence nor non-existence. You cannot call it existence, because that only exists which is beyond time and space, which is self-existent. Yet this world satisfies to a certain degree our idea of existence. Therefore it has an apparent existence.—" (Hints on Practical Spirituality.) Swami Vivekananda.

কি প্রকার জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যই বিশ্বমানবের এই মহা জীবনযাত্রার পথে চলিয়াছে তাহার প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখা যায় মনুষ্য মাত্রেই আপনাকে জ্ঞানের আশ্রয়রূপে কর্ত্তা (প্রমাতা), তাহা ভিন্ন অন্যান্য যত বস্তু তাহাদিগকে জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় (প্রমেয়)—এই দুই প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব করিয়া দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের নানা প্রকার সংগ্রামের ভিতর

* ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে, আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের উনষষ্টীতম জন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত।

দিয়া যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ভেদে পরিপূর্ণ এই দ্বৈতমূলক জ্ঞান যে কতদূর যথার্থ ও কতকাল স্থায়ী তাহা এক শ্রেণীর মনুষ্য বিশেষ গভীররূপে অনুসন্ধান না করিয়া ইহাকেই জীবনে চিরন্তন সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লয়।

আর এক শ্রেণীর অসাধারণ লোক আছেন যাঁহারা এইভাবে পূর্ব্বোক্ত অন্ধ বিশ্বাসের বশে পরিচালিত হইয়া জ্ঞাতাজ্ঞেয়রূপে বিভক্ত প্রত্যক্ষাদি দ্বৈতমূলক জ্ঞানকে চিরস্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয় সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা এই প্রাত্যহিক জীবনের নিয়ামক ভেদাবগাহিজ্ঞান কতদূর সত্য ও তাহার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ শাশ্বত সত্য কতদূর প্রকাশ পাইতেছেন তাহা সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া পূর্ণ সত্যের চিরন্তন তত্ত্ব বিশ্বের নিখিল মানবের সমক্ষে স্পষ্টবাক্যে ঘোষণা করেন। অদ্বৈতবাদের পূর্ণাবতার পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্কর এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। আর আধুনিক যুগে আমাদের নিতান্ত অন্তরতম সুহৃদ্ ও পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ যাঁহার বীরবাণীর মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া আমরা আজ এই পবিত্র স্থানে পরস্পরের শত প্রকার মত বৈচিত্র্যসত্ত্বেও সমবেত হইয়াছি তিনিও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অসাধারণ পুরুষ।

কেবল বিভিন্নতা এই যে আচার্য্য শঙ্কর প্রসন্নগম্ভীর সংস্কৃত বাণীর সহায়তায় কেবলমাত্র ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্বিধাহীন, সঙ্কোচহীন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড প্লাবিত ভারতের বিরাট জনসংঘের মধ্যে যে তত্ত্বের বীজ বপন করিবার প্রবল উদ্যম করিয়াছিলেন সেই মধুর হইতে মধুরতম তত্ত্বই বর্ত্তমান যুগের ভারতের বৈদান্তিযতিশ্রেষ্ঠ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ভারত হইতে সুদূর আমেরিকা ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্রাজকের বেশে সিংহবিক্রমে আধুনিক বিজ্ঞানের জড়বাদ প্লাবিত জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত বিধ্বস্ত নিখিল নরনারীর হৃদয়ে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য অগ্নিময়ী তীব্র ভাষায় দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিবার জন্য জীবনব্যাপী বিপুল চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের অগ্রণী স্বামী বিবেকানন্দ জগৎতত্ত্ব কিরূপে বুঝিয়াছিলেন

এবং কি প্রকারে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শিরোভাগে তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রবন্ধ শেষে তাঁহারই কথার পুনরুল্লেখ করিয়া স্পষ্টতর করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিব। বস্তুতঃ স্বামীজি পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের চরণ-প্রান্তে শিষ্যরূপে শিক্ষালাভ করিয়া জীবনের উপলব্ধ পরীক্ষিত সত্য তত্ত্ব দার্শনিক পরিভাষা পরিবেষ্ঠিত যুক্তির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন সেই তত্ত্বই দার্শনিকভাবে আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁহার পদাঙ্কানুসারী পরবর্ত্তী অদ্বৈতাচার্য্যগণ দার্শনিক যুক্তি পরম্পরা দ্বারা কি ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন তাহা দেখানই এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাংসারিক জীবনের যে সাধারণ জ্ঞানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে সেই ভেদাবলম্বি জ্ঞানকেই (ordinary facts of consciousness) ভিত্তি করিয়া আচার্য্য শঙ্কর অপূর্ব্ব বিচার নৈপুণ্য সাহায্যে পূর্ণ অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপ অতি প্রাঞ্জলভাবে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

রূপরস-গন্ধাদি মনোরম পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা এই বিপুলা বৈচিত্র্যশালিনী ধরিত্রী দেবী যখন প্রত্যক্ষ ও তদাশ্রিত অন্যান্য প্রমাণের দ্বার দিয়া মানবের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হন তখন সে মনে করে যে ধরিত্রীর এই রূপই বুঝি অপরিবর্ত্তনীয় সত্য এবং ইহাকে অতিক্রম করিয়া আর কোন তত্ত্বের মধুর উৎস বিদ্যমান নাই। সুতরাং মানব এই দ্বৈতমূলক সংসারাবস্থার জ্ঞানকেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞাতব্য তত্ত্বরূপে ধারণা করে। তখন সেই আত্মকৃত দ্বৈতের কল্পিত দুর্ভেদ্য দুর্গে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও প্রতিষ্ঠিত মনে করিতে তাহার আর কিছুমাত্র দ্বিধা থাকে না।

তাহার পর যখন অদ্বৈতবাদের প্রবল যুক্তিরূপ বজ্রনিনাদী আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে তাহার এত সাধের অসার দুর্গ চূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্রধূলিকণার মত বিলীন হইবার উপক্রম হয় এবং মোহ-স্বপ্নে বিঘ্ন আসিয়া দেখা দেয় তখন সে ব্যস্ত হইয়া স্বীয় দ্বৈতজ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার

জন্য নানাপ্রকার অসার বিরুদ্ধতর্কের অবতারণা করে। কিন্তু তাহার সেই সকল অন্তঃসার শূন্য যুক্তিসমূহ প্রতিপক্ষের দৃঢ় যুক্তির প্রবল বন্যায় ক্ষুদ্রতৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায়। অদ্বৈতবাদ শ্রুতিমূলক যুক্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করেন যে যে সমুদয় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপর দ্বৈতবাদী এত দৃঢ় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন তাহার মূল অতিশয় শিথিল। গভীর বিশ্বাস ও অতুল সাহসের সহিত অদ্বৈতবাদী ঘোষণা করেন যে এই সমস্ত প্রমাণ প্রমেয় জ্ঞান অধ্যাসমূলক বা অবিদ্যাগ্রস্ত—ইহাই আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যের সর্ব্বপ্রথমে অধ্যাসভাষ্যে অতিশয় দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন—"তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ"—অর্থাৎ আত্মা এবং আত্মভিন্ন আর যাহা কিছু পদার্থ যাহাদিগকে অনাত্মা বলা যাইতে পারে তাহাদের একটীকে আর একটীর উপর আরোপ অর্থাৎ অভিন্নরূপে যে জ্ঞান তাহাকেই অবিদ্যা এই আখ্যা দেওয়া যায় এবং এইপ্রকার অবিদ্যাকেই অবলম্বন করিয়া আমাদের লৌকিক ও বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সকল প্রকার ব্যবহারই নিষ্পন্ন হইতেছে। দৈনন্দিন জীবনের জড়তা জ্ঞেয়রূপ অভিজ্ঞতার দ্বারা যে সাধারণ জ্ঞান মানুষ সদাসর্ব্বদা লাভ করিতেছে সেইজ্ঞান যদি অবিদ্যা হয় তবে কি তাহা একেবারে ভিত্তি হীন ও পরম সত্য হইতে বিচ্যুত বন্ধ্যার পুত্রের মত একান্ত অলীক ও নিতান্ত মূল্য হীন, এই প্রকার প্রশ্ন স্বভাবতঃই সকলের অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে উত্থিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে এইরূপ জ্ঞান একেবারেই অলীক নহে। পূর্ণ সত্য না হইলেও ইহার ভিতরে সত্যের অভিব্যক্তি আছে। স্বামিজীর ভাষায়—Because it satisfies to a certain degree our idea of existence—এইজন্যই ইহা ব্যবহারিক সত্য। এই প্রকারে সত্যকে পূর্ণ সামঞ্জস্যরূপে ব্যক্ত করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদী পারমার্থিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্য এই দুই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করেন। ব্যবহারিক সত্যের উর্দ্ধে পারমার্থিক সত্য বাস্তবিক অপরিবর্ত্তনীয়রূপে নিত্য প্রকাশ পাইতেছেন

এই তত্ত্ব দ্বৈতবাদী তাহার ব্যবহারিক গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। এই পারমার্থিক অনপেক্ষিত সত্যের স্থল হইতেই স্মরণাতীত কাল হইতে দ্বৈতাদ্বৈতের ভীষণ সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানেও এই সংগ্রামই ধর্ম্ম-দর্শন জগৎকে দুই পৃথক ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যে সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। এই ঘোর দ্বন্দ্বকলহের মধ্যে দ্বৈতবাদী তাঁহার দ্বৈতমূলক জ্ঞানের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রতিবাদ করেন যে সত্যের আবার পারমার্থিক ও ব্যবহারিক এই দুই প্রকার ভেদ পরিকল্পনা কেন। বস্তুতঃ এই দিক হইতেই আমরা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আচার্য্য রামানুজ কৃত শ্রীভাষ্যে ব্যবহারিক প্রমাণের বিরুদ্ধে আপত্তি দেখিতে পাই। তিনি শ্রীভাষ্যে শাস্ত্র প্রত্যক্ষ বিরোধে শাস্ত্র প্রাবল্য নিরাশ নামক বিচার প্রসঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ আপত্তির দ্বারা ব্যবহারিক প্রমাণের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"নন্থ ব্যবহারিক প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারোঽস্মাকমপি অস্ত্যেব। কোঽয়ং ব্যবহারিকো নাম, আপাত প্রতীতিসিদ্ধাবেব যুক্তিভির্নিরূপিতো ন তথাবস্থিত ইতি চেৎ, কিংতেন প্রয়োজনম্; প্রমাণতয়া প্রতিপন্নেঽপি যৌক্তিক বাধাদেব প্রমাণকার্য্যাভাবাৎ।" (শ্রীভাষ্য নির্ণয়সাগর সংস্করণ ১১৩ পৃঃ)। অর্থাৎ অদ্বৈতবাদি যদি বলেন যে ব্যবহারিক প্রমাণ প্রমেয় জ্ঞান ত আমাদিগের মতেও বিদ্যমান তবে জিজ্ঞাসা করি এই ব্যবহারিক পদার্থটী কি? যদি বল ব্যবহারিক অর্থ আপাততঃ যে প্রতীতি হইতেছে তাহার দ্বারা যাহা সিদ্ধ অথচ যুক্তির দ্বারা যখন তাহার স্বরূপ নিদ্ধারণ করিতে যাই তখন দেখি যে তাহার আর সেই রূপ নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি সেই ব্যবহারিকে কি প্রয়োজন? প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও যুক্তির দ্বারা যদি তাহার বাধ হয় তবে সেই বাধের জন্যই ত তাহা প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না; তবে সেই ব্যবহারিকের কি প্রয়োজন?

আচার্য্য রামানুজের এই আপত্তির অদ্বৈতবাদী কি উত্তর দিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে হইলে অদ্বৈতাচার্য্যগণ কি অর্থে ব্যবহারিক প্রামাণ্যের

ব্যবহার করিয়াছেন তাহা দেখা উচিত। সেই জন্য প্রথমতঃ অদ্বৈতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আচার্য্য শঙ্কর এবং তাঁহার পদাঙ্কানুসারী পরবর্ত্তী ব্যাখ্যাতৃগণ কি অর্থে প্রমা, প্রমাণ এবং তাহাদিগের অবিদ্যামূলকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে দেখা কর্ত্তব্য।

আচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে বলিয়াছেন—"কথং পুনরবিদ্যাবদ্‌-বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনিপ্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি। উচ্যতে। দেহেন্দ্রিয়াদি-ষ্বহংমমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। নহীন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণ ইন্দ্রিয়ব্যাপারঃ সম্ভবতি। নচানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নসত্যসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। নচ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণ প্রবৃত্তিরস্তি। তস্মাদবিদ্যাবদ্‌বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি।" ইহার অর্থ ঃ—আশঙ্কা হইতেছে—প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য যে সমুদায় জ্ঞানের প্রমাণ আছে এবং বেদোপনিষৎ প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্র আছে তাহারা সকলেই কি প্রকারে অবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইতেছে? উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—আমাদের সকল মনুষ্যের উত্তমরূপে জানা আছে যে এই দেহ এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি যে সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহাদিগের সহিত আমাদিগকে যদি অভিন্ন জ্ঞান না করি অর্থাৎ আমি ইন্দ্রিয়, আমি দেহ অথবা আমার ইন্দ্রিয় ও আমার দেহ এইরূপ যদি না ভাবি তাহা হইলে আমরা কখনও যে সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া নিজকে জ্ঞাতা বা প্রমাতা বলিতেছি সেই প্রমাতা হইতে পারি না।

অথচ আমরা যদি প্রমাতা না হই তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ প্রমাতাকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যকরী হয় তাহাদেরও কার্য্য হইতে পারে না। আমাদের যে সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহা-দিগকে গ্রহণ না করিলে প্রত্যক্ষাদি অসম্ভব হয়. ইহাও আমাদের বেশ জানা আছে। আমরা আরও জানি যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কোন না কোন আধারকে আশ্রয় না করিয়া হইতে পারে না। শরীরের

সহিত আপনাকে অভিন্ন অর্থাৎ আমার শরীর বা আমিই শরীর এই রূপ না ভাবিয়া কোন্ জগতে দেহের দ্বারা কোন্ কার্য্য করিয়াছে বা করিতেছে ইহাও দেখা যায় না। অথচ এই সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার আরোপের দ্বারা অধ্যাস না হইলে স্বভাবতঃ অসম্বদ্ধ আত্মা তাহারও প্রমাণে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে এইরূপ আত্মা ও অনাত্মা ইন্দ্রিয়াদির পরস্পরাধ্যাসকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও সকল শাস্ত্রের কার্য্য চলিতেছে।"

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রধান যুক্তি ইহাই যে—আমাদের আত্মা স্বভাবতঃই অসঙ্গ এবং সর্ব্ব প্রকার বিকার বিনির্ম্মুক্ত, সুতরাং তাহার বাস্তবিক প্রমাতৃত্ব হইতে পারে না; কারণ প্রমাতা হইলেই ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের আশ্রয়রূপে বিকৃত হইতে হয়। ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার রূপ ক্রিয়ার আশ্রয় হইলেই আত্মাকে ক্রিয়া দ্বারা বিকৃত হইতে হইবে। ইহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"যদাশ্রয়াহি ক্রিয়া তমবিকুর্ব্বতী নৈবাত্মানং লভতে। যদ্যাত্মা ক্রিয়য়া বিক্রিয়েত অনিত্যত্বমাত্মনঃ প্রসজ্যেত।" সূত্রভাষ্যের বিখ্যাত টীকাকার পণ্ডিতকেশরী বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার ভামতী ব্যাখ্যায় এই যুক্তিরই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"প্রমাতৃত্বং হি প্রমাং প্রতি কর্তৃত্বং। তচ্চ স্বাতন্ত্র্যম্। স্বাতন্ত্র্যং চ প্রমাতুঃ ইতর কারকা প্রযোজ্যস্য সমস্তকারক প্রযোক্তৃত্বম্। তৎ অনেন প্রমাকরণং প্রমাণং প্রয়োজনীয়ম্। ন চ স্বব্যাপারমন্তরেণ করণং প্রযোক্তুমর্হতি। নচ কূটস্থনিত্যঃ চিদাত্মা অপরিণামী স্বতঃ ব্যাপারবান্। তস্মাৎ ব্যাপারবদ্ বুদ্ধ্যাদি তাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ ব্যাপারবত্তয়া প্রমাণম্ অধিষ্ঠাতুমর্হতি ইতি ভবতি অবিদ্যাবৎ পুরুষ বিষয়ত্বম্ অবিদ্যাবৎপুরুষাশ্রয়ত্বং প্রমাণানাম্ ইতি।

এই স্থলে ভামতীকার যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে—প্রমাতৃত্বের অর্থই যখন আত্মার ব্যাপারবত্ব বিশেষ, তখন নিষ্ক্রিয় আত্মাতে তাহা বাস্তবিক পক্ষে হইতে পারে না। অথচ আত্মার প্রমাতৃত্ব যখন নিত্য ঘটিতেছে তখন ঘটনার অপলাপ কেহ

করিতে পারে না সুতরাং প্রমাতৃত্ব আত্মার উপর অধ্যস্ত ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না।

মানব মাত্রেরই যে ব্যবহার অধ্যাস বা অবিদ্যা-মূলক তাহা যাহারা বিচার ভিন্ন কোন কিছু গ্রহণ করিতে চাহেন না তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য রত্নপ্রভা-কার নিম্নলিখিত অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন।

"দেবদত্ত কর্ত্তৃকঃ ব্যবহারঃ, তদীয় দেহাদিষু অহংমমাধ্যাসমূলকঃ।

অন্বয় ব্যতিরেকানু সারিত্বাৎ। যদ্ ইত্থং তৎ তথা, যথা মৃন্মূলঃ ঘটঃ ইতি প্রয়োগঃ। তত্র ব্যতিরেকং দর্শয়তি—দেহ ইতি। দেবদত্তস্য সুষুপ্তৌ অধ্যাসাভাবে ব্যবহারাভাবঃ দৃষ্টঃ, জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ অধ্যাসে সতি ব্যবহারঃ ইতি অন্বয়ঃ স্ফুটত্বাৎ ন উক্তঃ। অনেন লিঙ্গেন কারণতয়া অধ্যাসঃ সিদ্ধতি ব্যবহারানুরূপ কার্য্যানুপপত্ত্যা বা ইতি ভাবঃ॥"

আচার্য্যশঙ্কর হইতে রত্নপ্রভা-কার পর্য্যন্ত বিখ্যাত ব্যাখ্যাতৃগণের পূর্ব্বোল্লিখিত সুনিপুণ যুক্তির দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় যে প্রমাণ প্রমেয়াদিরূপে জ্ঞান হইয়া থাকে তাহা চরম সত্য নয়। এই কথা সিদ্ধ হইলে ইহা অবশ্যই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় যে, এই দ্বৈতমূলক ব্যবহারাবস্থারও উর্দ্ধে অপর এক অপরিবর্ত্তনীয় পরম সত্য বর্ত্তমান এবং সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম—যাঁহাতে অবিদ্যার সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অবসান। অতএব সেই পূর্ণ সত্যের উচ্চ ভূমি হইতে নিরীক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই বোধ হইবে যে, এই দ্বৈতমূলক ব্যবহারাবস্থার জ্ঞান সেই সত্য জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত নয়, বরং তাহারই আংশিক অভিব্যক্তি। এই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় জ্ঞানরূপে নিরন্তর ব্যবহৃত যে জীব ও জগত তাহা যদি সম্পূর্ণ অলীক হয় তবে জগৎ প্রপঞ্চ নিরধিষ্ঠান বিভ্রান্তি তুল্য হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদের সার সত্য পূর্ণ ও সকল প্রকার বিরোধের চরম সমন্বয় স্থল। সুতরাং এই প্রপঞ্চের সহিত তাহার যে বিরোধ আপাততঃ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় তাহারও উপশম করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদের সত্যের লক্ষণ একজন নবীন প্রতীচ্য দার্শনিকের ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়—"Truth must exhibit the mark of internal harmony or

again the mark of expansion and all-inclusiveness." এতাদৃশ সত্য কখনই প্রপঞ্চকে আপনার ক্রোড়ীভূত না করিয়া—পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। প্রপঞ্চকে একেবারে সত্যের বিরোধী অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ বলিলে প্রকারান্তরে যে সত্যকেই অসম্পূর্ণ বলা হয় এমন কি শূণ্যবাদেরও আশঙ্কা হইতে পারে একথা পূজ্যপাদ আনন্দগিরি গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—"সর্ব্ববিশেষ রহিতস্য অদৃষ্টেঃ দৃষ্টেশ্চ বিপরীতস্য প্রাপ্তে ব্রহ্মণঃ শূণ্যত্বে প্রত্যক্তেন ইন্দ্রিয়প্রবৃত্ত্যাদি হেতুত্বেন কল্পিত দ্বৈত-সত্তা-স্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেন চ সত্বং দর্শয়ন্ আদৌ— "

উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যও "সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্"—ইত্যাদিকে ব্রহ্মের অস্তিত্বাধিগমের নিমিত্ত বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"উপাধিকৃতং মিথ্যারূপমপি অস্তিত্বাধিগমায় জ্ঞেয়ধর্ম্মবৎ পরিকল্প্য উচ্যতে সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্ ইত্যাদি।" বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদে দ্বৈত প্রপঞ্চের সহিত বিরোধেই যে চরম সত্যের অবসান হয় নাই তাই গীতাকার সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার ভাষায় বলিতেছেন—"অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।"

সত্যের প্রকৃত স্বরূপ যে দ্বৈতাদ্বৈত (?) সমন্বয় তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য অদ্বৈতিগণ জগৎ প্রপঞ্চের ব্যবহারিক প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিতে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করেন নাই। ব্যবহারিক প্রামাণ্যের অঙ্গীকার করা যে বৈদান্তিকগণের ছিন্নকন্থা সংস্কার নয় তাহা একজন আধুনিক প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক মহোদয়ও নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"Reality under forms of our consciousness is and can only be the conditioned effect of the absolute reality; but this conditioned effect stands in indissoluble relation with its unconditioned cause; and being equally persistent with it, so long as the conditions persist, is to the consciousness supplying these conditions, equally real."

মহামহোপাধ্যায় অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার "সিদ্ধান্তলেশ" নামক গ্রন্থে সত্যত্বের উৎকর্ষাপকর্ষক তারতম্য স্বীকার করিয়া ব্যবহারিক প্রামাণ্যের "যাবদ্

ব্রহ্মজ্ঞানমবাধ্যত্বম্" এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদান্ত পরিভাষাকার বিষয় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

"এবং নিরূপিতানাং প্রমাণানাং প্রামাণ্যম্ দ্বিবিধম্।
ব্যবহারিকতত্ত্বাবেদকত্বং পারমার্থিকতত্ত্বাবেদকত্বঞ্চ ইতি॥
তত্র ব্রহ্মস্বরূপাবগাহি প্রমাণ ব্যতিরিক্তানাং।
সর্ব্বপ্রমাণানাম্ আদ্যং প্রামাণ্যম্॥"

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের "তৎ তু সমন্বয়াৎ" সূত্রের ভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে—

"দেহাত্ম প্রত্যয়োঃ যদ্বৎপ্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বৎ এবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥"

প্রত্যক্ষাদির পারমার্থিক বস্তুকে গোচর করিতে পারে এইরূপ প্রমার করণত্ব নাই বলিয়া বেদান্তবাক্যসকলেরই যে কেন ঐরূপ প্রমা-করণত্ব বলা হয় সে বিষয়ে বেদান্তপরিভাষার মণিপ্রভা-টীকাকার রামকৃষ্ণাধ্বরি নিম্নোদ্ধৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"যো যস্য প্রমাণস্য বিষয়ো ভবতি তস্মিন্নেব বিষয়ে তস্য প্রমাণস্য প্রমাজনকত্বং ইতি ব্যাপ্তে বেদান্তানাং কালত্রয়াবাধ্যস্য জীবব্রহ্মৈকরূপ বিষয়স্য বিদ্যমানত্বেন জীবব্রহ্মৈক্যরূপ-বিষয়ে সংসর্গানবগাহি প্রমাজনকত্বং সম্ভবত্যেব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণানাস্তু জীবব্রহ্মৈক্যরূপ্ বিষয়াভাবাৎ ন পারমার্থিকবস্তু গোচর প্রমাকরণত্ব-মিতিভাবঃ॥"

অর্থাৎ—যে বস্তু যে প্রমাণের বিষয় হয় সেই বস্তুতেই সেই প্রমাণের প্রমাণ জন্মাইবার সামর্থ্য থাকে এইরূপ ব্যাপ্তি আছে বলিয়াই বেদান্তের যখন কালত্রয়াবাধ্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ বিষয় সিদ্ধ, তখন তাহার সেইরূপ বিষয়ে "বিশেষ্য-বিশেষণ বিনির্ম্মুক্ত (Devoid of relational form of thought)" যে প্রমাজ্ঞান তাহার উৎপাদকত্ব নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহের বিষয় জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন নয়, সুতরাং পারমার্থিক বস্তুকে গোচর করিতে পারে এইরূপ প্রমাজ্ঞানের জনক তাহারা হইতে পারে না। বস্তুতঃ এ সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সত্যকে সমগ্রভাবে গোচর না করিয়া তাহাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বিছিন্ন করিয়া (a what and a

that, an existence and a content)—যাহারা একান্ত অবিশ্লিষ্ট তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া) আমাদিগের নিকট আনিয়া উপস্থিত করে। এই জন্যই তাহাদিগের মধ্য দিয়া সত্য আংশিকরূপে অভিব্যক্ত হয়। অদ্বৈতবাদে সত্যের এই বিছিন্ন ও আংশিক প্রকাশকেই ব্যবহারিক সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে। এই ব্যবহারিক সত্যত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া পারমার্থিক সত্য বা ব্রাহ্মীস্থিতিই বেদান্তের চরম উপদেশ, তাহা শ্রোতার হিতৈষিণী শ্রুতি অতি বিশদভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা—যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ॥"

অদ্বৈতের এই সারসত্য নির্দ্দেশের কিরূপ আশ্চর্য্য অনুরূপোক্তি আমরা আধুনিক বিখ্যাত দার্শনিক F. H. Bradley মহোদয়ের Appearnce & Reality নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই তাহা নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি সেখানে বলিতেছেন—

"But to reach a mode of apprehension, which is quite identical with reality, surely predicate and subject and subject and object and in short the whole relational form, must be merged. * * * It would be *experience* entire. containing all elements in harmony."

এই কথাই মাণ্ডুক্য উপনিষদে ঋষি "অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং, প্রপঞ্চোপশমং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ—" এই সকল কথায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ক্রিয়াকারক ফল লক্ষণ সংসারের মধ্য দিয়া সাধারণ অধিকারীকে নিরস্ত সর্ব্বোপরি নির্ব্বিশেষ অদ্বয় তত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে এই ভেদমূলক সংসারের ব্যবহারিক প্রামাণ্য অঙ্গীকার না করিয়া যে এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই সে কথা আচার্য্য শঙ্কর গীতাভাষ্যে জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা এই দুই প্রকার নিষ্ঠা বিভক্ত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আচার্য্য বলিতেছেন—"এতস্যাঃ বুদ্ধের্জন্মনঃ প্রাক্ আত্মনোদেহাদিব্যতি-

রিক্তস্য কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষো ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক পূর্ব্বকো মোক্ষ সাধানানুষ্ঠান নিরূপণ-লক্ষণো যোগ......এবং সাংখ্যবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিঞ্চ আশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে ভগবতা বিভক্তে ভগবতৈব উক্তে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্তৃত্বাকর্তৃত্ব-একত্বানেকত্ব বুদ্ধ্যাশ্রয়য়োঃ একপুরুষাশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা।"

অর্থ:—"জন্ম প্রভৃতি ছয় প্রকার বিকার আত্মার হইতে পারে না, এই কারণ আত্মা অকর্ত্তা,—এইরূপ যে সাংখ্যবুদ্ধি সেই বুদ্ধির উদয় হইবার পূর্ব্বে আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন হইলেও, কর্ত্তা ও সুখদুঃখের ভোক্তা এই প্রকার নিশ্চয় হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিবেক পূর্ব্বক, পরম্পরাক্রমে মোক্ষলাভের কারণ যে কর্ম্মানুষ্ঠান তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণকে যোগ বলা যায়; এই যোগ বিষয়ক বুদ্ধি যোগবুদ্ধি। আত্মার কর্তৃত্ব ও অনেকত্ব জ্ঞান থাকিলে লোকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং আত্মার অকর্তৃত্ব ও একত্বজ্ঞানই প্রকৃতজ্ঞান নিষ্ঠার কারণ; এই জন্য এক পুরুষ একই কালে কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠাকে আশ্রয় করিবে, ইহা সম্ভব নয় দেখিয়াই ভগবান্ সাংখ্য ও যোগবুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে বিভক্ত করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ক্রিয়া-কারক ভেদমূলক ব্যবহারাবস্থার কর্ম্ম যে পারমার্থিক জ্ঞান নিষ্ঠা লাভের উপায় তাহা আচার্য্য স্পষ্টভাবে গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের "যাবানর্থঃ উদপানে" ইত্যাদি শ্লোকের ভাষ্যে বলিতেছেন:—"তস্মাৎ প্রাক্ জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারপ্রাপ্তেঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেন কূপতড়াগাদ্যর্থ স্থানীয়মপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্।" অর্থাৎ—যে পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকার প্রাপ্তি না হয় সে পর্য্যন্ত কর্ম্মাধিকারী জীবের কূপ তড়াগাদি ফল স্থানীয় হইলেও কর্ম্ম কর্ত্তব্য।

ইহার পর তিনি "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং" ইত্যাদি শ্লোকের ভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে ব্যবহারাবস্থায় সত্যত্বের তদুচিত যে অপলাপ করা অসম্ভব তাহা আরও পরিস্ফুট ভাবে বলিতেছেন—"প্রাক্ বিদ্যোৎপত্তেঃ অবিদ্যাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমানা ক্রিয়া কারক ফল ভেদরূপা সতী সর্ব্বকর্ম্ম হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। নাপ্রমাণ বুদ্ধ্যা গৃহ্যমানায়াঃ কর্ম্ম হেতুত্বোপপত্তিঃ।

..........নহি আত্মস্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি।" অর্থাৎ—বিদ্যার উদয় হইবার পূর্ব্বে অবিদ্যাপ্রমাণ বুদ্ধির বিষয় হইয়া ক্রিয়া, কারক ও ফল ইত্যাদি নানাপ্রকার ভেদের রূপ ধারণ করিয়া সকল প্রকার কর্ম্মের হেতু হইয়া থাকে। এই অবিদ্যাকে অপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলে সে আর কর্ম্মের হেতু হইতে পারে না। কিন্তু আত্মার স্বরূপ যখন অধিগত হয় তখন এই অবিদ্যাসম্ভূত প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই প্রকার প্রমাণ-প্রমেয়-লক্ষণ জ্ঞান ফলবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ; এই নিমিত্তই সে সার্থক, এতদ্ভিন্ন তাহার স্বতন্ত্র প্রয়োজন বা মূল্য নাই। এ ফলবৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ বলিয়াই এইরূপ জ্ঞানের আপেক্ষিক অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়, এই কথা আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে আরম্ভণাধিকরণে বলিতেছেন—"তত্রৈতৎ সিদ্ধং ভবতি—ব্রহ্ম-প্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিত ব্রহ্ম দর্শনাদেব ফল সিদ্ধৌ সত্যাং যত্তত্রাফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণো জগদাকার পরিণামিত্বাদি তদ্ ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে, ফলবৎ সন্নিধৌ অফলং তদঙ্গমিতিবৎ ন তু স্বতন্ত্র ফলায় কল্পতে। অর্থাৎ—এক্ষণে ইহা নির্ণীত হইতেছে যে ব্রহ্মপ্রকরণেতে যখন সকল-বিশেষ-ধর্ম্ম-রহিত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে দর্শন করিলেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলা হইতেছে, তখন সেইস্থলে ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হন—এই যে সকল অফল কথাও শ্রুত হইতেছে, সে সকল ব্রহ্মদর্শনের উপায় বলিয়াই উল্লিখিত হইতেছে। কিন্তু তাহাদের কোন পৃথক্ স্বতন্ত্র ফলের কথা বলা হইতেছে না। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিলে যেমন সকল পুরুষার্থ সিদ্ধিরূপ ফল পাওয়া যায় সেইরূপ ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হন এইরূপ সৃষ্টির বিষয় জানিলে অন্য কোন পৃথক্ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে সৃষ্ট্যাদি দর্শন ব্রহ্মদর্শনের উপায় হয় বলিয়া সহায়তা করে মাত্র।

অদ্বৈতবাদী প্রপঞ্চকে পারমার্থিক সত্য বলিতে যে অস্বীকৃত হন তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে, অদ্বৈতের অভেদ জ্ঞানের দ্বারা এই অভেদাবলম্বি প্রপঞ্চ জ্ঞান বাধিত (?) হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাকে

অবাধিত সত্য বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? এইজন্যই আনন্দগিরি বলিতেছেন—"ভেদস্য লোকসিদ্ধস্য অপূর্ব্বফলবদভেদ বিরোধেন সত্যত্ব কল্পনা যোগাৎ। কিঞ্চযদ্যুভয়োরেকদা ব্যবহারঃ স্যাৎ তদা স্যাদপি সত্যত্বম্। নৈবমস্তি। একত্ব জ্ঞানেন চরমেণ অনপেক্ষেণ নানাত্বস্য নিঃশেষং বাধাৎ, শুক্তিজ্ঞানেনেব রজতস্য ইত্যাহ অপিচান্ত্যমিতি॥" ইহার অর্থ:—লৌকিক ব্যবহারের দ্বারা স্থিরীকৃত যে ভেদ সেই ভেদের যখন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা লভ্য অপূর্ব্ব ফলবৎ অভেদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে তখন সেই ভেদ পারমার্থিক সত্য একথা বলা যায় না। অধিকন্তু যদি লোকসিদ্ধ ভেদ এবং ব্রহ্মজ্ঞান-জন্য অভেদ এই উভয়ের একই সময়ে ব্যবহার সম্ভবপর হইত তাহা হইলেও না হয় ভেদের সত্যত্ব বলা যাইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বশেষ যে, একত্বজ্ঞান—যাহা নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না—সেই জ্ঞানের দ্বারা নানাত্বজ্ঞান নিঃশেষ রূপে বাধিত হইয়া যায় অর্থাৎ নানাত্বের আর কোন চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রমের পর ইহা শুক্তি এই জ্ঞানের দ্বারা রজত একেবারে দূরীভূত হইয়া যায় তখন ভেদ বা নানাত্বকে কি প্রকারে অনাপেক্ষিক অবাধিত সত্য বলা যায়?

যে পর্য্যন্ত পূর্ণ সত্য লাভ করিতে না পারা যায় সে পর্য্যন্ত যে লোক ব্যবহারের অপলাপ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, প্রত্যুত তাহাদিগের প্রামাণ্য রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা আচার্য্যশঙ্কর স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া সূত্র ভাষ্যের দ্বিতীয়াধ্যায়ে অভাবাধিকরণে বলিতেছেন—"নহি অয়ং সর্ব্বপ্রমাণ প্রতিষিদ্ধো লোকব্যবহারোঽন্যৎ তত্ত্বমনধিগম্য শক্যতেঽপহ্নোতুং অপবাদাভাবে উৎসর্গপ্রসিদ্ধেঃ।" অর্থঃ—ভেদকে অবলম্বন করিয়া এই যে জাগতিক লোক-ব্যবহার,—যাহা বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় সকল প্রমাণের দ্বারাই নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে—সেই লোক-ব্যবহারকে যে পর্য্যন্ত পূর্ণত্ব লাভ না করা যায় সে পর্য্যন্ত অপলাপ করা যায় না; কেন না আমরা সকলেই উত্তমরূপে জানি যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন নিয়ম না হয় ততক্ষণ

পর্য্যন্ত লোকে সাধারণ নিয়মকেই অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নির্ব্বিশেষ পূর্ণ সত্যকে লাভ করিতে না পারিতেছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভেদ পরিপূর্ণ এই সাংসারিক ব্যবহারকে আপেক্ষিক সত্য বলিয়া ইহারই মধ্য দিয়া ইহাকে অতিক্রম করিবার জন্য চলিতে হইবে—ইহাই উপরের কয়েকটী কথায় জ্ঞানিগুরু শঙ্কর আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যবহারিক সত্যের প্রমাণ্য সমর্থক অদ্বৈতাচার্য্যগণের যে সমুদয় উক্তি এ পর্য্যন্ত আলোচিত হইল তাহাতে কোন কোন ব্যক্তির হয়ত এই প্রকার গুরুতর ভ্রমাত্মক আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাধারণ জাগ্রদ-বস্থায় আমরা জাগতিক ব্যাপারের মধ্যদিয়া নানাপ্রকার ভেদ সম্বলিত যে সত্যকে গ্রহণ করিতেছি সর্ব্বোত্তম অনাপেক্ষিক অবাধিত সত্যের প্রকাশ বোধহয় তাহারই অধীন; দার্শনিক পরিভাষায়—সোপাধিক প্রপঞ্চ হইতে নিরুপাধিক ব্রহ্মের যেন কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। বাস্তবিক এ প্রকার সংশয় যে নিতান্ত ভিত্তিহীন তাহা আচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে 'প্রপঞ্চ ব্রহ্ম স্বভাব কিন্তু ব্রহ্ম প্রপঞ্চ স্বভাব নহেন' এইরূপে অনেক স্থলে জিজ্ঞাসুকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

পরিণামিনী পৃথিবীর যে ভেদময় রূপ সেইরূপে সে যে কিছুতেই সত্যব্রহ্মের সহিত সমন্বয় সূত্রে গ্রথিত হইতে পারে না এই কথা অমলানন্দ যতি প্রবর শাস্ত্রদর্পণে একটী সুন্দর শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"তত্ত্বে শ্রুত্যুপপত্তিব্যপগতে দ্বৈতস্য তদ্‌গ্রাহিনঃ
প্রামাণ্যং ব্যবহারকারিবিষয়ং মিথ্যাপিসদ্‌বোধকম্।
মায়া যন্তরপীশ্বরস্য মুখতঃ কূটস্থতাম্নানতো
দৃষ্টাদ্বৈঃ পরিণামধী ব্র্হ্মেকমেকান্ততঃ॥"

অর্থ:—শ্রুতি এবং শ্রুতিমূলক যুক্তির দ্বারা দ্বৈতের তত্ত্ব চলিয়া গেলে দ্বৈতগ্রাহি প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য ব্যবহারিক বিষয়কে লাভ করিয়া মিথ্যা হইলেও অর্থের বোধ জন্মাইয়া দেয়।

এদিকে তিনিই আবার দৃঢ়তার সহিত সংসারাবস্থায় ব্যবহারিক

প্রামাণ্যের প্রয়োজনীয়তা অতি সুন্দরভাবে বলিতেছেন—"এবং শ্রুতিযুক্ত্যবগতে কার্য্যস্য অতাত্ত্বিকত্বে, অভেদগ্রাহি প্রত্যক্ষাদেঃ অর্থক্রিয়াসমর্থ-বস্তু বিষয়ত্বে বাধাভাবাৎ তাদৃশ বস্তু পরিচ্ছেদকত্বমেব প্রামাণ্যম্। নহি কুম্ভাদেরুদকাহরণাদি হেতুত্বং প্রত্যক্ষাদি সিদ্ধং বাধ্যতে।"

এই কয়েকটী কথার ভিতর অমলানন্দের প্রধান হৃদয়গ্রাহিনী যুক্তিটী এই যে, প্রপঞ্চ বা কার্য্য যদি ব্রহ্মের সত্যত্ব হিসাবে মিথ্যাই (মিথ্যা অর্থ একেবারে সত্য লেশশূন্য নয়) হয় তাহা হইলে অদ্বৈতবাদী কলসী যে জল আনিবার হেতু এবং সেইজন্যই যে তাহার মূল্য বা সার্থকতা আছে তাহা ত অস্বীকার করিতেছেন না।

এই যুক্তির ভিতরে দর্শন ও ধর্ম্ম জগতের একটী গুরুতর তথ্য লুকায়িত আছে। তথ্যটী এই যে ঘটনামূলক জ্ঞানের (facts) অপলাপ পূর্ব্বক সত্য নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইয়া সমন্বয়ের পরিবর্ত্তে বিরোধ, স্থাপনের পরিবর্ত্তে ধ্বংসে উপনীত হওয়া অদ্বৈত কেন কোন দর্শন বা কোন ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

সুতরাং অদ্বৈতবাদীর অতি সরল সহজ কথা এই যে, ভেদকে অবলম্বন করিয়া তাহাঁর সাহায্যে আমরা যে সত্যকে উপলব্ধি করিতে যাই তাহার মধ্যে সত্য যে একেবারেই ধরা দেয় না তাহা নয়; আবার তাহাতেই যে সত্য নিঃশেষভাবে আপনার যথার্থ সমগ্রস্বরূপে প্রকাশ পায় তাঁহাও নয়। প্রকৃতপক্ষে সত্য অদ্বৈতে নির্ব্বিশেষ ভাবেই আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া এই ভেদকে কুক্ষিস্থ করিয়া নেয়; কিন্তু ভেদের আর এই 'রূপ' থাকে না। ভেদ যখন নিজে অভেদে আত্মবিলোপ করিয়া পূর্ণ সত্যের মধুর উজ্জল মূর্ত্তির অমল প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তখনই পূর্ণসত্য সাধকের হৃদয়ে "তত্ত্বমসি" বাণীতে ঘোষিত হয়। আমাদের পূজ্যপাদ অন্যতম অগ্রণী বৈদান্তিক যতিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিময়ী ভাষায় অদ্বৈতের চরমাবস্থা—

"In the centre, at the heart of things, is no one to be mourned for, and none to weep. For He hath penetrated all things—the Pure one, the Formless, the Bodiless, the Stainless, He the knower, He the Great root, the Self-Existent."

অতএব জগতের সকল সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত সম্মিলিত হইয়া আমরা ব্যবহারাবস্থার সত্যতাশৃঙ্খল জ্ঞানাসির দ্বারা ছিন্ন করিয়া অদ্বৈতের পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করি—

"চোষ্ণং বাপরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।
অদ্বৈতভাষয়া চোষ্ণং নাস্তি নাপিতদুত্তরং।
ন বিরোধো নচোৎপত্তি র্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মমুক্ষু র্নৈব মুক্তঃ ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

শান্তি।

মহাশূন্য স্বরূপ প্রকাশ
যাহে হয় সৃষ্টির উদয়
পুনঃ যাহে সকল বিকাশ
মিলে হয় নিধনেতে লয়।
আঁখি জল ইহাতে মিলায়
হাস্য মুখ প্রকাশের তরে
জীবনের যাহাতে বিলয়
সেই লোক শান্তি নাম ধরে।

ক্ষেত্রীর মহারাজের প্রতি।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

(অনুবাদক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।)

ঢেকে রাখে মেঘে যদি তপনে খানিক,
আঁধারে আকাশ যদিও ছায়,
তথাপি সাহস ধর—হে বীর নির্ভীক,
জানিও বিজয় আগত-প্রায়!

মণ্ডল-ভ্রমণে বদ্ধ শীত গ্রীষ্ম রয়,
আবর্ত্ত (ই) তোলে তরঙ্গ যত,
আলো-ছায়া-সম তারা করে অভিনয়,
চলহে অটল বীরের মত!

জীবন-কর্ত্তব্য বটে অতি দুঃখময়,
সুখ—বৃথা, অনিত্য ইহার;
অস্পষ্ট আঁধারে ঘেরা পরিণাম হয়;
তথাপি সাহস বাঁধি' দৃঢ় ব্রতে বীর-হৃদি,
আগে চল ভেদিয়া আঁধার!

কর্ম্ম না বিফল হ'বে উদ্যম না বৃথা যা'বে,
শক্তি নষ্ট হয় যদি,—আশা প্রতিহত,
তোমার নেতৃত্বে পরে জাগিবে অনেক নরে,
শুভকার্য্য নিস্ফল না হ'বে দৃঢ়-ব্রত!

জ্ঞানী ও পুণ্যাত্মা বটে বিরল সংসারে,
তথাপি তা'রাই চির পথ-প্রদর্শক!
সাধারণে সে প্রভাব জানে বহু পরে,
না শুনে কাহার (ও) কথা—চালাও চালক!

বহু-দর্শী ঋষিকুল চালাবে তোমারে,
সর্ব্ব-শক্তিমান হ'বে তোমার সহায়,
মঙ্গল-আশীষ তুমি পা'বে ভারে ভারে,
সৎকর্ম্ম, ধর্ম্মাত্মা, যেন তোমারে চালায়!

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

বৈদ্যনাথ।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

রামকৃষ্ণো জয়তি।

নমস্কারপূর্ব্বকম্—

বৈদ্যনাথে পূর্ণ বাবুর বাসায় কয়েক দিন আছি। শীত বড় নাই, শরীরও বড় ভাল নহে—হজম হয় না, বোধ হয় জলে লৌহাধিক্যের জন্য। কিছুই ভাল লাগিল না—স্থান, কাল ও সঙ্গ। কাল কাশী চলিলাম। দেওঘরে অচ্যুতানন্দ—র বাসায় ছিল। সে আমাদের সংবাদ পাইয়াই বিশেষ আগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য বড় জিদ করে। শেষে আর একদিন দেখা হইয়াছিল—ছাড়ে নাই। সে বড় কর্ম্মী, কিন্তু সঙ্গে ৭।৮টা স্ত্রীলোক বুড়ি জয় রাধেকৃষ্ণই অধিক—রুচি ভাল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা! তাহার কর্ম্মচারীরাও আমাদের অত্যন্ত ভক্তি করে। তাহারা কেহ কেহ উহার উপর বড় চটা—তাহারা তাহার নানাস্থানের দুষ্কর্ম্মের কথা কহিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে আমি—র কথা পাড়িলাম। তোমাদের তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রম বা সন্দেহ আছে—তজ্জন্যই বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি। তাঁহাকে এখানকার বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরাও বড় মান্য ও ভক্তি করে। তিনি অতি বালিকা অবস্থায়—র কাছে আসিয়াছিলেন, বরাবর স্ত্রীর ন্যায় ছিলেন। এমন কি,—র মন্ত্রগুরু ভগবান্ দাস বাবাজীও জানিতেন যে, তিনি উহার স্ত্রী। তাহারা বলে, উঁহার মা তাঁহাকে—র কাছে দিয়া গিয়াছিল। যাহাহউক তাঁহার এক পুত্র হয় ও মরিয়া যায় এবং সেই সময়ে—কোথা হইতে একটা জয় রাধেকৃষ্ণ বামনি আনিয়া ঘরে ঢোকায়, এই সকল কারণে তিনি তাহাকে

ফেলিয়া পলান। যাহাহউক, সকলে একবাক্যে স্বীকার করে যে, তাঁহার চরিত্রে কখন কোনও দোষ ছিল না, তিনি অতি সতী বরাবর ছিলেন এবং কখন, স্ত্রী স্বামী ভিন্ন—র সহিত অন্য কোনও ব্যবহার বা অন্য কাহারও প্রতি ছিল না। এত অল্প বয়সে আসিয়াছিলেন যে, সে সময়ে অন্য পুরুষ সংসর্গ সম্ভবে না। তিনি—র নিকট হইতে পলাইয়া যাইবার পর তাহাকে লেখেন যে, আমি কখনও তোমাকে স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যবহার করি নাই, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির সহিত আমার বাস করা অসম্ভব। ইহার পুরাতন কর্ম্মচারীরাও ইহাকে সয়তান ও তাঁহাকে দেবী বলিয়া বিশ্বাস করে ও বলে, তিনি যাবার পর হইতেই ইহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।

এ সকল লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধী গল্পে আমি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম না। এ সকল ভাব-সমাজে যাহাকে বিবাহ বলে না তাহার মধ্যে এত পবিত্রতা—আমি romance * মনে করিতাম, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি—সকল ঠিক। তিনি অতি পবিত্র, আবাল্য পবিত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সকল সন্দেহের জন্য তুমি আমি সকলেই তাঁহার নিকট অপরাধী। আমি তাঁহাকে অসংখ্য প্রণাম করিতেছি ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি মিথ্যা-বাদিনী নহেন। তাঁহার ধর্ম্মে ঐকান্তিকী আস্থাও চিরকাল ছিল, একথাও শুনিলাম।

এক্ষণে ইহাই শিখিলাম, ঐ প্রকার তেজ মিথ্যাবাদিনী ব্যভিচারিণীতে সম্ভবে না।

আপনার পীড়া এখনও আরাম হইতেছে না। এখানে খুব পয়সা খরচ না করিতে পারিলে রোগীর বিশেষ সুবিধা বুঝি না। যাহা হয় বিবেচনা করিবেন। সকল দ্রব্যই অন্যত্র হইতে আনাইয়া লইতে হইবে।

বশম্বদ নরেন্দ্রনাথ।

* কাল্পনিক গল্প মাত্র।

(২)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

C/o জর্জ্জ ডবলিউ হেল,
৫৪১নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো,
২৬শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয় ভগিণীগণ,

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দুস্থানী কবি তুলসীদাস তাঁর রামায়ণের ভূমিকায় বলেছেন,—

"আমি সাধু অসাধু উভয়েরই চরণ বন্দনা করি, কিন্তু হায়, উভয়েই আমার নিকট সমভাবে দুঃখপ্রদ। অসাধু ব্যক্তি আমার নিকট আসিলেই তাহাতে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হয় আর সাধু ব্যক্তি আমাকে ছাড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যায়।

আমি বলি ঠিক কথা। আমার পক্ষে ভগবানের প্রিয় সাধু ভক্তগণকে ভালবাসা ছাড়া সুখের ও ভালবাসার জিনিষ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই— আমার পক্ষে তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ এক মরণ তুল্য যন্ত্রণা।

কিন্তু এসব অনিবার্য্য। হে আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি! তুমি বাজ্‌তে থাক—তুমি যেদিকে চালাও, আমি সেই দিকে চলছি। হে মহৎস্বভাবা মধুর প্রকৃতি সহৃদয় পবিত্রস্বভাবাগণ তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াতে আমার যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা হচ্ছে তা আমার পক্ষে প্রকাশ করা অসম্ভব। হায় আমি যদি ষ্টোয়িক (Stoic) দার্শনিক-গণের মত সুখ দুঃখে নির্ব্বিকার হতে পারতাম!

আশা করি তোমরা সুন্দর গ্রাম্য দৃশ্য বেশ উপভোগ কর্‌ছো।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ গীতা।

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যাহা রাত্রি সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন আর প্রাণীগণ যাহাতে জাগ্রত থাকেন, আত্মজ্ঞানী মুনির পক্ষে তাহা রাত্রি-স্বরূপ।

এই জগতের ধূলি পর্য্যন্ত যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে কারণ, কবি বলতে পারেন, জগৎটা হচ্ছে মড়ার উপর একরাশ ফুলের মালা চাপান মাত্র। যদি পার উহাকে স্পর্শ কোরো না। তোমরা স্বর্গের হোমা পাখীর শাবক—তোমাদের পদ এই মলিনতার পঙ্কিল পল্বলস্বরূপ জগৎ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তোমারা আকাশের দিকে আবার উড়ে যাও।

"যে আছ চেতন ঘুমায়োনা আর।"

"জগতের লোকের ভালবাসার বস্তু অনেক আছে—তারা তাদের ভাল বাসুক—আমাদের প্রেমাস্পদ একজন মাত্র—সেই প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ। জগতের লোক যাই বলুক না, আমরা সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। তবে যখন তারা আমাদের প্রেমাস্পদকে আঁকতে যায় ও তাঁকে নানারূপ কিম্ভূত কিমাকার বিশেষণে বিশেষিত করে, তখনই আমাদের ভয় হয়। তাদের যা খুসি তাই করুক, আমাদের নিকট তিনি কেবল প্রেমাস্পদ মাত্র—তিনি আমার প্রিয়তম—প্রিয়তম—প্রিয়তম—আর কিছুই নন।

তাঁর কত শক্তি কতগুণ আছে—এমন কি আমাদের কল্যাণ করবারও কত শক্তি আছে তা কে জানিতে চায়? আমরা একেবারেই বলে রাখছি আমরা কিছু পাবার জন্য ভাল বাসি না। আমরা প্রেমের দোকানদার নই, আমরা কিছু প্রতিদান চাই না, আমরা কেবল দিতে চাই।

হে দার্শনিক, তুমি আমার তাঁর স্বরূপের কথা বলতে আসছ তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা তার গুণের কথা বলতে আসছ? মূর্খ তুমি জান না, তাঁর অধরের একটী মাত্র চুম্বনের জন্য আমাদের প্রাণ বার হবার উপক্রম হচ্ছে। তোমার ওসব বাজে জিনিষ পুঁটুলি বেঁধে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও—আমাকে আমার প্রিয়তমের একটী চুম্বন পাঠিয়ে দাও—পার কি?

মূর্খ তুমি যার সামনে ভয়ে হাতজোড় করে রয়েছ, যাঁর সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা কোরছো, আমি আমার হার নিয়ে বগলসের মত তাঁর গলায় দিয়ে তাতে একগাছি সুতো বেঁধে তাঁকে আমার সঙ্গে

সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছি—ভয়, পাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যান।

ঐ হার প্রেমের হার—ঐ সূত্র—প্রেমের জমাট বাঁধা ভাবের সূত্র। মূর্খ, তুমি ত এই সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝ না যে, যিনি অসীম অনন্তস্বরূপ তিনি প্রেমের বাঁধনে পড়ে আমার মুষ্টির মধ্যে ধরা পড়েছেন। তুমি কি জান না যে, সেই জগন্নাথ প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েন—তুমি কি জান না যে যিনি এত বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের নূপুরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নাচতেন ?

আমি এই যে পাগলের মত যা তা লিখলাম, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করবে। অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার ব্যর্থপ্রয়াসরূপ আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবে—ইহা কেবল প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌বার জিনিষ। সদা আমার শুভাশীর্ব্বাদ জান্‌বে।

ইতি—
তোমাদের ভ্রাতা—
বিবেকানন্দ।

অব্যক্ত।

মৃত্যু সংজ্ঞা ইহা বিলীনতা
দুই ব্যক্ত মাঝারে প্রাণের,
ঝটিকান্তে স্থির নিস্তব্ধতা
যাহে উঠে ঝঞ্ঝা সুগভীর॥

---

* বন্দোঁ সন্ত অসন্তন চরণা।
দুখপ্রদ উভয়বীর কুছু বরণা॥
বিছুরত এক প্রাণ হরি লেই।
মিলত এক দারুণ দুখ দেই॥

শ্রীবুদ্ধ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম।*

(অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ)

নেপাল ও সিংহল দেশে প্রচলিত বুদ্ধদেবের জীবন বৃত্তান্তে একটী অলৌকিক গল্প আছে। কোন সময়ে মহারাজ শুদ্ধোদন শিশু সিদ্ধার্থকে সঙ্গে লইয়া হৈমন্তিক উৎসব উপলক্ষে কৃষিক্ষেত্রে গমন করেন। প্রাচুর্য্য ও প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের অনুভবে সকলেই তখন আনন্দে বিভোর। নৃপতি সিদ্ধার্থকে বিস্মৃত হইয়া পরিজন ও প্রকৃতি বর্গের সহিত আনন্দে মগ্ন। এদিকে বালকরূপী ভগবান্ একাকী একান্তে পরিত্যক্ত রহিয়াছেন। সংস্কার বশে তিনি তখন এক বৃক্ষতলে বদ্ধ পদ্মাসনে আসীন হইয়া ধ্যান নিবিষ্ট হইলেন। সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিগ্বিভাগ হইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিগন্তে হেলিয়া পড়িলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হওয়াতে অবশেষে সকলের রাজকুমারকে মনে পড়িল। তখন সকলে আসিয়া দেখিল যে দিবস পরিণামের সহিত সমস্ত প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বৃক্ষ সকলের পত্র শীর্ণ—ছায়া বিরল ও পশ্চিম সূর্য্যের বিপরীত দিকে আপতিত। কিন্তু রাজকুমার সিদ্ধার্থ যে বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন—সে বৃক্ষের ছায়া হেলিয়া পড়ে নাই—তাহার পত্রাবলী প্রাতঃকালেরই মত ঘন ও সরস এবং স্থির অবিকম্পিতভাবে গৌতমের দেহকে বেষ্টন করিয়া আতপ হইতে রক্ষা করিতেছে।

ভারতবর্ষ, রাজা শুদ্ধোদনের মত প্রায় সহস্র বর্ষব্যাপ্ত নানা ঘটনার মধ্যে ভগবান্ তথাগতকে একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যখন প্রাচীর সূর্য্য প্রতীচীর ললাট-গগনে উজ্জ্বল হইয়া শোভিতেছে—এবং এসিয়া ভূখণ্ডের বিভিন্ন রাজ্য সকল ও জনসঙ্ঘ ভাগ্য বিপর্য্যয়ে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—সেই সময়ে রাজরাজেশ্বরীরূপিনী অতীত ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধদেবকে এদেশ আবার স্মরণ করিতেছে। আমরা দেখিতেছি

* বিবেকানন্দ সোসাইটীর ১৩২৮ সালের বুদ্ধোৎসব সভায় পঠিত।

চারিদিকে পুনর্ব্বার বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্ব ও ইতিহাস জানিবার জন্য আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগিয়াছে। বিদ্বেষবুদ্ধিকে পরিহার করতঃ প্রসারিত বাহুতে আমরা ভারতমনীষীর সেই অবিনশ্বর নিদর্শনকে পুনর্বার স্বাগত করিতেছি। আর বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে দেখিতেছি গৌরবের রাজচ্ছত্র শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেব ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উপরে এখনও পূর্ব্ববৎ বিরাজ করিতেছে।

সমগ্র পৃথিবীর ১৬০ কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ কোটি অধিবাসী এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। আচার ব্যবহার জাতি ও অবস্থা সকল বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে অসংখ্য প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও ইহারা এখনো পরম কারুণিক শাক্যমুনির চরণ তলে ভক্তিভরে প্রণত হয় এবং তাঁহার মধুর উপদেশাবলীর অনুশীলন করতঃ দুঃখ জ্বালা হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ জাপান হইতে পশ্চিম প্রান্তস্থ তাতার পর্য্যন্ত, উত্তরে মঙ্গোলিয়া হইতে দক্ষিণে সুমাত্রা ও যবদ্বীপ পর্য্যন্ত অগণিত প্রাণী আজও তাঁহার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করতঃ দুঃখে সান্ত্বনা, উৎসবে অপ্রমাদ, প্রিয়জন বিচ্ছেদে শান্তিলাভ করিয়া ধন্য হয়—তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর আলোকে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করে। প্রতিনিয়ত অসংখ্য মন্দিরে আজও কপিলবাস্তুর সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে ধূপ দীপ জ্বলে ও আরতি কিঙ্কিনী ধ্বনিত হইয়া থাকে। কত স্তূপ, কত স্তম্ভ, কত গুহা তাঁহার জীবন কাহিনীর চিত্র অঙ্গে ধারণ করতঃ পবিত্র হইয়াছে—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কত চৈত্য, কত বিহার, কত সঙ্ঘালয় সেই এক মহাপুরুষের বিভূতির সাক্ষ্য দিতেছে—তাহার কে পরিমাণ করিবে? যদি শিষ্য প্রশিষ্যের সংখ্যা লইয়া ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে নির্ব্বাণোপদেষ্টা ভগবান্ তথাগতের আসন সকলের উচ্চে। কেননা প্রতিবৎসর সম্যক্ বিভিন্ন এক কোটি মানবকে তিনি ভক্তরূপে পাইয়াছেন এই ভাবে গণনা করিলেও বুঝা যায় যে কুশীনগরে তাঁহার তিরোভাব হইতে আজ খ্রীষ্টীয় ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত দ্বিসহস্রাধিক কোটি মানব তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্রের তলে শান্তি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু মস্তক গণনা দ্বারা ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে এরূপ বিচার করা কাহারও মনঃপূত হইবে না। তাহা না হইলেও এই অগণিত জনসমুদ্র কেন যে শতাব্দীর পর শতাব্দী বৌদ্ধ ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছে—কেন যে ইহাকে পরম শান্তির আকর ভাবিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে—তাহার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন নহে! একজন প্রতীচ্য দার্শনিক বলিয়াছেন—মহাপুরুষ তিনিই, যাঁহার সত্তা ও কার্য্যকলাপের সহিত আমার কোনরূপ সম্বন্ধ বা সাকর্ম্ম্য আছে বা থাকিতে পারে। যদি এরূপ সংযোগ সূত্র না থাকে তাহা হইলে তিনি আমার পক্ষে মহাপুরুষ নহেন—কেন না তাঁহার বাসনা বা ভাবনা, প্রয়াস বা অনুভূতির দ্বারা আমি চালিত হইতে পারি না। ইন্দ্রদেব সহস্র বৎসর তপস্যার ফলে কোন অতীন্দ্র বিভূতি লাভ করিলেন এ কাহিনী আমার অলস বৃত্তিনিচয়কে তপশ্চর্য্যায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যদি দেখি আমার সমাবস্থ কোন পুরুষ—অতিমর্ত্ত্য বা অতিমানুষ না হইয়াও—আধ্যাত্মিক বা মানসিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন—তখন সেই আপনার জনের উদ্যম ও সহিষ্ণুতায় আমি অনুপ্রাণিত হই—আশান্বিত হই—সচেষ্ট হই। ভগবান্ তথাগতকে যে পৃথিবীর এত লোক জীবনের আদর্শ ও পথনির্দ্দেশক বলিয়া বরণ করিয়াছে তাহার কারণ ইহাই—তিনি অতিমর্ত্ত্য বা অতিমানুষ ঐশ্বর্য্যের দাবী করেন নাই—দৈবী শক্তির বা ঐশ্বরিক প্রেরণার অধিকারী বলিয়া নিজেকে খ্যাপন করিতেন না। বারাণসীসন্নিকটস্থ মৃগদাবে যখন প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয় তখন অষ্টবিধআর্য্যমার্গোপদেশ প্রসঙ্গে ভগবান্ তথাগত অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিলেন যে তাঁহার মতামত বেদাধ্যয়নের ফলে বা অন্যের উপদেশ শ্রবণের ফলে গঠিত হয় নাই—কিন্তু তাঁহার নিজ যুক্তি ও সহজ সংস্কারের প্রয়োগেই লব্ধ হইয়াছিল। সাধারণ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ কিন্তু নিজ নিজ ধর্ম্মের মূল যুক্তিতর্কের অতীত বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। ফলে তাঁহাদিগের উপদেশ হয় অবিচারিত চিত্তে গ্রহণ করিতে হয় অথবা একেবারে প্রত্যবায় করিতে হয়। ভগবান বুদ্ধদেব সাধারণ কর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের এই উচ্চ ও অবিচারণীয় ভিত্তি হইতে নামিয়া আসিয়া

সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনার নিম্নস্তর আশ্রয় করিলেন ফলে প্রত্যেক মানব স্বাধীন আলোচনার দ্বারা তাঁহার উপদেশ ও শাসন পরীক্ষা করিতে সুযোগ পাইল। তিনি স্বল্পজন বোদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় নিজ উপদেশ বিতরণ না করিয়া আপামর জনসাধারণের প্রযুক্ত পালি ভাষায় প্রচার কার্য্য সম্পাদন করেন—ফলে বৌদ্ধের আর কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ভাব বিনিময়ের একটী সুগম পথ সৃষ্ট হইল।

যে দিক্ হইতেই এই মহাপুরুষের জীবনীর আলোচনা করা যাউক না কেন, ইহাতে একটী পূর্ণ মানবতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে দুই জাতীয় চরিত্র দেখিতে পাই প্রথমতঃ যাঁহারা জন্মাবধি সংসারের ভোগ হইতে দূরে থাকিয়া আপন আপন সত্তার অখণ্ড বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা সাংসারিক ভোগে লিপ্ত হইয়াও অন্তর্নিহিত বিরক্তির বলে পদ্মপত্রস্থ বারিবিন্দুর মত অথবা সূচ্যগ্রস্থ সরিষার মত প্রপঞ্চ হইতে অপসৃত হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকদেব, যীশুখ্রীষ্ট, দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ শাক্যমুনি, মহম্মদ ও চৈতন্যদেব। এখানে "প্রথম" ও "দ্বিতীয়" বিশেষণ দিয়া ইহাদের একটাকে উচ্চে ও অপরটিকে নীচে বলিয়া ইঙ্গিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তবে দুই ছত্র ইংরাজি কবিতা এই স্থলে মনে পড়ে—

It is better to have looked and lost
I have never to have loved at all.

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হইয়া যিনি তাহাদিগকে হেলায় ত্যাগ করিতে সমর্থ তিনি চির বিরক্তদিগের সমকক্ষ কিনা বিচার করিতে চাহি না কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা যে ব্যাপক ও পূর্ণতর তাহা নিশ্চিত—এবং সাধারণ মানুষের সহিত তাঁহার সাধর্ম্ম্য যে অধিকতর তাহাও স্পষ্ট। এই জন্যই শ্রীভগবানের নবম অবতার শাক্য পূর্ণাবতংসের জীবন কাহিনী আমাদিগের এত চিত্তাকর্ষক এত শিক্ষাপ্রদ। শ্রাবস্তী নগরীতে মচ্ছরি কোসিয় সেট্‌ঠিকে তথাগত শিক্ষা দিয়াছিলেন—

যথাপি ভমরো পুপ্‌ফং বণ্ণ গন্ধং অহেঠয়ং
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনী বরে।

ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে বর্ণ ও গন্ধ নষ্ট না করিয়া মধু আহরণ করিয়া পলায়ন করে মুনিও সেইরূপ জনপথে বিচরণ করিয়া থাকেন। সিদ্ধার্থ যখন গৃহত্যাগ করেন তখন পার্থিব ভোগের সামগ্রী সকল—আকাঙ্ক্ষার বস্তু নিচয় চারিদিক হইতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতেছিল, কিন্তু—

উয্যুঞ্জন্তি সতীমন্তো ন নিকেতে রমন্তি তে
হংসা ব পল্ললং হিত্বা ওকমোকং নহন্তিতে।

স্মৃতিমান্ উদ্যোগী পুরুষ যাঁহারা তাঁহারা গৃহে সুখ পান না। হংস যেমন পল্লল ত্যাগ করতঃ চলিয়া যায় তাঁহারাও সেরূপ গৃহ ত্যাগ করেন। নানা দেশ ও নানাজাতির অসংখ্য ভক্তের মানসমরাল সুগতদেব যখন এইরূপ পল্বলের প্রায় কপিলবাস্তুর রমণীয় প্রাসাদ ও বিলাসোপবন প্রীতিনিবদ্ধ হৃদয়া মহিষী ও সদ্যোজাত কুমার, জনক ও সহচর-বৃন্দকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যান—তখনকার সে বিষাদের দৃশ্য কত ভক্ত কবির মহাপরিনিষ্ক্রমণ কল্পনা, ও লেখনীকে উচ্ছ্বাসিত করিয়াছে? এই মহা প্রব্রজ্যার এই মহাপরিনিষ্ক্রমণের কাহিনীতে কারুণ্যের অনন্ত উৎস নিহিত আছে—ইহা অগনিত জীবের হৃদয়ে যুগে যুগে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা Detroit সহরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন I wish I had one infinite small part of Buddha's parts—প্রকৃতই, মৈত্রী, করুণা, মুদিতার অবতার ভগবান তথাগতের কার্য্যাবলীতে যে উদার ও মহান্ অপরিমেয় বল অথবা কুসুম সুকুমার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বর্ণনার অতীত। সমস্তই যেন দূরে দিকচক্রবালের প্রান্তস্থিত অদ্রিরাজ হিমালয়ের অবয়ব সংস্থানের মত—শ্যামল ও নয়নাভিরাম—বিস্তৃত ও কোমল সকলই সজীব ও সরস সুহৃদয়তায় ও সহানুভূতিতে প্রাণ স্পর্শী। কোথাও রুক্ষতা বা কর্কশতার লেশ নাই—নির্দ্দয়তার চিহ্ন নাই। তীব্র বৈরাগ্যের মধ্যে মধুর প্রেম যেন অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সর্ব্বত্র বহিয়া যাইতেছে। সুজাতার আতিথ্য স্বীকারে, পিতার আদেশে বৃদ্ধাবস্থায়

কপিলবাস্তু প্রত্যাবর্ত্তনে, প্রিয় সহচর আনন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সঙ্ঘ মধ্যে ভিক্ষুনীর স্থান নির্দ্দেশে, তাঁহার এই পেলব হৃদয়ের পুনঃ পুনঃ পরিচয় পাই। মুণ্ডিত মস্তক, মণ্ডিত শ্মশ্রু শুষ্ক পীতবসন ভিক্ষুশিরোমণি যখন নিজ পিতৃরাজধানী কপিলবাস্তুতে ভৈক্ষ্যচর্য্যা অবলম্বন করিলেন—তখন অভিমানিনী আবিক্ষামা শীর্ণদেহযষ্টি যশোধারার সহিত বহু বৎসর পরে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পার্শ্বচর শিষ্যদ্বয়কে তিনি আদেশ করিলেন, ভিক্ষুধর্ম্ম বিরুদ্ধ হইলেও বিচ্ছেদ বিহ্বলা যশোধারা যদি তাঁহাকে স্পর্শ করে যেন নিবৃত্ত করা না হয়। উন্মত্তার প্রায় ছুটিয়া আসিয়া যশোধারা তাঁহার পদে পতিতা হইলেন। কিন্তু ভিক্ষুর শান্ত ও স্থির মুখাকৃতি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল—

"ইদানীমাবয়োর্ম্মধ্যে সরিৎ সাগর ভূধরাঃ"

তিনি কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন—উভয়ের মাঝে অনন্ত ব্যবধান। সে সময়ে ভগবান তথাগতের ধৈর্য্য অটল, বিরক্ত অথচ করুণ তথাগতের হৃদয়ে কি ভাবের উদ্রেক হইয়াছিল—কে বলিবে? মাধ্যাকর্ষণ শক্তির লোপ হইলে, পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রশান্ত সাগরের অনুদ্বেল জলরাশির ভিতর কি স্রোত বহে—তাহার কে ধারণা করিবে? তিনি অবিকম্পিত স্বরে অবিক্ষুব্ধা কারেঙ্গিতে জাতকের একটী গল্প বলিয়া জন্মজন্মান্তরেও যে যশোধারা তাঁহার প্রতি এমনই অনুরক্তা ছিলেন তাহা বিবৃত করিলেন। ইহার পর চল্লিশ বৎসরাধিক গত হইলে অশীতি বর্ষ বয়সে শাক্যসিংহ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। পাবা নামক স্থানে চুন্দ বলিয়া পরিচিত এক অন্ত্যজের গৃহে তিনি অতিথি হন। চুন্দ নিজ আচারানুসারে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার জন্য তরুণ বরাহ মাংসের সহিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া দেয়। আহারান্তে দ্বিপ্রহরের পর তিনি কুশীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুষ্পাচ্য বরাহ মাংসাহারে উদরের পীড়ায় যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, অর্দ্ধপথে কুকুৎস্থা তীরে তীব্র পিপাসায় কাতর হওয়ায় নিত্য সহচর আনন্দ নদীর জল আনিয়া তাঁহার পিপাসা শান্তি করিল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সেই নদীতে শেষবার স্নান করিলেন। প্রদোষে কুশীনগরে উপনীত হইয়া মুমূর্ষ অবস্থায় আনন্দকে

নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি গত হইলে চুন্দকে বলিও যে সে ভবিষ্যৎ জন্মান্তরে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হইবে—কারণ চরম সময়ে আমি তাহারি অন্ন গ্রহণ করিয়াছি। বলিবে আমি নিজ মুখে কথা বলিয়াছি। বোধিবৃক্ষ তলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে সুজাতার দান এবং মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বে চুন্দের এই দান—এই দুইটী সকল দান মধ্যে প্রথিত ও ধন্য জানিবে।" এসিয়ার ভাস্কর—জগজ্জ্যোতি বুদ্ধদেবের এই অন্তিম কাহিনী পড়িতে পড়িতে হৃদয় শান্তরসে আপ্লুত হয়, এই মহাপরিনির্ব্বাণের কথার আলোচনা করিতে করিতে সংসারের অনিত্যতা মানস সমক্ষে যেন স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই অনিত্যতা উপলব্ধি করাইবার জন্য শ্রীভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তথাগত বলিতেন অনিত্য বস্তু নিচয়ে যে তৃষ্ণা তাহাই দুঃখের কারণ। এই তৃষ্ণা পরিহার করিলে দুঃখেরও অন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত মানবের পক্ষে এই তৃষ্ণা পরিহার অতি দুরূহ। একমাত্র উপায়—অষ্টবিধ আর্য্যমার্গ অবলম্বন করতঃ নির্ব্বাণ মুখে অগ্রসর হওয়া। এই পথ ধরিতে গেলে প্রদীপ স্বরূপ হইবে—প্রজ্ঞা ও ভূতদয়া। প্রজ্ঞার সাহায্যে মানবসত্তার যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। জেতবনে রূপনন্দ থেরীকে সম্বোধন করতঃ তথাগত দেহের স্বরূপ পরিব্যক্ত করিলেন—

অট্‌ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিত লেপনং
যত্থ জরা চ মচ্চু চ মানো মক্খো চ উহিতো।

অস্থির নগর নির্ম্মিত হইয়াছে—মাংস ও রক্তে তাহা লিপ্ত—জরা, মৃত্যু, অভিমান ও কাপট্য (ভ্রক্ষ) তাহার অধিবাসী। অনেক অন্বেষণের পর নির্ব্বাণের অধিকারী এই গৃহের নির্ম্মাতার সন্ধান পাইয়া থাকেন।

গহ কারক দিট্‌ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে কামুকা ভগ্‌গা, গহকুটং বিসঙ্খিতং
বিসঁঙ্খারগতং চিত্তং তনহানং খয় মজ্ঝাগা।

হে গৃহকারক এইবার তোমায় দেখিয়াছি, আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। তোমার সকল কাষ্ঠ দণ্ড ভগ্ন হইয়াছে—গৃহকূট নষ্ট

হইয়াছে। নির্ব্বাণ গত আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দেহগেহের নির্ম্মাতা হইতেছে তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ ও মোহ—কাষ্ঠদণ্ড সকল, গৃহকূট-অবিদ্যা।

বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি রহস্যের সমাধান করিতে ব্যস্ত নহে। এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সত্ত্বেও সে রহস্য অসমাহিতই রহিয়াছে। মালুঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বিশ্ব কি শাশ্বত বা অশাশ্বত? "উত্তরে বোধিসত্ত্ব নীরব রহিলেন। সমবেত মনুষ্য জাতির মনীষা আজও এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মূক রহিয়াছে। কিন্তু কর্ম্ম ব্যাপৃত মনুজের মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধে এবং সমাজ বদ্ধ জীবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ রাশি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্তরে সঞ্চিত আছে—তাহা মানব জাতির চিরন্তন ও সাধারণ সম্পদ—তাহার মূল্য এখনও অপরিহীন ও অক্ষয্য। বৌদ্ধ গ্রন্থের চরম শিক্ষা এই যে কর্ম্মের সহিত কর্ম্ম ফলের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, ইহার ব্যতিক্রম নাই। এই কর্ম্ম ফল বর্ত্তমান জন্মেই ভুক্ত না হইতে পারে কিন্তু তাহা নষ্ট হইবার নহে—দেহের উপচয় অপচয় স্থিতি ও নাশের অপেক্ষা না করিয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের এই অনিবার্য্য স্রোত বহিয়া যাইতেছে ও যাইবে। যিনি এই স্রোতের প্রবর্ত্তক তিনিই কল্যাণ কর্ম্ম দ্বারা ইহার নিবর্ত্তক হইতে পারেন—অন্যে নহে। জেত বনে ভগবান শিখাইলেন—

অত্তনাহব কতং পাপং অত্তনা সঙ্কিলিস্পিত
অত্তনা অকতং পাপং অত্তনাহব বিসুজ্ঝতি
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং নাহঞ্‌ঞো অঞ্‌ঞং বিসোধয়ে।

স্বয়ং পাপ করিলে (জীব) স্বয়ং ক্লিষ্ট হইতে হয়। নিজে পাপ না করিলে জীব নিজে বিশুদ্ধ থাকে; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি আত্ম নিষ্ঠ অন্য অন্যকে শুদ্ধ করিতে অসমর্থ। আর্য্য ঋষিরা বলেন—উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। সংসারে পাপ ও দুঃখের হ্রাসের জন্য তাই গৃহী শ্রমণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই উদ্যম করিতে হইবে। জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম—অপ্রমাদ ও বীর্য্য অবলম্বন করা। দ্বেষ, হিংসা নিবারণের অমোঘ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া তথাগত বলিলেন—

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীক কুদাচন।
অবেরেণ চ সম্মন্তি এস ধাম্মো সনন্তনো।

এ জগতে বৈরের দ্বারা বৈরোপশম হয় না। অবৈরের দ্বারা বৈর শান্ত হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। পৃথিবীর যাবতীয় মানবকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিলেন—

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো
বেরিনেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিনো
সুসুখং বব জীবাম আতুরেসু অনাতুরা
আতুরেসু মনুসেস সু বিহরাম অনাতুরা
সুসুখং বত জীবাম উস্সুকেসু অনুস্সুকা
উস্সুকেসু মনুস্সেসু বিহরাম অনুস্সুকা।

এস বৈরিগণের মধ্যে বৈরহীন হইয়া আমরা সুখে বিচরণ করি,—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান প্রভৃতি ক্লেশাতুরগণের মধ্যে এস আমরা অনাতুর হইয়া সুখে জীবন যাপন করি। পঞ্চকামাসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে এস আমরা অনুৎসুক বা অনাসক্ত হইয়া আনন্দে বিচরণ করি। রিপুর আকর্ষণে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান জীবগণ কবে এই আহ্বান স্বীকার করিয়া সমস্বরে শুদ্ধ সঙ্কল্পভরে বলিবে—"ওম্"? তখনি বোধ্ করি বোধিবৃক্ষতলে পদ্মাসনাসীন বোধিসত্বের যুগ যুগ ব্যাপী ঐ ধ্যান যে ধ্যান বেষ্টন করিয়া ষড়ঋতুর নৃত্য শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়াছে—যাহার চতুষ্পার্শ্বে মারের লীলা আজ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে—সেই নিবাত নিষ্কম্প ধ্যানের অবসান হইবে। তখন যুগপৎ মেত্তভাবনা, করুণা-ভাবনা, মুদিতা ভাবনা, অশুভ ভাবনা ও উপেক্ষা ভাবনায় মুদ্রিত ঐ নয়নপদ্মযুগল উন্মিলিত হইবে। স্থির শান্তিতে অকুঞ্চিত ঐ অধর পল্লবে ঈষৎ স্মিতরেখা অঙ্কিত হইবে ঝঞ্জায়ত স্থানুসম ঐ শরীর দণ্ডায়মান হইবে এবং আসন পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয় বুদ্ধ প্রসারিত উত্তান করে শান্তি বিতরণ করিতে করিতে ভক্তি বিস্ময় বিনম্র মানব জাতির অভিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিবেন।

সুখের কথা।

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী)

তোমরা সুখের কথা কহিতে ভালবাস। সত্যই ত, দুনীয়ায় সুখ চায় না কে? যে বৈজ্ঞানিক ইহকাল পরকাল ভুলিয়াছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাসকে পর্য্যন্ত সগর্ব্বে উড়াইয়া দিয়াছে, প্রত্যক্ষবাদী সাজিয়া বলিয়াছে—যতটুকু চক্ষে দেখিতেছি তাহাই সব, অতীন্দ্রিয় যাহা কিছুর কথা সকলই কল্পনাবাজি। তাহারও সমস্ত শক্তি সমস্ত জ্ঞান সমস্ত উচ্ছ্বাসের মূলীভূত উৎস—প্রভূততমের প্রচুরতম সুখ সাধন। আবার ঈশ্বর ও পরকাল যে পূজানিরত ধার্ম্মিকের অবলম্বন তাঁহারও সমস্ত মন একাগ্র লক্ষ্যে সন্ধান করিতেছে—সুখস্বরূপ ভগবানের শ্রীচরণ আর সুখেরনিলয় স্বর্গ। আবার তত্বজ্ঞ জ্ঞানীশিরোমণি জগতের নিগূঢ় রহস্যের প্রান্তে দাঁড়াইয়া সত্যের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা নির্দ্দেশে তাঁহার নির্দ্দেশকে বিশেষিত করিতেছেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

নিশ্চেষ্ট পাদপ তাহারও পরিচর্য্যা করিয়া দেখ সুখের স্পর্শে কত সে পুষ্ট হইয়া উঠে। নির্ব্বোধ পশু তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাক সুখেরই সাড়ায় পুলকে আত্মহারা হইয়া সে তোমার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে। ছেলের জাত যত্ন বুঝে মানুষ ভালবাসায় আপন হয় সকলি এই সুখের সন্ধান।

কিন্তু—একবার বলত অকুণ্ঠিত সরল চিত্তে—পাওয়ার দিক দিয়া, জীবনে দিনের পর দিন কত দিন ত অতিবাহিত হইয়া চলিল—সুখ মিলিল কি? সাধকের মুখে করুণ সহানুভূতির বক্তৃতায় শুনিলাম—

—কিন্তু কোথা সুখ
মৃত্যু মুখে পশে শেষে।

কবির কণ্ঠে তরল উচ্ছ্বসিত আবেগে রোদনময়ী বেদনগীতি শুনিয়া চক্ষু মুছিলাম—"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল!"

আর সংসারের জীবন্ত নাটকে অভিনেতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কোন মর্ম্মচ্যুত কথা বাহিরিতে শুনিলাম—"আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!"

এইত আর এক দিক। সংসারে আছে সুখের প্রার্থনা সুখের অন্বেষণ—নাই সুখ। বহুদিন সেই সনাতন যুগ হইতেই এমনি বিধান চলিয়া আসিতেছে! এ আজিকার তোমার আমার নিরাশা নহে। তবুও কিন্তু সংসার সংসার, তবুও কিন্তু জীবনের লক্ষ্য সুখের অন্বেষণ। নিবৃত্তি নাই। ভ্রমের পর ভ্রম সংশোধনের পর সংশোধন—কত ভাঙা গড়া নূতন নূতন প্রবর্ত্তন তবুও বিশ্ব মানবের মনের পরিবর্ত্তন নাই, তাহার গতিপথ দিগন্তর আশ্রয় করিল না—সে ওই একই পথে চলিবে।—ওই সুখ চাহিবে, পাইবে না, হা হুতাশ করিবে, আবার চাহিবে। একি বিস্ময়কর ব্যাপার! সত্যই বিস্ময়!—এক পরম গুহ্য বিচিত্র রহস্য! আর তাহারই সমাধান ওতঃপ্রোতঃ ভাবে একে অপরের সহিত মিশিয়া গিয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া আমাদের বিভ্রম বাধাইতেছে! এই বিভ্রমজাল ছিন্ন করিতে পার তুমি মানুষ তোমাতে চৈতন্যের সঞ্চার হইয়াছে। না পার তুমি যন্ত্রারূঢ় প্রকৃতির লীলাপুত্তলী—প্রাণের স্পন্দন সঞ্চালিত জড়ের সমবায় মাত্র।

কি বিচিত্র সমারোহেই না মানুষ বাঁধিয়াছে তাহার জগৎরূপী এ ঘর। জগৎ বলিব না, বলিলে হয়ত উপযুক্ত সম্ভ্রম সহযোগে এ নাম উচ্চারণ করা হইবে না! যুগ যুগান্ত ধরিয়া যে জাতির পর জাতির ইন্ধন জমা হইয়া মানবের এই স্তূপ পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে—তাহার এই গৌরবের বস্তু—এই civilization—আর কি ইহাকে ছোট নামে ডাকা যায়? এই যে রাজস কর্ম্মচঞ্চলতা আর তামস অনুভূতির মূলাধার রূপী একটা জমাট বাঁধা ভাব, এই যে মানবের নাকি প্রাণবস্তুঃ বিকাশ (practical world) যাহার স্থূল চিত্র, সেই বস্তুকে ক্ষুদ্র একটা মাত্র শব্দে জগৎ বলিয়া কেমন করিয়া ডাকি? তাই ডাকিতেছি civilization। সুখের লাগিয়া বিশ্ব মানব যে ঘর বাঁধিয়াছে তাহার নাম civilization এই ঘরের প্রত্যেক ইটখানিই বিদ্রোহ বিপ্লব

বাহিত—রক্ত কর্দ্দমে গাঁথা। ভারতের কুরুক্ষেত্র বাঙ্গালার সে দিনের মাৎস্যন্যায় হইতে জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক পরিবর্ত্তন প্রত্যেক অভ্যুদয়টীর কথা ভাবিয়া দেখ—ভাবিয়া দেখ ফ্রান্সের বিপ্লব নব্য-বিজ্ঞানের ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা ভাবিয়া দেখ বর্ত্তমান পৃথিবীর মানব সভ্যতার মূল স্তম্ভ capitalismএর একটু একটু ক্ষয়িয়া এক এক দেশে প্রতিষ্ঠার কথা, বুঝিবে এ মন্দিরে আর কোনও উপাদান নাই—কেবল আছে শোণিত অস্থি নিষ্পিষ্ট মেদ মজ্জা। সঙ্গে সঙ্গে একবার ক্ষণিকের মত মানুষ হইতে মানুষের এই civilizationএর আদর্শটা সরাইয়া লইয়া, কল্পনা পটে তাহার মূর্ত্তিখানি অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাও ত! দেখিবে না বটে অনেক মূল্যবান সামগ্রী! সেখানে মানুষের চতুরঙ্গ সুসজ্জিত কোষ বল আমাত্যময়ী রাজতন্ত্রেরঘটা নাই —সেখানে বিশাল বিপণী কর্ম্মশালা সজ্জিত সশস্ত্র তরণীমালা নাই—নাই ব্যোমযান বিদ্যুৎ উন্মত্তজীবন সংগ্রামস্রোতের হলহলা! তবুও কিন্তু এত না থাকার মধ্যে এমন কিছু দেখিবে যাহাকে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়! এমন কিছু দেখিবে যাহাকে দেখিয়া হয়ত বা মনে করিতে পার মানুষের এই উৎকট বেগময় আতিশয্য যাহাকে এতদিন ধরিয়া বিফলে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছে সেই ত এখানে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে রে?

এই যে ঘর বিশ্ব মানব ইহাকে কেন বাঁধিয়াছে সুখের জন্য। বড় গলায় বড় নাম দিয়া তাহাকে অবশ্য বলিতে পার উন্নতি। বস্তু একই। অবনতির মধ্যে সুখের নিশ্চিত নিরুপদ্রব প্রাচুর্য্যের নির্দ্দেশ দাও দেখি দেখিব কোথায় থাকে তোমার উন্নতি? বিজ্ঞানের এক একটা আবিষ্কার কেন হইয়াছে? আবিষ্কার না হওয়ার জন্য অসুবিধার সুখাভাব ঘটিয়াছিল। শিল্পের পর শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে কেন? প্রয়োজন সুখেরই অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাই। বিদ্যা ব্যবস্থা আচার শাসন সকলই সমবেতবহুর শৃঙ্খলা আনিতে, এই সুখেরই সর্ব্বজন উপভোগ্য উপায়ের সন্ধানের জন্য। ধর্ম্মেরও স্থাপনা, বাহিরের চেষ্টায় অকৃত কার্য্য হইয়া অন্তরের দিক দিয়া ওই ব্যবস্থা শাসন

প্রভৃতির কৃতকার্য্যতার জন্য। মোটের উপর মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে সবই আপনাকে অসুখী বলিয়া জানিবার পর করিয়াছে। সুখের চেষ্টাতেই করিয়াছে। এই বিচিত্র আয়তন যুগযুগান্তর গঠিত মানবের চেষ্টা-রাজ্য যাহা আপনার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে বলিলেই হয় সে দুঃখিমানবের রচনা। সুখের জন্য রচনা। যদি রচনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, মানব ইহার মধ্যে সুখের সন্ধান পাইয়া থাকে, তবে ইহার বিকাশ শেষ হইয়া গিয়াছে। আর অতিরিক্ত ফুটিবার কিছুই নাই।

কিন্তু তা ত হয় না, হইবেও না। civilization আপনার এ ঘর যেমন করিয়াই গঠন করুক—এ যে অনন্ত কালের বিধান, গঠন সম্পূর্ণ কিছুতেই হইবে না। যে সম্পূর্ণতার কল্পনা লইয়া এক যুগের কর্ম্মী প্রাণপাত করিয়া যান, সেই সম্পূর্ণতার উপর পরবর্ত্তী যুগে তাঁহাদেরই পদাঙ্কগামিগণ দেখিতে পান—অতিরিক্ত অনেক কিছু সন্নিবেশের প্রয়োজন। সে সম্পূর্ণতার সম্ভাবনা জাগিবার পূর্ব্বেই তাহার অসম্পূর্ণতা বাহির হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান আবিষ্কার হইবার পর বিশ্ব মানব দেখিল আবিষ্কারই তাহার চেষ্টার সফলতা। যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আবিষ্কার—সে এই আবিষ্কারের অনেক দূরে—তাহার জন্য আরো অনেক কিছু চাই। বিদ্যা ব্যবস্থা আচার শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া মানুষ দেখিল যে জটিলতা দেখিয়া তাহার কল্পনায় এগুলি আসিয়াছিল এখন এগুলির সহযোগে তাহার সে জটিলতা আরো বাড়িয়া গিয়াছে মাত্র। শিল্প সৃষ্টি করিয়া দেখিল সে অভিমন্যুরই মত প্রয়োজনের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, এখন আপনি মরা বরং সহজ, ইহাদের মারিয়া বাহির হওয়া বড়ই কঠিন।

এমনি করিয়াই civilizationএর সুখের ঘর আগুন লাগিয়া দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। কোথায় সুখ আর কোথায় বহ্নি দাহ।

ব্যষ্টির সুখ সুখাশার অবসান ও সুখের লাগিয়া রচিত ঘরে বহ্নুত্থমের চট্ চটা ধ্বনি তাহাই প্রবন্ধের অগ্রে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু এতক্ষণ যাহা বলিলাম সমষ্টির কথা। সমষ্টি কবিতা বা সুখের

বিলাপে আপনার ব্যথা জানায় না। সে জানায় সমর কোলাহল ভৈরব ধ্বনিতে আ দিঙ্মণ্ডলব্যাপী মুখরিত আর্ত্তনাদে হত্যাকাণ্ড মধ্যে। সে সব কথা থাক একটু ব্যষ্টির কথা বলি।

সমষ্টি রূপ যে মরীচিকাকে দেখিতেছে civilizationরূপে, ব্যষ্টির চক্ষে তাহারই দীপ্তি মায়া। তুমি আমি মায়াবদ্ধ বলিয়াই জগতের সৃষ্টি। এই জগৎ প্রপঞ্চকে সমষ্টি বদ্ধরূপে ব্যাখ্যা করিবার civilizationএর মত এমন উপযুক্ত শব্দ আর খুঁজিয়া পাইতেছি না। ব্যষ্টি মায়া বলিয়া যাহাতে আবদ্ধ হইতেছে সমষ্টির চতুর্দ্দিকে তাহারই ঠাস বুনুনি এই civilization.

বস্তুতঃ মায়া কি? মায়া তাহাই যাহা তোমার অ মার জীবনকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া অবিরত অর্থহীন প্রদক্ষিণের আবর্ত্ত রচনা করিতেছে। যাহার বেগ অর্থহীন লক্ষ্যহীন কেবল গতির দাপটে রুদ্ধশ্বাস যাহা কোনও দিনই আপনার লক্ষ্যে পৌছিবে না।

যেমন সুখ তৃষ্ণা। সমষ্টি ব্যষ্টি যাহার জন্য অবিরত হৃদয়ের রক্ত তিল তিল সিঞ্চিত করিয়া আশায় স্ফীত হইয়া উঠে আবার সেই উঠারই নিশ্চিত পরিণাম স্বরূপ নিরাশায় জ্বলিয়া উঠে—সেই সুখ তৃষ্ণা।

সুখের কথাই বলিতে বসিয়াছি। তোমরা কত বেহাগে মল্লারে কত পূরবীতে ইমনতানে কখনও বা কত দীপকের উদ্দীপ্ত রাগে সুখের গান শুনিয়াছ। কখনও কাঁদিয়াছ কখনও মুগ্ধ হইয়াছ কখনও স্তব্ধ হইয়াছ কখনও বা জ্বলিয়া উঠিয়াছ। আজি আমি শুনাইব এ যাহা স্বর নহে ঝঙ্কার নহে—ভাষাও নহে। এ এক কি—তাহা আমিও এখনও সবটা বুঝি নাই। এখনও মানবে তাহার সবটার মীমাংসা করিতে পারে নাই।

আমি শুনাইব সুখেরই কথা—ঠিক সুখটুকু,—সুখ বলিতে যাহা জান তাহারই রহস্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটুকু। হাসিও না—অবাক হইও না। তুমি সুখ চাহিতেছ অর্থে বুঝায় কি? তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা যথেষ্ট নহে—আরো চাও—সেই আরো যে কি তাহাও জান না। আমাকে বিশ্বাস কর—কেহই তাহা জানে না। ঐ চাওয়াটারই অস্তিত্ব

আছে। কুহকিনীর যাদু মন্ত্রের অবগুণ্ঠনের মত আরো পদার্থ টী তাহারই চারিদিকে ঘেরা এক নীবিড় অজ্ঞাত তথ্যপূর্ণ অপরূপ মণ্ডল। দৃশ্য—কি অদৃশ্য! অনুভবের পারে কি অতীতে—কেহই জানে না।

মানুষের সমস্ত অস্তিত্ব তাহার আপনার মধ্যে—অথচ এই আপনার বাহিরে তাহাকে ছুটাছুটি করিতে হইতেছে আপনাকেই সম্পূর্ণরূপে পাইবার জন্য, আপনার সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য। যেমন আপনার মুখ আপনি দেখিতে পাই না তেমনি আপনার চেতনাও আপনি কিছুই জানিতে পারি না। বাহিরে আসিয়া দেহটাকে আঁকড়িয়া তাহাকেই অবলম্বন করিয়া যতখানি বুদ্ধি দাঁড়াইতে পারে সেই পুঁজিটুকু খাটাইয়া বলি—আমি দেহী। সে জিনিষটা প্রতি নিমেষেই ধসিয়া ধসিয়া পড়িতেছে তাহাকে ত রাখিতে হইবে,—আরো বাহিরে যাইতে হয়, কোথায় সেই রাখিবার উপকরণ? উপকরণের পর উপকরণ তাহার পর উপকরণ এমনি করিয়া কত কি যে আঁকড়িতে হয়—কতদূর যে বিক্ষিপ্ত হইতে হয় তাহার আর স্থিরতা নাই। দূরের পর দূর উপকরণের পর উপকরণ অথচ যে বস্তুর জন্য তাহা, সে একেবারেই অসম্ভব প্রাপ্য। এমনি করিয়াই আমরা মায়ার শৃঙ্খলে জড়িত হই। শিব ভুলে জীব হই।

তাই ত বলি শ্রেষ্ট সুখ তাহাই যাহার নাম—সুখ নাই ইহা জানিয়া একটা স্থির স্থিতি।—কিন্তু কিছুই কি নাই! কিসের উপলক্ষ্যে এই গতিটা।

সে ওই আপনাকেই পাওয়া। আপনাকে পাইবার প্রকৃত স্থান ভুলিয়া বাহিরে আসিবার কালীন অনুভূত সে গতির বেগ তাহাকেই সুখ বলিয়া বুঝিতেছি, কিন্তু প্রকৃত কথা কি? আপনাকে পাইবার প্রকৃত স্থান চিনিয়া অন্তরে ফিরিবার জন্য যে যাত্রা তাহারই গতির নাম সুখ। আর ইহারই নাম অমৃত।

অমৃতত্বই জীবনের লক্ষ্য—অমৃতেই সুখ।

মনুষ্যত্বের সাধনা

(৯)

ধর্ম্মে ও কর্ম্মে বিরোধ।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

"কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য ধরে প্রেম মহাবল।" আর একবার সেই সুন্দর কথাটী বলিতে ইচ্ছা হইতেছে "যাহারা নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।" পান্নার ন্যায় কৃচ্ছ্র সাধনের মহাবল, পান্নার পক্ষেই সম্ভব।

সাধারণ ধর্ম্মমতে ও কর্ম্মবাদে যেন চিরকালই একটা বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কর্ম্মের কথা উঠিলেই সেই সঙ্গে বৃথা কর্ম্মের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। প্রতীচ্যে এখন কর্ম্মযুগ, প্রাচ্যেও যে তাহার প্রভাব আসিয়া পড়ে নাই এমন নয়, তথাপিও এই যে কল কারখানা যুদ্ধবিগ্রহ এ সব প্রাচ্য প্রকৃতির সহিত মিশ খায় না। তদ্ভিন্ন কর্ম্মসাধনা এক কথা, কর্ম্মোন্মত্ততা অপর কথা। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে অকারণে কিছু ঘটে না। তন্ত্র শাস্ত্র যুগানুযায়ী নানাভাবে ইষ্টমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন; কখনও শুভ্রবসনা শ্বেতশতদলবাসিনী স্মিতহাসিনী বীণাপাণি, কখনও দিগ্‌বসনা খড়্গাকরা কপালমালিনী কালিকা; কখনও সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী জননী জগদ্ধাত্রী, কখনও বা সর্ব্বত্যাগী শ্মশানচারী প্রলয় দেবতা শিব। পূজোপকরণ কখনও ষোড়শোপচার, কখনও বা গঙ্গাজল বিল্বদল মাত্র। কখনও শ্বেতচন্দন ও শুভ্র কুসুম, আবার কখনও বা রক্তজবা রক্তচন্দন শোণিতধারা। শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস তাঁহার রচিত গীতে বর্ত্তমান যুগকে 'কর্ম্মযুগ' আখ্যা দিয়াছেন। * কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, বিচিত্র

---

* সময় ফিরিয়া কেবা পায়? (যা' যায়)
কেবল শুনিনু কানে, না চাহিনু তার পানে
বৃথা উপেখিনু তারে হেলায় হেলায়।

মানবজীবনের ব্যক্তিগত রুচি বৈচিত্র্যে, জাতিগত ভাব বৈচিত্র্যে ও দেশ কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়া যখন যে কোন ভাবে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ হইয়াছে, সকল সময়ে কর্ম্মই তাহার অবলম্বন, কিন্তু যখন এবম্বিধ প্রকাশ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণতা লাভ করে, যখন কর্ম্মী বা কর্ম্ম কিছুই থাকে না তখনই সমাধিরূপ মহাযোগের পরিপূর্ণ স্তব্ধতায় বিলীন হওয়া সম্ভব, তৎপূর্ব্বে চেষ্টাকৃত কর্ম্মত্যাগ; গীতা যেমন বলিয়াছেন ;—

"মোহাত্তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

মোহবশতঃ কর্ম্মত্যাগ তামস ত্যাগ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

"দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥"

দুঃখ, দৈহিক ক্লেশ অথবা ভয়ে যে কর্ম্ম ত্যাগ করে সে রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগ ফল শান্তি লাভ করে না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আমাদের মনে কতকগুলি সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায়। যেমন, পূজাঅর্চ্চনা, ব্রতনিয়ম, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, নিয়মিত উপাসনা, দান, বিশেষভাবে ভগবানের আরাধনার দিনে উপবাসাদি

এখনো যা কিছু আছে তাহারে ধরিলে এঁটে,
যে কটা দিন আছে বাকি আনন্দেই যেত কেটে',
কিন্তু এমন কপাল পোড়া, এমনি অভাগা মোরা
বিধি লিপি কপাল জোড়া কথায় কথায়।
আমরা যেন ফুট্‌বলে "কিক্" দিয়ে এই ধরা জিনি,
বিধিরে ভেবেছ বুঝি এম্‌নি একটা হাবা তিনি,
বিশ্বপতি কর্ম্মময় হাবা ছেলের বাবা নয়,
কর্ম্ম ভালবাসেন তিনি কর্ম্মীই তাঁর কৃপা পায়।
কর্ম্মক্ষেত্রে এসে যাঁরা কর্ম্মই করে না সাথী,
ক্ষণস্থায়ী যেন ভাই তাদের জীবন বাতি।
এই মহা কর্ম্মযুগে শান্তি নাই কর্ম্মব্যয়ে।
মুকুন্দ বরেছে কর্ম্ম শান্তিবারি পিপাসায়।

এইগুলি সাধারণতঃ আমরা ধর্ম্মাচরণ বলিয়া গ্রহণ করি। তদ্ভিন্ন অপর যাহা কিছু বৃথা কর্ম্ম। মধ্যেও আবার বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। জ্ঞানী "ইহা নয়, ইহা নয়" বলিয়া "নেতি নেতি"র পথ দিয়া চলিয়াছেন, ভক্ত নিখিল বিশ্বে ইষ্টরূপ দর্শন করিয়া "অস্তি অস্তি"র পথ দিয়া চলিয়াছেন। জ্ঞানী ভক্তের ভক্তিকে ভাবুকালী বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন, ভক্ত বলিলেন,—

"অভাগীয়া জ্ঞানী চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসিক ভকত পিয়ে প্রেমাম্র মুকুলে।"

খৃষ্টান যীশুকে যে না পরিত্রাতা স্বীকার করে তাহার অনন্ত নরকের ব্যাবস্থা করিলেন। দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণবের বিবাদ চির প্রসিদ্ধ। নিরাকার ও সাকারবাদ লইয়া কতই না বিচার বিতর্ক চলিয়াছে। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা রসিক বৈষ্ণব দ্বিভুজ মুরলীধরই তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য; নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের পতিত হইতে হয়। মুসলমানের মধ্যে সিয়া ও সুন্নিতে উভয় সম্প্রদায়ে বিরোধ শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী জৈন কেহ কাহারও দেবদর্শন করেন না, এইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদের বিরোধ শেষে এতদূর বাড়িয়া গিয়াছে যে বিধর্ম্মিবধও ধর্ম্মাচরণের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ ধর্ম্মের নাম নিয়া যতদূর অধর্ম্মাচরণ ও নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে অন্যত্র সেরূপ অতি অল্পই হইয়াছে।

মানব মহত্ব এই সকল মতবাদের কোন অপেক্ষা রাখেনা, রূপ ও অরূপের বিতর্কে তাহার কিছু যায় আসে না; অস্তি নাস্তির স্বীকার বা অস্বীকারে তাহার বৃদ্ধি অথবা হানি কিছুই হয় না। কোন ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি যদি একজন চিকিৎসককে তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করেন না বলিয়া অনুযোগ করিয়া এইরূপ উত্তর পান যে, "যতক্ষণ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া সময় নষ্ট করিব ততক্ষণ চিকিৎসার গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পড়িলে ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারিব;" তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বিস্মিত ও বিরক্ত হন। কিন্তু গীতা বলেন,—"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

"স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে। * চিকিৎসক যদি চিকিৎসকের কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় সাধন করিতে পারেন তবে তিনি কি তাঁহার সেই কর্ম্মসাধনের তপস্যাতেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পারেন না! কোন দূষিত ক্ষত অস্ত্র করিতে হইলে চিকিৎসকের হস্তে চর্ম্মাবরণী পরিধান প্রয়োজন হয়, কেন না যদি কোনরূপে তাঁহার শরীরে ক্ষতসংশ্লিষ্ট বিষ প্রবেশ করে তবে তাঁহার জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু অনেক সময়, চর্ম্মাবরণী হস্তে রাখা অনভ্যাস বশতঃ অস্ত্রোপচার যেরূপ দ্রুতভাবে করা প্রয়োজন তাহা হয়তো ঘটিয়া উঠেনা। এমন অবস্থায় কোন চিকিৎসকের হস্তে ক্ষত থাকা সত্বেও মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও তিনি অনাবৃত হস্তে রোগীর অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন। মুমুর্ষু রোগী জীবন পাইয়াছিল, কিন্তু চিকিৎসক কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। এইরূপে সেই চিকিৎসক নিষ্ঠা সহকারে স্বকর্ম্মের দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন চিকিৎসক নিজে সঙ্কটাপন্ন আহত হইয়াও কিছুদূরে পতিত কোন আহতের ছিন্ন ধমনী হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। নিজের অস্তিমবল প্রাণপণে সংগ্রহ করিয়া অতি কষ্টে তাহার নিকটস্থ হইয়া আহতের শিরামুখ বাঁধিয়া দিলেন এবং পরক্ষণেই অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কয়লার খাদের কোন কুলী সহসা পদস্খলিত হইয়া শত সহস্র হস্ত নিম্নে গভীর গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল, পড়িবার সময় সে নিজের প্রাণ ভয়ে চিৎকার না করিয়া এই বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল,—"সরে যাও, জিনিষ নামছে।" কোন ভারী দ্রব্য নামাইবার সময় গহ্বরস্থ কুলীদিগকে ঐরূপ চিৎকার করিয়া সাবধান করা হয়, সে নিজে পড়িবার সময় ও অপরের প্রাণহানি না হয়, সেইরূপ সাবধানতা সূচক চিৎকার করিয়া তাহার শেষ কর্ত্তব্য পালন করিল।

---

* যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মনা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।

সাধুসঙ্গ।

(দুলাল)

সন্ন্যাসী সত্যব্রত গঙ্গাস্নানে এসেছেন। তাঁর জ্যোতিবিচ্ছুরিত বরবপু একঘাট নরনারী অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছেল। স্বামিজীর দৃষ্টি গঙ্গার দিকে স্থির নিবদ্ধ। তিনি মৃদু গম্ভীরস্বরে 'তবজলমমলম্‌ যেন নিপিতং' ইত্যাদি আবৃত্তি কর্ত্তে কর্ত্তে দ্রবময়ী জননীকে প্রণাম—ও কয়েক বিন্দু বারিকণা পান ক'রে যখন সলিলে অবতরণ কর্‌লেন, তখন যেন মনে হ'ল একটী সহস্রদল পদ্ম কোন অনন্ত তেজোময় রবির পানে আকুল নয়নে চেয়ে প্রস্ফুটিত রয়েছে। তাঁর সুপ্রশস্ত ললাট প্রতিভার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত, উন্নত আর্য্যজনোচিত নাসিকা, হেমগৌরকান্তি, সুবিস্তৃত বক্ষদেশ ও দীর্ঘদেহ একটা দেখ্‌বার জিনিষ। সুন্দর গৈরিকে সেই বরঅঙ্গ আবৃত থাকায় তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। তাঁর স্তবপাঠ একটা শুন্‌বার জিনিষ, সে যেন গঙ্গার কলকল্লোলের চেয়েও শুভকর, পাখীর কলতানের চেয়েও সুমধুর, নারীর কলকণ্ঠের চেয়েও মোহনীয়। একে তিনি রূপবান্‌, তার উপর আকুমার ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, সে রূপের জোড়া এ জগতে আর কোথায় পাওয়া যাবে? তাই সেই অমরার দেবতাকে এ মরদেশের নরনারী অবাক হ'য়ে, আকুল হয়ে দেখ্‌ছিল, সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত স্তব্ধ হয়ে শুন্‌ছিল। স্নান-স্তোত্র-জপ শেষ হলে তিনি উপরে এলেন—তাঁর সঙ্গী তাঁকে একখণ্ড শুষ্ক গৈরিক বস্ত্র দিল—তিনি তাহা পরিধান করে ধীরে ধীরে বিস্মিত নরনারীর অতৃপ্তদৃষ্টির অন্তরালে মিশে গেলেন।

(২)

সে দিনের সেই বিস্মিত নরনারী গঙ্গার ঘাটে অপূর্ব্বরূপের কথা হয়ত' ভুলে গিছ্‌ল, কিন্তু বাসন্তীর তাহা জীবন মরণের সঙ্গী হয়েছে—তাহা তাহার জীবনকে আকুল করেছে—বিচলিত করেছে,—হয়ত

পরিবর্ত্তন করেছে। আজ তার স্নেহময় পিতার কথা মনে হচ্ছিল—সে অতি অল্প বয়সে মাতৃহারা হয়—পিতা ছিলেন তার বাপ-মা উভয়ই। তিনি গৃহে শিক্ষক রাখিয়া ও বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তাকে উত্তমরূপে শিক্ষিতা করেন। পনর' বছর বয়সে তার এক পরম রূপবান শিক্ষিত যুবকের সহিত বিবাহ হয়। বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিতা কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার বুক হ'তে পরের ঘরে গিয়েছিল, দশদিন না যেতে যেতে নিরাভরণা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে এসে পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। দশটী দিনের তরে তার সিঁথির সিঁদুর উজ্জ্বল হয়ে চিরদিনের জন্য মুছে গেল,—পিতা আদরিণী কন্যাকে অবলম্বন দেবার জন্য গৃহে পণ্ডিত রেখে উপনিষদ্‌, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি পড়ালেন। ধনী পিতা দিবারজনী আদরের শতধারা তার মাথায় ঢালতে লাগ্‌লেন, এত কর্‌লেন কিন্তু তাকে সংযম অভ্যাস করালেন না—ব্রহ্মচর্য্যের সহজ সরল নিয়মগুলি শেখালেন না। পাশের বাড়ীর অনিল,—তার বাল্যবন্ধু, প্রতিদিন তাদের ঘরে বেড়াতে আস্‌ত। গল্প গুজবে, খেলা-ধূলায় কয়েক ঘণ্টা কাটাত। অভাগিনী একদিন তার সঙ্গে এমন স্নেহময় পিতাকে পরিত্যাগ ক'রে অকূল অজানা সাগরে ঝাঁপ দিল। তার সঙ্গে বাসন্তী ভারতের বহু নগর ভ্রমণ ক'রল। দুই বৎসর পরে এই তৃষিত চরিত্র হীনের তৃষ্ণা মিটে গেল, তখন সে তাকে অসহায় ভাবে ফেলে পালালে! তারপর বহুকষ্টে পড়ে সে এক পতিতার আশ্রয় পায়—তার শিক্ষায় ও চেষ্টায় বাসন্তী আজ পতিতা-জীবনযাপনে বেশ পটু হয়েছে। সে এখন রূপকে না ভালবেসে অর্থকে ভালবাস্‌তে শিখেছে। রূপের হাওয়া তার মনকে চঞ্চল করলেও সে আর তার মুখে উধাও হয়ে যায় না—তবে তার চোখের উপর যে সব রূপ খেলা করে তা সুন্দর হলেও আবিলতা পূর্ণ। কিন্তু সে এমন অনাবিল, এমন আড়ম্বর শূন্য রূপ-সুধা আর কখনও পান করে নি। তারা এসেছে তার কাছে ভিখারীর মত—উন্মত্ত অসংযতভাবে, তার রূপের রাজ্যে দাস হতে, প্রজা হতে, আপনার সর্ব্বস্ব হারাতে,—আর ইনি এসেছেন রাজার মত, ইঁহার উন্নত সংযত দৃষ্টি যেন এ জগতের কিছুই দেখ্‌তে

চায় না, সে যেমন একটা পাথরের দিকে তাকায় না আবার তার সর্ব্বজনবাঞ্ছিত ভুবনভোলান অপরূপের দিকেও ঠিক তেমনি তাকয় না। গর্ব্বিতা এতদিন ভা'বত তার রূপের ফাঁদে না পড়ে এমন বুঝি ত্রিজগতে কেউ নেই। আজ তা'র সে গর্ব্ব ছুটেছে তাই সে এত চঞ্চলা,—এত অধীরা—অপরাজিতা আজ পরাজয়ের লাঞ্ছনা কোন রকমে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পার্‌ছিল না।

এক একবার ভাব্‌ছিল, 'কে তিনি, কিসের তরে তার জন্য এত ব্যাকুল হব, তার না আছে অর্থ, না আছে পার্থিব ভালবাসা; আমার এই নবীন যৌবন, অনন্ত রূপরাশি; কত ধনী ভ্রমর আমার ভালবাসার ফুলবনে ব্যার্থ প্রয়াসে রাতদিন স্তুতি ক'রে ঘুরে বেড়ায়, আর আমি সেই পাগলটার জন্যে পাগল হব।' এমন সময়ে তার দাসী এসে বল্লে 'বাবু এসেছেন' অকারণে দাসীকে হঠাৎ একটা ধমক দিয়ে বাসন্তী ব'লল, "তাকে আজ যেতে বল আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ, আজ দেখা হবে না।" বহুক্ষণ পরে দাসী পুনরায় ভয়ে ভয়ে ফিরে এসে বল্লে, "তিনি অনেক ক'রে বল্‌লেন, শুধু একটিবার দেখে যেতে চাই, আমি বস্‌বো না।"

বাসন্তী চোখ লাল করে উচ্চকণ্ঠে উত্তর ক'রল, "আ মর্ মাগী, জ্বালাতন কর্‌লি যে, তাকে বলে দে আর যেন সে কখনও আমার বাড়ীর দোর না মাড়ায়।" দাসী বার হওয়া মাত্র বাসন্তী সশব্দে দুয়ার বন্ধ করল। হরিপুরের জমীদার তরুণ যুবক সুনীলবাবু বাহিরে পরদার আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি অবাক হয়ে ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ কর্‌লেন। সুনীলবাবুকে তাড়িয়ে তার মনটা যেন এলো-মেলো হ'য়ে গেল—চিন্তার সূত্র যেন ছিঁড়ে গেল। আন মনে একথা ওকথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে মাঝে মাঝে সেই উন্নত বরতনু তার মনাকাশে ভেসে উঠতে লাগ্‌ল আর তার মনটা হুহু কর্‌তে লাগ্‌ল—যেন কোন অমূল্য রত্ন সে হারিয়ে ফেলেছে, যুগ যুগান্তের অন্ধতমিস্রার অন্তরালে তার হৃদয়মণি কে যেন চুরি করেছে; হয় তো এ জীবনে বা জীবনান্তরে তার আর সন্ধান পাওয়া যাবে না।

এমন সময়ে তার বন্ধু, তার শিক্ষক যার কৃপায় আজ সে মহানগরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা, নটবর এসে বহু চেষ্টা করেও বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে গেল। আজ যেন প্রকৃতির কাজ পাল্টে গেছে তাই অসময়ে বসন্তের বুকের উপর দিয়ে শীতের হাওয়া বইছে, তার কোকিল উ'ড়ে গেছে, তার সব ফুল ঝ'রে পড়েছে।

(৩)

গঙ্গার কিনারা হ'তে কিছু দূরে এক বাগানে স্বামী সত্যব্রত বাস ক'রছেন্। এই নবীন সন্ন্যাসীর মধুময় চরিত্রে আকৃষ্ট বহু নব্যযুবক ব্রতময় সমুন্নত জীবন যাপনে কৃত সঙ্কল্প।

সেই যুবকগণের হৃদয়ের আহ্বানে এই বনের দেবতা নগরে প্রতিষ্ঠিত। হিমারণ্যের সুকঠিন ক্রোড়ে যে আত্মা অনুক্ষণ চিদাকাশে বিচরণ ক'র্‌তো তাকে বহুর মধ্যে এমন কি কীটানুকীটের মধ্যেও পাবার জন্য আজ তিনি জনপদে। আত্মার মুক্তির জন্য যিনি অন্তরের গোপন ঘরে প্রবেশ করে ছিলেন, তিনি জগদ্ধিতায় তাকে নিযুক্ত করবার জন্য বাহিরে এসেছেন। বাহিরকে ভিতরে দেখিয়া আজ তিনি ভিতরকে বাহিরে দেখিতে প্রস্তুত। সেই জন্য যেখানে দুর্ভিক্ষের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে ওঠে সেই খানেই তাঁর অন্তরের দেবতাকে দেখ্‌তে পেয়ে তাঁর মনপ্রাণ ছুটে যায়। যেখানে অভাব, যেখানে অশান্তি সেই খানেই তাঁর দেবতাকে তিনি নির্য্যাতিত দেখ্‌তে পান, আর তাঁর মহাপ্রাণ হাহাকারে ফেটে পড়ে। তিনি দেখ্‌ছেন যত দরিদ্র, যত ক্ষুধিত, যত আতুর, যত মূর্খ, ওরা ছোট নয়, ওরা হীন নয়, ওরা দেবতা—নারায়ণ, পরব্রহ্মের বিকাশ। তাঁর কাছে আজ ব্রাহ্মণ কাঙ্গাল একাসনে ব'সছে, আর তাঁর মহাপ্রাণ দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তাঁদের সেবা করছে।

সেই সন্ন্যাসীর আগমনে আজ নগরে সাড়া পড়ে গেছে—দলে দলে উন্নতহৃদয় যুবকবৃন্দ তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছে, তিনি অরণ্যের বেদান্তকে ব্রাহ্মণের গুপ্ত মহামণিকে আচণ্ডালে বিলিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর, তাই স্থানে স্থানে সেই মহাবিদ্যা প্রচার করেন; তাঁর প্রচারকালীন

সভাস্থল লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়, সকলে মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাঁর বাক্যসুধা পান করে, সকলেই এক বাক্যে বল্‌ছে এমনটী হয় নি, হবে কি না সন্দেহ। একদিন সকালে স্বামিজী বাগানে বেড়াচ্ছেন, গ্রীষ্মকালের প্রভাতের সুখস্পর্শ বায়ু সারা বাগানময় ঝির ঝির করে খেলছিল, তিনি আনমনে ঘু'রতে ঘু'রতে কখনও কখনও বেলা, জুঁই বা গোলাপের ঝাড়ের নিকট দাঁড়িয়ে ফুলের রূপ দেখ্‌ছিলেন; এমন সময় ফুলের মত সুন্দর একটী মেয়ে তাঁ'র পায়ের নিকট লুটিয়ে পড়লো। সদ্যস্নাতা এলোচুলে তখনও গঙ্গাজল বিন্দু বিন্দু ঝর্‌ছিলো; একখানি লাল পেড়ে পাটের কাপড় তার অঙ্গখানি বেড়ে ছিল। সন্ন্যাসীর পায়ের উপর তার মাথা, তিনি স'রতে পা'রলেন না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার মুখে একটা আনন্দের হিল্লোল খেলছিল, মনে হলো আজ যেন তার জীবন পূর্ণ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী দেখলেন যেন প্রাভাত রাণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে তাঁর নিকট উপস্থিত। তিনি বল্‌লেন—"কে তুমি মা! এখানে কি কিছুর প্রয়োজন আছে?" মেয়েটী একটু চঞ্চলা হয়ে উত্তর দিল—"না, দরকার তেমন অন্য কিছু নাই, শুধু আপনাকে প্রণাম কর্‌তে এসেছি।" তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তোমার সঙ্গে আর কি কেউ এসেছে?" না,—আমি গঙ্গা নেয়ে বরাবর একা এসেছি, ঘাট পর্য্যন্ত একজন ঝি সঙ্গে ছিল, সেখান থেকেই তাকে বাড়ী যেতে বলে দিয়েছি।"

"তোমাদের বাড়ী কোথায়, মা?"

মেয়েটী আবার একটু বিচলিতা হয়ে ব'লল, "কালিতলায়। আপনি যদি দয়া ক'রে একবার সেই বাড়ীতে পদধূলি দেন তা হলে সেই অপবিত্র পুরী ধন্য হয়ে যায়—তীর্থ হ'য়ে যায়।"

"আমিতো বড় একটা কোথাও যাই না, আর বাড়ী যাবারই বা দরকার কি? তিনি ত সর্ব্বত্রই প্রকাশ রয়েছেন, তাঁর স্পর্শে যা কিছু সবই তীর্থ—তুমি এই খানেই এস মা, মাঝে মঝে এই খানেই দেখা হবে।" অভিমানিনীর চোখ লাল হয়ে উঠল, কান্না যেন বুকের দুয়ার ঠেলে বার হবার জন্য উছ্‌লে উছ্‌লে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

"বেলা হ'য়ে গেল তোমার আবার অনেক খানি পথ যেতে হবে, রোদে কষ্ট হবে, আজ তা হলে এস, প্রভুর ইচ্ছা হলে আবার দেখা হবে।"

মেয়েটী গলায় আঁচল দিয়ে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম ক'রল, আর সে কান্নার উৎসরোধ করে রাখ্‌তে পাল্লে না চোখের জল দিয়ে বৈরাগীর পাদুটি ধুইয়ে বাগানের ফটকপার হয়ে গেল।

(৪)

আর একদিন বৈকালে স্বামীজি বারান্দায় বসেছিলেন, এমন সময়ে মেয়েটী এসে প্রণাম ক'রল। সাধু বল্‌লেন, "বস মা, বস, সেদিন তোমার মনে খুব কষ্ট দিয়েছি।" মেয়েটী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে উত্তর দিল, "সেদিন আমার বাড়ী না গিয়ে ভালই করেছেন, আমি সেদিন আপনাকে বলিনি যে আমি একজন পতিতা, আপনাকে দেখে আমার ভিতর ওলট পালট হয়ে গেছে, মনে করে ছিলাম আপনাকে নিয়ে গিয়ে সেই অপবিত্র পুরী শুদ্ধ করে নেব। আর অসৎ কাজ করব না, আমার যা আছে তাতে একটা জীবন সুখেই কেটে যেতে পারে—শেষ কটা দিন তাঁর চিন্তাতেই কাটিয়ে দেব কিন্তু দেখ্‌ছি তাঁর ইচ্ছা অন্য রকম।"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—"মা তুমি পতিতাই হও আর যাই হও, তাতে আমার যাওয়া বাধে না, কারণ ভগবানের রাজ্যে কাউকে পতিত বা পতিতা ভেবে তাঁর অবমাননা করি নি। আমার কারুর বাড়ী যাওয়া আসে না, স্বভাব নয় তাই যাই না।"

মেয়েটী খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বল্লে "দেখুন আমি শুনেছি আপনি গরীব দুঃখী নিরাশ্রয় পীড়িত লোক জনকে যত্ন করে কাছে নিয়ে থাকেন ও মায়ের মত তাদের সেবা করেন। আর শুনেছি তাদের সংখ্যাও বড় কম নয়—অতগুলি লোকের সেবা একা করা কখনও সম্ভব নয় যদি আপনার বিশ্বাস হয়, যদি দয়া করে একটু স্থান দেন তবে আমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু দিয়ে আপনার কাজের সাহায্য করতে পারি—দেখুন বাড়ীতে আমার একদণ্ড থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না;

মনে হয় যেন আগুন—আর আমিও একজন পতিতা নিরাশ্রয়া আমাকে দয়া করে আপনার চরণে স্থান দিতেই হবে।

সন্ন্যাসী বল্লেন—"অবিশ্বাস—আমি তোমায় কখনও করিনি, প্রথম সাক্ষাতেই তোমার ভেতর একটা মহৎ ভাবের, জগৎব্যাপী প্রাণের পরিচয় পেয়েছিলাম। দৈব বিড়ম্বনায় তুমি এমন হয়ে ছিলে; আমি বুঝে-ছিলাম অসৎ তোমায় কখনও বেঁধে রাখ্‌তে পারবে না। তুমি তার বাঁধন একদিন কাটাবেই কাটবে। কিন্তু মা এখানে তোমার অনেকগুলি সন্তান বাস করে, তুমি কেমন করে থাকবে। তুমি মনে ক'রোনা যে তুমি পতিতাদের ভিতর থেকে আস্‌ছ বলে একথা বলছি, তুমি যদি ভদ্রের গৃহ থেকে আশৈশব ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী হয়ে আস্‌তে তাহলেও একথা বল্‌তুম।"

"কেন ঠাকুর—পবিত্র হৃদয় নরনারী কি একসঙ্গে থেকে কাজ কর্‌তে পারে না, আমার তো মনে হয় এ যুগল হৃদয়ের, মিলনে অদ্ভুত শক্তির উদয় হয়। যদি এ পবিত্র পুরুষপ্রকৃতি একত্র হয় তবে তারা নূতন পবিত্রতর জীবন সৃষ্টি কর্‌তে পারে—আর যখন তারা পবিত্র বাসনা নিয়ে কাজে নাম্‌ছে কেন তাদের পতন হবে। গীতায় শ্রীভগবান্‌ বল্‌ছেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"।

মৃদু হা'সতে হা'সতে সাধু উত্তর করলেন, "মা তোমার মত মহাপ্রাণ নরনারী এ কথাই ভেবে থাকে, কিন্তু আমার জীবনের, কেবল আমার জীবনের নয় আমার পূর্ব্বের শত সহস্র সন্ন্যাস জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছি, এ সম্ভব নয়। আমাদের মন সাধারণতই নিম্নগামী, সদ্‌বাসনা তাকে যতই ওপরের দিকে তুল্‌তে চেষ্টা করুক না কেন, একটা অবলম্বন পেলেই সে নীচের দিকে ছুটতে থাকে, সেইজন্য আমাদের উভয়কে নর ও নারীকে পৃথকভাবে অবলম্বন শূন্য হয়ে উঠতে হবে। প্রবর্ত্তক সাধক সাধিকার পক্ষে পরস্পরের মিশ্রন কখনও শুভকর হয় না। শ্রীবুদ্ধদেবকে যখন তাঁর শিষ্য বলেছিলেন, "হে প্রভু জগতের অর্দ্ধটাই উদ্ধার কর্‌লেন, অপর অর্দ্ধটা কি মাটীতেই পড়ে থাকবে।" তথাগত উত্তর করেছিলেন—"তুলতে পারি, তবে পুরুষ যদি নারীকে সঙ্গে নিয়ে

ওঠে তবে সে ওঠা স্থায়ী হবে না—আবার পড়তেই হবে।" তাই বহু অভিজ্ঞতার ফল এ যুগের ধর্ম্ম হচ্ছে যে পুরুষ পুরুষের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠ্‌বে; নারী নারীর পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠ্‌বে। কেউ কারুকে ধরে উঠ্‌বে না, কেউ কারুর হাত ধর্‌বে না এই রকম অবলম্বন শূন্য হ'য়ে যদি উঠ্‌তে পারে তবেই তা স্থায়ী হবে, সার্থক হবে। তবে তারা যখন শেষ সীমায় পৌছয় তখন মিলতে পারে কারণ তখন তাদের নর বা নারী জ্ঞান চলে যায়, দেখে সবই সচ্চিদানন্দময়।

নারী জিজ্ঞাসা ক'রল—"সন্ন্যাস নেবার আবশ্যকতা কি? ভগবান্ লাভ বা জগৎ সেবা কি ঘর থেকে হয় না? আমিতো অনেক পণ্ডিত মহচ্চরিত্র লোকের মুখে শুনেছি—হয়।"

তিনি বললেন—"আমিও নিজ জীবনে দেখেছি, আর অন্যান্য পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলেছেন সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করলে কিছুই হয় না—ভগবান লাভ, জগৎ সেবা, বিশ্বপ্রেম তো দূরের কথা। কায়মন বাক্যের সবখানি এতে নিয়োগ না করলে কেউ কি কিছু করতে পারে? আমার সন্ন্যাস—জটা চিম্‌টে গেরুয়া কাপড়ে নয়—পূর্ণ আত্মসমর্পণ—তৎকারণ সর্ব্বস্ব ত্যাগ। ধন, মান, স্বদেশ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি এমন্ কি আপনার শরীরও সেই মহাপ্রেম সমুদ্রে ডুবে যাবে। পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে কেউ তা পারেন নি আর পারবেন বলে মনেও হয় না। মা, মনটা আমাদের সঙ্গে অনবরতই জোচ্চুরি কচ্ছে। সে কত রকম ক'রে আমাদের ভোগের দিকে, রূপরসের দিকে টেনে নিয়ে যায়, আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি তার কতটুকু খবর পায়। মন চায় সুখ, চায় ভোগ, তাই নানারকম ক'রে মহাপ্রাণকে ভোলায় —বলে ঠিক কচ্ছো কারু কথা তুমি শুন না—এইরূপে সে নিজের বাসনা চরিতার্থ ক'রে নেয়, সে মানুষকে অন্ধ ক'রে দেয় বিচার বুদ্ধি শূন্য ক'রে দেয় সেইজন্য সংযমের বাঁধন দিয়ে ধীরে ধীরে শক্ত ক'রে তাকে বাঁধতে হয়—হয়তো কতবার খুলে যাবে তবু বাঁধতে হবে। দেখ না লোকে অসংযতমন, চঞ্চলবুদ্ধি নিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন

করে, দুদিনেই সবটা পেতে চায়; তা না হলেই তারা ফিরে পালায়, ঘরে গিয়ে বলে— ওসব কিছু নয়, বুজরুকী। তা কি হয়? ধীরে ধীরে এই পথে উঠ্‌তে হবে—তা আজও হতে পারে আবার যুগ যুগান্তেও না হতে পারে। ধৈর্য্য, সংযম, বৈরাগ্যই এই পথের বন্ধু। শবরী চল্লিশ বৎসর প্রিয়তমের আসার আশায় বসেছিল; তার যৌবন যে তাকে বার্দ্ধক্যের দুয়ারে ফেলে দিয়ে গেছে সে কথা পর্য্যন্ত সে জানতে পারেনি।

"অস্থির অবিশ্বাসী লোকের এ পথে না আসাই উচিৎ। যাক্, তোমার যখন এমন শুভমতি হয়েছে তখন তুমি বাড়ীতে থেকেই কাজ আরম্ভ কর, যতসব দীন দুঃখী পীড়িতদের বাড়ীতে নিয়ে এসে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা কর, নিজেকে কর্ত্তা মনে ক'রোনা, মনে করবে তাঁর কাজ তিনি তোমার ভিতর দিয়ে করছেন, দেখ্‌বে তিনিই তোমায় পথ দেখিয়ে দেবেন। রমণী সবিনয়ে প্রশ্ন ক'রল—"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম কামকাঞ্চন ত্যাগ করা। অনেকে বলেন কাম ত্যাগটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তার কাঞ্চন ত্যাগটার বাহাদুরী কোথায়? লোকে কাঞ্চন সংগ্রহ করে ভোগের জন্য—আহারের জন্য; সন্ন্যাসীর কোন কষ্ট নাই, বেশ সুখে সমাজের বুকের উপর বসে সবার সেরা খাচ্চেন—সে কাঞ্চন ত্যাগ অনায়াসে করতে পারে; কিন্তু গৃহী নিজের, স্ত্রী পুত্রের সামান্য পেট ভরাবার জন্য খেটে খেটে অস্থির অথচ কুসংস্কারপূর্ণ সমাজ নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রেষ্ঠঅন্ন সন্ন্যাসীর মুখে ধরে দেয়।"

সন্ন্যাসী বললেন, "সাধুর ব্রহ্মচর্য্য-পূর্ণ হৃষ্টপুষ্ট শরীর অনেকের চক্ষুশূল বটে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র আহারে সন্তুষ্ট থাকা—না হয় ধরে নিলেম সে আহারটা খুব ভালরকমই—কি সহজ কথা! লোকে আহার ছাড়া অন্য অনেক রকমে ভোগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। দেখ যার টাকা আছে সে হয় তা বাড়ায়, নয় তা ওড়ায়; যা আছে তাই রক্ষা করা, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা শক্ত। সন্ন্যাসীর যদি কাঞ্চন স্পৃহা থাকতো তবে সে শুদ্ধমাত্র আহারেই সন্তুষ্ট থাকতো না, অন্য অনেক জিনিষের জন্য অর্থ জোগাড় করতে চেষ্টা করতো। তবে এটা নিশ্চয়ই গেরুয়া পরলেই

সাধু হয় না; তবে সে বায়ু ভুক্ হ'তে পারে না তাই খায়, আর সে ভাল ব'লে লোকে তাকে ভাল খেতে না দিয়ে থাকতে পারে না। ব্যষ্টির মুক্তিতেই সমষ্টির মুক্তি, বিন্দুর সার্থকতাতেই সিন্ধুর সার্থকতা। সন্ন্যাসী সমাজের চোখের সামনে ত্যাগের আলেখ্য ধরে রেখেছে; লোকে আজকাল এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করে না—কেবল বাইরে বাইরে ভেসে ভেসে বেড়ায়, তাতে কি কোন কাজ হয়—জিনিষটা যতই নাড়াচাড়া করা যায় ততই তার গুণাগুণ বুঝা যায়। আমতলা দিয়ে গেলে না—তার ফল টক্ কি মিষ্টি-কি ক'রে বুঝবে? ত্যাগমার্গে থাক, শাস্ত্র পড়, তা ধারণা কর্‌বার চেষ্টা কর তবেই বুঝবে সন্ন্যাস সমাজের কি করেছে, তাকে দুটি খেতে ও একখণ্ড পরতে দেওয়া যায় কি না? আজ আলোচনা এই পর্য্যন্তই থাক, সন্ধ্যা হলো এখন এস।"

রমণী এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছিল তাঁকে প্রণাম করে বল্লে, "আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার উপদেশ পালন কর্ত্তে পারি। তিনি উত্তর দিলেন, "শুভ সঙ্কল্পে ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন।"

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

পল্লী-ব্যথা—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সাবিত্রীপ্রসন্ন এই পুস্তিকায় ছোট ছোট কবিতায় অতীতের পল্লী-জীবনের স্বপ্ন-সুখচ্ছবির আলোচনার পার্শ্বে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিষে জর্জ্জরিত নাগরিক ও গ্রাম্য সমাজের বিভৎসতা ও বিভীষিকার অন্ধকার কে গাঢ় করিয়া দেখাইবার জন্য উভয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আশা—যদি আমরা পুনরায় এই পূতি দুর্গন্ধ বিলাস ও কৌটিল্যে ভরা "আধানিক" সভ্যতা যথা—

কল্‌কাতাতে থাকেন ছেলে খরচ একটু বেশীই হয়
কারণ, জমিদারের ছেলে 'ষ্টাইলে' না রাখলে নয়,

মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধব সহ তিনি বেরোন 'টুরে'-
মাস তিন চার গয়া কাশী দিল্লী এবং লাহোর ঘুরে,
আমায় যখন লেখেন—"আমার টাকার বড় টানাটানি"
পাঠাতেই হয়—একটী ছেলে রেগে কোথায় যান না জানি।
সাহেব শুবোর সঙ্গে আলাপ তাদের বাড়ী ডালি দিতে
হক্ সাহেবের বাজার থেকে দুচার ঝুড়ি পার্শেল নিতে,
অনেক আমার খরচ আছে, যদিও সেটা করাই চাই
আমারই ত খরচ সে সব, তোমাদের তা ভাবনা নাই!
মেয়ের বিয়েয় দু'দশ হাজার খরচ যদি নাই বা হ'বে
এত বড় জমিদারী রূপ দেখানর জন্য তবে?
গাড়ী ঘোড়া পাল্কী রাখায় খরচ বড় অল্প নয়
না রাখলে যে মান থাকেনা, কাজেই সবই রাখতে হয়।
আদায় পত্র বন্ধ হ'লে কেমন করে চল্‌বে বল
হকের পাওনা পাব না হে—কথাটা এ কেমন হ'ল?

—হইতে সেই অনাবিল শান্ত সরল পল্লীর, যেথা—

"ঘর ক'খানি খড়ে ছাওয়া, মাটির দেয়াল চারিপাশে
নাই বা হ'ল দালান কোঠা তাতে আমার কি যায় আসে?

* * *

সাজ সজ্জায় নাইকো ঘটা চাদর ধুতির আদর বেশী
মিলন আছে প্রাণে প্রাণে নাইকো পাড়ায় রেশারেষি;

* * *

চায় না তারা বিলাস ব্যসন শাড়ী শাঁখায় হাস্য মুখ
চায়—হাতের নোয়া অটুট থাকুক, বজায় মাথায় সিঁদুর টুকু"

—শীতল ক্রোড়ে ফিরিয়া যাই। তুরী ভেরীর দ্বারা ঘোষিত ত্যাগ, ধর্ম্ম সেই অতীতের পল্লী সমাজে ছিল না—অন্তঃ সলিলা ফল্গুর মত নীরবে ধর্ম্ম সকল হৃদয়ে প্রেমের উৎসের সঞ্চার করিতেন—

"তাদের সকল পুণ্য কর্ম্ম ছড়িয়ে আছে ঘাটে বাটে।

পর খাইয়ে নিজে খাওয়া পরের সুখে নিজের সুখ
পরের গর্ব্বে হৃদয় ভরা পরের দুখে আপন দুখ।

*　　　*　　　*

সুখে তারা, দুঃখে তারা, দায় বিপদে সমান বল
তাদের হিয়ায় ধৈর্য্য স্নেহ চিরদিনই অচঞ্চল।
কাঙাল জনার দুঃখ দেখে বুক ভেসে যায় চোখের জলে
পরের শান্তি-সুখে হেথায় সুখ উপজে হৃদয় তলে।
চাষী ব'লে নাইকো ঘৃণা, দুঃখী ব'লে নাইকো হে'লা
ধূলায় ধূসর ছেলের সনে ধনীর ছেলে করছে খেলা।"

কিন্তু আজ আমরা ধর্ম্মকে তুচ্ছ আর সয়তানকে হৃদয়ের রাজা করিয়া তাহার জয় ঘোষণা করিতেছি,—

"কাঙাল দহিতে চাও যদি তবে পীড়নের মহানল
জ্বাল ওগো আজ জ্বালো,
কাঙাল সে কেন জনম নিয়েছে ভবে
মরণই তাহার ভাল।"

আজ যাহাকে আমরা "মিছে করা এই আশা, অন্ধ ভকতি সকল করম-নাশা।" বলিয়া "ষষ্ঠীতলায় সিঁদুর মাখান জমান পাথর নুড়ি," "যুগলকিশোর পাঁচুঠাকুরের বছর বছর মেলা," "পাষাণ খণ্ডে সিঁদুর লেপা শীতলা মা" "ধর্ম," "মাদুলী কবচ দেবতা" মানিতে আমাদের হাসি আসে, আমরা বলি "তুচ্ছ এ সব, বিপদ কভু কি নাশে?" কিন্তু সেই সরল পল্লীবাসীদের নিকট "তুচ্ছ জড়ের মাঝে, বিশ্ব-চেতনা রাজে," "পাষাণে পরাণ জাগে, যদি সে মুক্তি মাগে" একথা আমাদের অবিশ্বাসের বস্তু—কারণ প্রকৃত পক্ষে আমরা নাস্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছি এবং পল্লী সমাজকেও সেই বিষে দূষিত করিয়াছি। বিশ্ব চৈতন্যকে সর্ব্বভূতে দেখা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই সেই সরল চাষার প্রাণ আমরা হারাইয়াছি। চাষার হৃদয় তাঁহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিত—যুক্তি তর্ক নয়—সে—

"গয়লা দিদির পেটের ভাত, তার যোগাড়টা করাই চাই
মনটী যে তার দুধে-সাদা, আহা বল্‌বার কেও যে নাই;

* * *

ছাটার মুনিব নিয়ে আমি জমি টুকুন চষে' নেব,
কেটে মেড়ে নিজের রেখে দীন দুখীরে বিলিয়ে দেব।
খাওয়া পরা বাস-বসতের আমার কোনও কষ্ট নাই,
গাঁয়ের যারা পায় না খেতে, তাদের দেখেই দুঃখ পাই।"

আর অজিকার সভ্যতার বাণে বিদ্ধ হৃদয়া অসহায়া বুক নিঙাড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চিৎকার করিতেছে,—

ওগো, সব বেচে নাও নিলামের ডাকে
কোনও কথা মোর নাই,
শুধু, 'খাড়ু' জোড়া মোর বড় আদরের
সে জোড়া ফিরায়ে চাই।"

যেখানে—"বারমাসে নাকি তের পর্ব্বণ ছিল আমাদের বাড়ী
আমাদের বাড়ী কাজ হ'লে গাঁয়ে চড়াতে হ'তনা হাঁড়ী;
ঠাকুমা ছিলেন অন্নপূর্ণা দুহাতে অন্ন দান
তারপরে মা তো অচলা লক্ষ্মী এলেন বাড়ায়ে মান,
ঠাকুর দাদা তো দিয়েই 'ফতুর', দানে ছিল খুব নাম।

কিন্তু—"আজ কিছু নাই আছে শুধু সেই অতীত মহিমাময়
ধ্বংস সে স্মৃতি জাগায়ে হৃদয়ে মাঝে মাঝে কথা কয়;
শালগ্রাম শিলা গঙ্গার জলে পূজা কে করিবে আর
তুলসীমঞ্চ গড়গড়ি যায় বক্ষে ধরণী মায়।"

আশা—বুক দিয়ে তাই পড়ে আছি আমি বুক চিরে চিরে ডাকি
দুঃখ তারণ দেবতা আমার সে ডাক শুনিবে নাকি?

ত্রয়ী—মহাত্মা গন্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই তিন যথার্থ ত্যাগী স্বদেশ সেবকের ক্ষুদ্র জীবন চরিত। প্রথম দুই স্বদেশ-প্রাণ মহাত্মা সম্বন্ধী বিবরণ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক লিখিত এবং শেষোক্ত মহাপ্রাণ সম্বন্ধে শ্রীবিমলা দাস গুপ্তা লিখিয়াছেন। এই দেশ-নায়কদের চরিত্র সম্বন্ধে যাঁহারা সংক্ষেপে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই পুস্তিকা পাঠ করুন।

সংবাদ।

১। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম প্রিয় "ভক্ত ভাই ভূপতি কলিকাতার অন্তঃপাতী দর্জ্জীপাড়া পল্লীতে নিজ বাসভবনে বিগত রবিবার ২২শে জ্যৈষ্ঠ ভোর ৬-১৫ মিনিট সময় দেহরক্ষা করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন।

২। ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গৌড়ীয়-সর্ব্ববিদ্যায়তন-মণ্ডপে পর্য্যাপ্ত স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় কবিরাজশ্রীযুক্ত শ্যামদাস বাচস্পতি মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় পরিচালিত বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ (ন্যাশনাল আয়ুর্ব্বেদ কলেজ) ৬৪নং বলরাম দে ষ্ট্রীটে (সিমলা) স্থানান্তরিত হইয়াছে। কলিকাতার প্রায় সমস্ত পণ্ডিত কবিরাজই ইহার অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ডাক্তারী বিভাগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্যগণ ও ইহার প্রয়োজনানুরূপ সহায়তা করিবেন।

৩। সানফ্রানসিস্‌কো নগরীর অন্তর্গতঃ পল্‌এলডার নামক গির্জ্জায় শ্রীমৎস্বামী অভেদানন্দ ("Noted Sanskrit Scholar and Philosopher of India") ব্রহ্ম সম্বন্ধে রাল্‌ফ্‌ ওয়ালডো ইমারসন্ (The Concord Sage) যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধীয় গভীর মর্ম্মস্পর্শী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (২রা এপ্রিল শনিবার ২॥০ ঘটিকা)

৪। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ সুদীর্ঘ আমেরিকা প্রবাসের পর ভারতে ফিরিতেছেন। বর্ত্তমান জুলাই মাসে রওনা হইয়া জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশে পৌছিবেন—খবর পাইয়াছি।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্যের বিবরণ।

মিশনের সেবকগণ যে আসামপ্রত্যাগত দুর্দ্দশাপন্ন কুলিগণের সেবার জন্য চাঁদপুরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন শ্রীভগবানের কৃপায় এখন সে কার্য্য শেষ হইয়াছে। ২৯শে মে হইতে মিশন এক সপ্তাহের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আর্ত্তবিপন্ন কুলিগণের সকল প্রকার সেবা কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে থাকেন। এই কার্য্যে মিশন ফণ্ড হইতে ২৮৭১৯৴১৫ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। হিসাব আগামী মাসে বাহির করিব। কংগ্রেস কমিটীর সভ্যগণ, মাড়োয়ারী সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ, স্থানীয় এবং মফঃস্বলের দাতৃগণ এবং সকল সেবকগণকে মিশন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকগণের সেবার জন্য মিশন হইতে গত ১২ই জুন ৩জন সেবক প্রেরিত হন। আপাততঃ তাঁহারা শ্যামনগর থানার ১টী ইউনিয়ন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। "এই থানাটীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃস্থ। ২।৩টী গ্রাম ব্যতীত সকল গ্রামগুলিই ঐরূপ। কার্য্যাভাবে লোকে অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ এবং না খাইতে পাইয়া মরিবার মত হইয়াছে। কাহারও পরিধানে একখানি আস্ত কাপড় নাই, অনেকের দিকে চাহিতে পারা যায় না। বস্ত্রের বিশেষ অভাব। বহু স্ত্রীলোক গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন না। এই থানার সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করিয়া কাজ করিতে সপ্তাহে ৮০০৲ টাকা ও বস্ত্রের প্রয়োজন হইবে। সহৃদয় জন সাধারণের নিকট নিবেদন—অর্থ কিংবা বস্ত্র যিনি যেরূপ সাহায্য করিতে পারেন তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

(স্বাঃ) সারদানন্দ

(১) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়, জিলা হাবড়া।

(২) সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ মিশন,

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

জগত আজ সপ্তবর্ষব্যাপী নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা প্রভৃতি যুদ্ধবিগ্রহের পূজোপকরণে সমাকীর্ণ। উদ্দেশ্য—মনুষ্য সমাজের উপর স্বাধিপত্য। যদিও প্রতি জাতিই বরাবর বলিয়া আসিতেছেন যে তাঁহারা শান্তিকামী হইয়াই নির্য্যাতিতের উদ্ধারকল্পে অসি ধারণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের অন্তরের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা ছিল আধিপত্য। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যেক রণনায়কেরাই বুঝিতেছেন যে যেখানে আধিপত্য এবং উৎপীড়ন সেখানেই দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ। তরবারির দ্বারা সমাজ-তরুর ছেদন করিয়া কদাচ শান্তির ফল—সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতাকে ভোগ করা যাইতে পারে না। তাই আজ ব্রিটিশ সম্রাজ্যের প্রধান সচীব লয়েড জর্জ্জ, কোন ধর্ম্মসভায় আহুত হইয়া প্রকাশ করিয়াছেন, "The conscience of peoples must be trained so as to abhor bloodshed as crime and churches must create the atmosphere". "বিশ্বের বিভিন্ন জাতির বিবেক এরূপে দীক্ষিত করিতে হইবে যেন রক্তপাতকে সকল মানুষ গর্হিতজ্ঞানে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করে—দেশের ধর্ম্মমন্দিরাদিকেই ঐরূপ আবহাওয়ায় সৃষ্টি করিতে হইবে।"—কারণ যাঁহারা যথার্থরূপে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন তাঁহারাই নিরপেক্ষভাবে জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারেন। যে-হেতু তাঁহারা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেন যে একই সদাপ্রভু বিভুরূপে ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, রাজা প্রজা, ধার্ম্মিক পাপীর অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান। প্রেমই তাঁহাদের স্বভাব—স্বার্থে

নয়, ত্যাগেই তাঁহাদের দীক্ষা। তাঁহারা কদাচ নিজ ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা জাতিগত আকাঙ্ক্ষা-লালসার পরিতৃপ্তির জন্য, নরসমাজের এক পক্ষ না এক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া, জগতের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। ইহার উদাহরণস্থল ভারতবর্ষকেই ধরা যাইতে পারে। ভারতীয় সমাজ এত সমন্বয়-প্রাণ, গঠনশক্তি সম্পন্ন তথা বহুকালব্যাপী দাসত্ব ও নানা অত্যাচার ব্যাভিচারের মধ্যেও এত স্থিতিশীল কেন ?—ইহা ঋষি প্রণীত বলিয়া। অবস্থাভেদে ব্যবস্থা এবং অতি উদার ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া—যে ধর্ম্ম ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়া সকলকে উন্নতির মার্গে লইয়া যায়। (অবশ্য এস্থলে যথার্থ ভারতীয় ধর্ম্মই আমাদের উদাহরণ, ধর্ম্মের ব্যভিচারকে উদ্দেশ্য করিয়া আমরা বলিতেছি না। ভারতের হীনতা তাহার যথার্থ ধর্ম্মের পরিপালনে নয়, তদ্ধর্ম্মের ব্যভিচারে।)

* * *

অতঃপর তিনি বলিতেছেন "There must be some less barbarous way of settling industrial disputes than the war of starvation. Churches could engerminate a spirit of goodwill between classes with greater readiness to consider each other's point of view." "শিল্প ও বাণিজ্যগত বিবাদ মিটাইবার জন্য অবরোধ প্রথাদি বর্ব্বরোচিত উপায় অপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট পন্থা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহানুভূতি ও পরস্পরের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ভাব সমাজ শরীরে ছড়াইতে ধর্ম্মমন্দিরাদিই সক্ষম হইতে পারে।" প্রাচীন ভারতে ছিলও এইরূপ। ঋষিরা ঈশ্বরধ্যান-পরায়ণ বিবিক্ত দেশসেবী ছিলেন। রাজা প্রজায় বিবাদ ঘটিলে তাঁহারাই মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষের স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষা করিয়া নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবাদের সমাধান করিতেন। তাঁহাদের তপস্যা ও শাপবজ্রকে উপেক্ষা করিয়া কোন ক্ষত্রিয়ই সে সিদ্ধান্তে অন্যথাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না। মাত্র বিশেষ দুই স্থলে ব্রাহ্মণের অস্ত্র পরিচালন দৃষ্ট হয়। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের

অত্যাচারে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন এবং দাম্ভিক বেণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণেরা কুশ-বজ্রের সৃষ্টি করেন। কিন্তু সসাগর পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রজাদের ভোগের নিমিত্ত দান করিয়াছেন। এবম্বিধ ক্ষমতা সত্বেও তাঁহারা রাজাজ্ঞা মানিয়া চলিতেন এবং বিপদে রাজার দারস্থ হইতেন। কারণ, প্রতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে সংসার সংশ্লিষ্ট হইলে ঋষির ঋষিত্বের হানি হয়। লয়েড জর্জ্জ অন্যত্র "The interference by a religious organisation in the task of government" "শাসন কার্য্যে কোনও ধর্ম্মসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ করা" অনুচিত, এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহা যদি উপর্যুক্ত কারণে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সত্য। আর যদি প্রভুত্বের হানির আশঙ্কায় বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার প্রথমোক্ত বাক্যের সহিত শেষোক্ত বাক্যের বিরোধ ঘটে।

*　　*　　*

এক্ষণে "বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহানুভূতি ও পরস্পরের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ভার সমাজশরীরে ছড়াইতে ধর্ম্ম মন্দিরাদি সক্ষম হইতে পারে"—কি প্রকারে? এমন এক উদার ধর্ম্মভাব প্রচার করিতে হইবে যাহার ভিতর 'আমার মত এবং পথই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহার অনুসরণ বিনা নরকে যাইতে হইবে' এই আসুরিক বাণীর স্থানই নাই এবং যাহা আধুনিক অপরাবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্যের সহিত অতিউচ্চ পরাবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিয়া অতি নিম্নস্তরের ধর্ম্ম সকলেরও প্রয়োজনীয়তা স্বীকারে, সকল মানবের অন্তর্নিহিত সত্যকে জাগ্রত করিয়া একত্বের বিধান করিবে। জড়বিজ্ঞান যেমন জগতের একত্ব স্থাপন করিয়াছে, অদ্বৈতবেদান্ত সেরূপ আত্মার একত্ব স্থাপন করিয়াছে; এই ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ এবং বিবেক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া উভয়কেই গ্রহণ করিবে। জড়বিজ্ঞান যেরূপ বলিতেছে যে পাপী ও ধার্ম্মিকের দেহ একই উপাদানে গঠিত, সেইরূপ অদ্বৈতবেদান্ত বলিতেছে, উভয়েতেই একই আত্মা বর্ত্তমান—একজন বলিতেছে অবস্থার তারতম্য, আর একজন বলিতেছে বিকাশের তারতম্য। স্বাস্থ্যবান

লোক যেমন পীড়িতকে ঘৃণা করিতে পারে না সেইরূপ ধার্ম্মিক, বা বলবানের, পাপী বা দুর্ব্বলের প্রতি ঘৃণা বা অত্যাচার করার কিছুমাত্র সত্ব নাই বরং সেখানে সমধিক যত্নেরই প্রয়োজন।

* * *

সেইহেতু উপর্যুক্ত ধর্ম্ম যাঁহারা যথার্থরূপে জীবনে প্রতিফলিত করিয়া, দেহ চিত্ত এবং আত্মার সমতা লাভ করিয়াছেন এইরূপ একদল নিরপেক্ষ বিচারক বা মধ্যস্থের জগৎ পরিচালন বিষয়ে নিতান্ত প্রয়োজন ঘটিয়াছে, যাঁহারা মানব সমাজের অন্তর্গত বর্ণ, জাতি, আশ্রম এবং ব্যক্তিত্ব বৈচিত্র্যের মধ্যেও আত্মার একত্ব ও স্বাধীনতা প্রচারের দ্বারা শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করিবেন।

(২)

(শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী)

ভারতের স্বারাজ্য-সিদ্ধি আজ বহু দিন হতে তাঁর "জ্যোতিরিবাধূমকঃ" নয়নদুটী নিমীলিত করে বসে আছেন বলে অন্ধকারে নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছেন না। তাই কিছু দিন পূর্ব্বে বেদান্ত কেশরী পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ঐ চক্ষু উন্মীলনের জন্য উদ্বোধনের বাণী প্রচার করে গেছেন। সম্প্রতি স্বপ্রকাশকে বিজলী প্রভৃতি জাড্যালোকে তাঁর স্বরূপ দেখবার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য আলো জ্বেলেই অন্ধকার দূর করতে হয় সত্য, কিন্তু যাঁকে লক্ষ্য করে উপনিষদ্ বলেছেন "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি," তাঁকে আর "নেমা বিদ্যুতো ভান্তি।" তাই বিজলীর আলোতে কেউ দেখছেন—হারিয়ে গেছে আমাদের স্বরাজ্য গড়বার 'স্ব'টুকু ; এখন ঐ 'স্ব'টুকু খুঁজে পাওয়া না গেলে স্বারাজ্য-সিদ্ধি ত দূরের কথা, 'রাজ্য'টাই ঠিক ঠিক গড়ে উঠছে না। কেউ দেখছেন—ওটা এদেশে কখনো ছিল না, বিলেত থেকে আমদানি করতে হবে। আবার কেউ দেখছেন—এদেশেই আছে—তবে ভট্‌চায্যি মশায় মাদুলিতে পুরে বর্ণাশ্রমের বাক্সতে বন্ধ করে চাবি হারিয়ে ফেলেছেন। এ ছাড়াও তাঁদের আর এক দুর্ভাবনা হয়েছে এই যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত

'স্ব' নিয়ে এক একটা 'রাজ্য' গড়ে বসলে শেষে তেত্রিশ কোটি স্বরাজ্যের ঠোকাঠুকিতে একটীও টিকবে কি না।

এখন স্বরাজ্যের এই শূন্যবাদ পাছে সংক্রামক হয়ে পড়ে বলে, আচার্য্য বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তারই কিছু এখানে উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলাম।

স্বামীজি বলেছেন, সত্তা আর বোধ একই বস্তু বলে যেমন শঙ্করের মতে "নানয়োঃ পরস্পর ব্যাবৃত্তিরস্তি," তদ্রূপ স্বরাজ্য বলতে 'স্ব' ও 'রাজ্য' দুটো পৃথক্ জিনিষ একসঙ্গে জোড়া নয়; উহা একই মুদ্রার এপিট ওপিট। আর 'আধানিক' বিজলীর আলোতেও যখন রাজ্যটার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তখন আর 'স্ব'টা হারিয়ে গেছে বলে শঙ্করের "দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য" বাক্যের প্রামাণ্য অস্বীকার করা আদৌ সঙ্গত নয়। আমাদের 'স্ব'ও হারায়নি, 'রাজ্য'ও হারায়নি; স্বামীজি বলেছেন—আমাদের হারিয়ে গেছে সেই বল, যাকে লক্ষ্য করে উপনিষদ্ বলেছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

স্বামীজি আরও বলেন, কেবল অনুভব করছি বলেই যখন জগৎটাকে আছে বলতে হচ্ছে, তখন প্রতি নিশ্বাসে—প্রতি পাদক্ষেপে স্বরাজ্য উপলব্ধি করে আর নেই বলা চলে না। আর শুধু যে কেবল উপলব্ধি করছি বলেই স্বরাজ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, তা নয়; স্বরাজ্যই আমাদের স্বভাব—আমাদের স্বরূপ। আমরা স্বরূপতঃ যা, তা সম্রাট্ স্বরূপ—রাজা স্বরূপ; জাগতিক কোন শক্তিই আমাদের এই চির প্রাপ্ত অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারে না। কেবল আমরাই সেই বল হারিয়ে উহা হতে বঞ্চিত হয়েছি, যে বল হারিয়ে সিংহ শাবক নিজেকে মেষ তুল্য মনে করেছিল। আর এই জন্যই স্বামীজির ঔপনিষদিক চরম উপদেশ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

স্বামীজি বলেন, স্বরাজ্য কেবল আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই লাভ হতে পারে; কোন শাস্ত্র, কোন ব্যক্তি অথবা কোন জাতি আমাদের স্বরাজ্য দিতে পারে না। সুতরাং ভট্টচায্যি মশায়ের উপর দোষারোপ না করে, দোষ আমাদের নিজেদের ঘাড়েই নিতে হবে। তিনি বলেন,

যতদিন না আমরা আমাদের নিজের ঘাড়ে দোষ নেওয়ারূপ বল লাভ করতে পারছি, ততদিন আমরা কোন মতেই স্বরাজ্য লাভের যোগ্য নই। তাই সেই বেদান্ত কেশরীর চরম উপদেশ—"নিজ হস্তে রজ্জু—যাহে—আকর্ষণ।"

স্বামীজি বলেন, এই যে তেত্রিশ কোটি স্বরাজ্যের কল্পনা, এটাও কেবল ঐ বল হারিয়ে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝতে না পারাতেই ঘটেছে। তিনি বলেন, যখন বল লাভ হবে, তখন আমরা স্পষ্টই দেখতে পাব—আমাদের ব্যক্তিগত 'স্ব' কোথায়। চিন্তা, ভাব মন, শরীর—এমন কি, জ্ঞানের পর্য্যন্ত অহরহঃ পরিণাম হচ্ছে; সুতরাং ব্যক্তিগত পরিণামশীল 'স্ব' এর ব্যক্তিত্ব বা 'স্ব' বলে কিছুই থাকতে পারে না। তবে কেবল তখনই আমাদের ব্যক্তিত্ব বা 'স্ব' সম্ভব, যখন আমরা সমগ্র জগতের সঙ্গে নিজেকে অভিন্নভাবে জাগাতে পারব। আর যখন সেই 'স্ব', সেই ব্যক্তিত্বে আসবে, তখন "কেন কং পশ্যেৎ।" অতএব, স্বরাজ্য আমাদের আছেই; তবে কেবল নেই সেই বল, যে বল ছিল না দেখে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—

> "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

এখন শেষ কথা এই যে, এই সব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাসা না করে, কি করে সেই বল লাভ হবে, ধীর শান্ত ভাবে আচার্য্যের কাছে তার উপায় জিজ্ঞেস করা।

"বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—আপনার উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস,—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। * * * নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্য্যবান হও। ইহাই এক্ষণে আমাদের আবিশ্যক।"—বিবেকানন্দ।

বর্ত্তমান সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।*

(৫)

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

ইউরোপীয় জড়বাদ আমাদের একেবারে মাটী করে ফেলবার দাখিল করেছে তা আমাদের দেশ এখন একটু আধটু বেশ বুঝতে পেরেছে। আমরা চাই যে আমরা প্রত্যেকেই কর্ম্ম-কুশল হই কিন্তু এই কর্ম্ম-কুশলতা যে আমরা কেবল দেখাতে পারি ধর্ম্মের দিক দিয়ে, ইউরোপী জড়বাদের মধ্য দিয়ে নয়, সে রাস্তায় চলতে গেলে যে আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তা আমাদের দেশ দিন দিন বেশ বুঝছে। "যদি কেহ আমাদিগকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে চায়, সে নিরাশ হইবে; আমরাও যদি আবার কোন যুদ্ধ-প্রিয় জাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রিয়াশীল দেখিতে চাই, আমরাও তদ্রূপ নিরাশ হইব। পাশ্চাত্যেরা আসিয়া দেখুক আমরা তাহাদেরই ন্যায় কর্ম্মী —আমরা এখনও জীবিত রহিয়াছি। এই সকল ভাবিয়া আমরা যে আদৌ পূর্ব্বাবস্থা হইতে হীন হইয়া পড়িয়াছি, এই কথাতেই আমার বিশ্বাস হয় না।"—আচার্য্য অত্যাশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে ভারত ভারতী হৃদয়ান্তর্গত এই সুপ্ত শক্তিকে আবিষ্কার করে জনসাধারণে সেই সত্যের আবার প্রচার করলেন—যে সত্য সবিতা আজ ভারত গগন উদ্ভাসিত করে প্রকাশ হচ্চেন—আজ যাহার আলোক স্পর্শে কোটি হৃদয়ের সহস্রদল প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে। "আমার মনে হয়, আমার দ্বারা যে যতটুকু সামান্য কার্য্য হয়েছে, যদি তাহার জন্য সমগ্র জাতি এতদূর প্রশংসা করে, তবে আমাদের পরে যে সকল মহা মহা দিগ্বিজয়ী ধর্ম্মবীর মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই জাতির নিকট হইতে না জানি আরও কত প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিবেন। ভারত ধর্ম্মভূমি। হিন্দু, ধর্ম্ম—কেবল ধর্ম্মই বুঝে। শত শত শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু

* উদ্ধৃতাংশগুলি রামনাদ্রা ও মাদ্রা অভিনন্দনের উত্তর হইতে গৃহীত।

কেবল এই শিক্ষাই পাইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলও এই হইয়াছে যে, ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রতস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। তোমরা অনায়াসে বুঝিতে পার যে, ইহা সত্য। সকলেই দোকানদার হউক, বা স্কুল মাষ্টার হউক বা যোদ্ধা হউক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই সামঞ্জস্য পূর্ণ জগতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাব লইয়া এক মহাসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিবে।”

এত দারিদ্র্য অত্যাচার যাতনার মধ্যেও ধর্ম্ম কেশরীর নব জাগরণ দেখে মনে হয় যে সত্য সত্যই ভারত ভারতী জাতীয় ঐক্যতানের আধ্যাত্মিক সুর বাজাইবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক চির নিযুক্ত। আর এই নব জাগরণের কারণ, আমরা আমাদের মহামহিমান্বিত পূর্ব্ব পুরুষদের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে মহান্ তত্ত্বরাশি পেয়েছি তা এখনও আমরা ভুলি নি, আমাদের জাতীয় হৃদয় এখনও অটুট্ রয়েছে, আমরা এখনও জাতীয় আদর্শ হতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইনি। কিন্তু একথা সত্য বলে মেনে নিলেও, কেন আমরা মাটি হয়ে যেতে বসেছি একথার উত্তর দিতে গেলে, আমাদিগকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, এই মাটি হবার কারণ বাইরে থেকে, যতটা না এসেছে ভেতর থেকে তার চাইতে বেশী উঠেছে। দোষ আমাদের নিজেদেরই। ভারতের এক পঞ্চমাংশ লোক কেন মুসলমান হল, দেড়শ বৎসরের মধ্যেই দশ লক্ষের উপর খৃষ্টান হয়ে গেল কেন! এ দোষ কাদের! এই নিম্ন শ্রেণীদের স্বধর্ম্ম ত্যাগের জন্য দায়ী কারা? উত্তরে আচার্য্য বলচেন্ “আমাদের একজন ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন—যখন অনন্ত জীবন নির্ঝরিণী নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখন এই দরিদ্র হতভাগ্যগণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিবে কেন’? প্রশ্ন এই,—ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে? আমি ইংলণ্ডের জনৈক সৎ বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম—সে অসৎ পথে পদার্পণ করিবার—বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন। তাহাতে সেই বালিকা উত্তর দেয়, এই উপায়েই আমি কেবল লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন

আমায় কেহই সাহায্য করিবে না, কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না।"

এখন আমরা তাদের হারিয়ে নিজেদের যে কতদূর দুর্ব্বল করে ফেলেছি তা বুঝতে পেরে বুক চাপড়াচ্ছি। এর পূর্ব্বে আমরা তাদের জন্য কিছুই করিনি তাদের ঘৃণাই করে এসেছি, অস্পৃশ্য বলে দূর, দূরই করেছি। কিন্তু সেই তারাই, সেই ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জাতিই, যাদের এক পুকুরে জল খেতে দেওয়া হয়নি, এক রাস্তায় হাঁটতে দেওয়া হয়নি, উচ্চ বর্ণের সেবা ছাড়া অপর সকল ধর্ম্ম ও মোক্ষের পথ রুদ্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছিল, তারাই যখন দেখলে যে মুসলমান রাজত্বে মুসলমান হলে, খৃষ্টান রাজত্বে খৃষ্টান হলে ব্রাহ্মণেতর উচ্চ সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য করা যেতে পারে, তাদের নিকট থেকে সম্মান জোর করে আদায় করা যেতে পারে, তখন তাদের নিকট হতে যথেচ্ছাচার, হৃদয়হীন, অশাস্ত্রীয়, দেশাচারা, কুলাচার, স্ত্রীআচার প্রধান ধর্ম্ম ত্যাগ করা ছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে। হিন্দুধর্ম্মের ক্ষয়ের কারণ এই আমরা উচ্চ বর্ণেরাই। আমরা আমাদের বাপ পিতামহের ধর্ম্ম, যা আকাশের চেয়েও নির্ম্মল ও প্রশান্ত, যা সমুদ্রের চেয়েও গম্ভীর, নানা ভাবলহরী যুক্ত, সাধারণকে তার দ্বারা উন্নত না করে নিজেদের সমাধি নিজেরাই খনন করচি। আমরা যদি নিজেরা জ্ঞানসম্পন্ন এবং উদার হ'তাম তাহলে জড়বাদ বা মুসলমান, খৃষ্টান কেউ আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। দেহ অনিয়ম, অত্যাচারের দ্বারা দুর্ব্বল হলেই দেহের মধ্যে রোগের বীজাণু ঢোকে। সবল দেহ মন যুক্ত লোক মড়কের মধ্যে বাস করেও সুস্থ থাকে। এখন দোষ কার এই বিচার করতে গিয়ে বিদেশীর উপর সকল দোষ না চাপিয়ে এই দোষের প্রতিকারের জন্য কায়মনবাক্যের প্রয়োগ করাই যুক্তিসিদ্ধ।

আমরা বহু বর্ষ যাবৎ ছোট ছোট জিনিষে মাথা ঘামিয়ে শক্তি ক্ষয় করে ফেলেছি, বড় বড় আদর্শের জন্য চিন্তা করবার অবসর আর আমাদের নেই। তাই আচার্য্য বলচেন, "গত ৬০০।৭০০ বৎসর ধরিয়া কি ঘোর

অবনতি হইয়াছে, দেখ। বড় বড় মদ্দরা শত শত বর্ষ ধরিয়া এই মহা বিচারে ব্যস্ত যে, এক ঘটি জল খাব ডান হাতে কি বাঁ হাতে, হাত তিনবার ধোব না চারবার, কুল্‌কুচো করব পাঁচবার কি ছয়বার। যাহারা সারা জীবন এইরূপ দুরূহ প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় ও এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় মহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন লিখিতে ব্যস্ত তাহাদিগের নিকট আর কি আশা করিতে পার? আমাদের ধর্ম্মটা রান্নাঘরেই ঢুকিয়া সেইখানেই আবদ্ধ থাকিবে, এইরূপ আশঙ্কা বিলক্ষণ রহিয়াছে। আমরা এখন বৈদান্তিকও নহি, পৌরাণিকও নহি, তান্ত্রিকও নহি—আমরা এখন কেবল 'ছুৎমার্গী' আমাদের ধর্ম্মমন্দির এখন রান্নাঘর। আমাদের ঈশ্বর হইয়াছেন ভাতের হাঁড়ি আর মন্ত্র 'আমায় ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা আমি শুদ্ধ'। যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেকেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে।" যখন মানুষের দেহ মন দুর্ব্বল হয় তখন মৌলিক চিন্তা আর তাদের নিস্তেজ মস্তিষ্কে স্থান পায় না, কার্য্যকরী শক্তি হারিয়ে জীবন সংগ্রামে ভীত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য গণ্ডির পর গণ্ডি টেনে শেষে শ্বাসরোধে প্রাণ হারায়।

এখন এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলোর জন্যে মাথা না ঘামিয়ে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় বেদান্তের এই আত্মবলি রূপ মহান্ আদর্শের অনুবর্ত্তী হয়ে জীবনকে সার্থক করাই বাঁচবার একমাত্র উপায়। পরার্থে সর্ব্বস্ব দানই আমাদের আদর্শ। আর এই ভারতবর্ষে অন্ন দান কার্য্য যথেষ্ট হয়েছে। জগতের একমাত্র এখানেই ভিক্ষুকও তার ভিক্ষালব্ধ অন্ন থেকে দান করতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু বিদ্যা দান ও ধর্ম্ম দানে আমরা চিরকালই কৃপণ। আচণ্ডালে এই দান আমাদিগকে করতে হবে। আর এই কার্য্যে "যদি আমরা সকলেই অকুতোভয় হইয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া ভাবের ঘরে একবিন্দু চুরি না রাখিয়া কাযে লাগিয়া যাই, তবে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের সমুদয় সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে—বিরুদ্ধ মতাবলম্বী আর কেহ থাকিবে না এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার প্রাচীন আর্য্যগণের ন্যায় উন্নত হইবে।" আর তা না

হলে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, বিরহ যুক্ত পশুত্ব ভোগে জীবনের তাৎপর্য্য কি ?

এ জগতে একটা প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্ট হয়ে থাকে যে যখনই কোনও জাতির বাঁচবার জন্য কোনও শক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে তখনই অপর জাতি হতে, সেই শক্তি, যেখানে খুব তাজা অবস্থায় আছে, এসে সেই মৃতপ্রায় জাতিকে নূতন জীবনে উদ্বোধিত করে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই জাতি যে গৃহীতা, দাতার আসন গ্রহণ করে সেই আগন্তুক জাতিকে গৃহীতায় পরিবর্ত্তিত না করতে পারে তবে তার হয় ধ্বংস; আর না হয় অনুকরণ প্রাণ হয়ে সেই অগন্তুক শক্তিমান জাতিতে মিশিয়ে যেতে হয়। ভারত যে বেঁচে আছে তার কারণ যখনই কোনও বিদেশী শক্তি তার মধ্যে এসে পড়ছে তখনই সে তার ভাব হজম করে তাকে যা দেবার তা তাদের দিয়েছে। সে কেবল জগতে শিষ্য হয়ে বেঁচে নেই গুরুর আসনও সে বরাবর রক্ষা করে এসেছে। কি এক প্রাকৃতিক বিধানে আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ হতেই একবার নয় দুইবার নয় বহুবার যেখানেই ধর্ম্মের অভাব ঘটেছে তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাহার অদ্ভুত হৃদয় ও মস্তিষ্ক প্রসূত উদার ধর্ম্মের অংশ বিশেষ সেথানে গিয়ে সে জাতির আধ্যাত্মিকতা সম্পাদন করেছে, পক্ষান্তরে অপরাপর জাতিরও রাজনৈতিক, সামাজিক বা যা কিছু দেবার আছে তা ভারতকে দেওয়ায় উভয় জাতির সামঞ্জস্য বিধান হয়েছে। ভারতবর্ষের সহিত এই আদান প্রদান মিশর, ব্যাবিল, কালদে, পারস্য, গ্রীক ও আরবের সহিত ইউরোপীয় সভ্যতা বিকাশের পূর্ব্বে হয়েছে এবং বর্ত্তমানে এই ইংরাজ প্রাধান্যকালে সে আপন বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট ব্রত পালনে নিযুক্ত। "যেমন আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, পাশ্চাত্যদিগের সম্মিলিতভাবে কার্য্যপ্রণালী ও বাহ্য সভ্যতারভাব আমাদের দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমগ্র দেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, সেইরূপ ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন বন্যায় পাশ্চাত্য দেশকে ভাসাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে। আমারাও পাশ্চাত্যদেশীয় জড়বাদ প্রধান

সভ্যতা প্রভাবের সম্পূর্ণ প্রতিরোধে অসমর্থ। সম্ভবতঃ কিছু কিছু বাহ্য সভ্যতা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর, পাশ্চাত্যদেশের পক্ষে আবার সম্ভবতঃ একটু আধ্যাত্মিকতার আবশ্যক। তাহা হইলেই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। আমাদিগকে যে পাশ্চাত্যদেশ হইতে সব শিখিতে হইবে অথবা তাহাদিগকে আমাদের নিকট সব শিখিতে হইবে তাহা নহে। সমগ্র জগৎ যুগযুগান্তর ধরিয়া যে আদর্শ-জগতের কল্পনা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে শীঘ্র তাহার আবির্ভাব হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, এতদুদ্দেশে প্রত্যেকেরই যতটুকু সাধ্য ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে দেওয়া উচিৎ।" এই সামাজিক সম্পূর্ণতা আমরা আমাদের জীবনে না দেখে যেতে প্যারি, কিন্তু প্রাণপণ করে ওর জন্য আমাদের খাটতে হবে যাতে আমাদের সন্তান সন্ততিদের সেই আদর্শে পৌঁছিবার রাস্তা আরও সুগম হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই এই বিরাট দায়িত্বভার নিজের মাথার ওপর নেওয়া উচিৎ, প্রত্যেকেরই মনে করা উচিৎ যে মনুষ্য সমাজের সম্পূর্ণতা তারই নিজ ব্যক্তিগত সম্পূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করচে।

এখন দেখা যাচ্ছে যে বিরাট ভারত-ধর্ম্ম-সাগর গভীর কল্লোলে স্ফীত হয়ে উঠছে জগৎকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় ভাসাবার জন্য। ভারতের নানা অংশে নানা ভাবাদর্শের স্ফুরণ যা সম্প্রদায়শীর্ষদের মধ্য দিয়ে ত্যাগতিতিক্ষা রূপে বেরুচ্চে, তা সেই মহাসাগরেরই পূর্ণ বিস্তারের পূর্ব্বে বৈচিত্র্যময়ী ভাবলহরীর ক্রীড়া চাঞ্চল্য মাত্র। কিন্তু আবার বিপদের আশঙ্কাও আছে। এই প্রবল পুনরুত্থানের সঙ্গে ভয়ানক গোঁড়ামি এসে সমাজ অঙ্গ দুষ্ট করে। কখনও কখনও লোকে এত পাগলামীর বাড়াবাড়ী করে ফেলে যে অনেক সময় যাদের চেষ্টায় এই জাগরণ আরম্ভ হয়, কিছুদূর অগ্রসরের পর তাঁরাও আর প্রবৃত্তি পরিচালিত জনসাধারণের চাঞ্চল্য নিয়মিত করতে পারেন না। "আমাদের দুই পথের মাঝামাঝি চলিতে হইবে। এক দিকে কুসংস্কার পূর্ণ প্রাচীন সমাজ অপরদিকে জড়বাদী ইউরোপীয় ভাব, নাস্তিকতা * *। এই দুইটী হইতেই সাবধান হইতে হইবে।

প্রথমতঃ আমরা কখন পাশ্চাত্য জাতি হইতে পারি না, সুতরাং উহাদের অনুকরণ বৃথা। মনে কর, যদি তোমরা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ করিতে পার, সেই মুহূর্ত্তেই তোমাদের মৃত্যু হইবে—তোমাদের জীবন কিছুমাত্র থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ ইহা অসম্ভব। সময়ের প্রারম্ভ হইতে মানব জাতির ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরিয়া একটী নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। তুমি কি উহাকে উহার উৎপত্তি স্থান হিমালয়ের তুষারময় শৃঙ্গে লইয়া যাইতে চাও? তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি তোমাদের পক্ষে ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব।"

কিন্তু এদিকে আবার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আমরা আমাদের গ্রাম্য দেবতা সম্বন্ধীয় কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কুসংস্কার পূর্ণ অথচ পরস্পর বিরোধী দেশাচারকেই যেন ধর্ম্ম বলে নিয়ে বসে না থাকি। এক দেশে যা সদাচার অপর দেশে তা অসদাচার। কিন্তু প্রত্যেক দেশের অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের নিজ নিজ গ্রামের আচার পদ্ধতি জগৎকে জোর করে মানবার জন্য ব্যস্ত—আর সকল বিবাদের আরম্ভ হচ্চে ঐ 'মাতুয়াল্লা' বুদ্ধি থেকে। "উদাহরণ স্বরূপ দেখ, দক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণকে একটুকরা মাংস খণ্ড খাইতে দেখিলে ভয়ে দু'শ হাত পিছাইয়া যাইবে—আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ কিন্তু মহাপ্রসাদের অতিশয় ভক্ত—পূজার জন্য তিনি শত শত ছাগ বলি দিতেছেন। তুমি তোমার দেশাচারের দোহাই দিবে, তিনি তাঁহার দেশাচারের দোহাই দিবেন।"

এত গেল গ্রাম্য আচার ব্যবহার। এরপর আবার দেখা যায় শাস্ত্রীয় আচর ব্যবহারও কোনও কালে স্থির নয়। দেশকালপাত্র ভেদে বিভিন্ন স্মৃতি বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ চিরকালই সমান। সেই অনাদি অনন্ত সার্ব্বভৌম মহাব্রত দেশকাল পাত্রকে অপেক্ষা না করে চিরকালই, অব্যাহত ভাবে মানবকে অনন্তের পথে অগ্রসর করছে। এ সকলের আলোচনা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে করে এসেছি। আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন চিরকালই হবে কারণ কোনও জাত যদি

বাঁচতে চায় তাহলে আচারে মৌলিকত্ব না দেখালে বাঁচতে পারে না। যখনই কোনও জাতি আচারে ব্যবহারে চিন্তায় মৌলিকত্ব হারিয়েছে তখনই যন্ত্রপ্রায় হওয়ায় তা'দের উপর মৃত্যুর ছায়া এসে পড়েছে, এ বহুবার দৃষ্ট। "মনে রাখিও এই সকল প্রথা ও আচারের চিরকালই পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই ভারতেই এমন সময় ছিল যখন গোমাংস ভোজন না করিলে কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। বেদ পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে কোন বড় সন্ন্যাসী বা রাজ বা অন্য কোন বড় লোক আসিলে ছাগ ও গো হত্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করান প্রথা ছিল; ক্রমশঃ সকলে বুঝিল আমাদের জাতি প্রধানতঃ কৃষিজীবী সুতরাং ভাল ভাল যাঁড়গুলি মারিলে সমগ্র জাতিরই ধ্বংস হইবে। এই কারণেই গো হত্যা প্রথা রহিত করা হইল— গো হত্যা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রাচীন শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই, তখন হয়ত এমন আচার সকল প্রচলিত ছিল, যাহা এখন আমরা বীভৎস জ্ঞান করি। ক্রমশঃ সে গুলির পরিবর্ত্তে অন্য বিধির প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ঐ গুলিরও আবার পরিবর্ত্তন হইবে, তখন নূতন নূতন স্মৃতির অভ্যুদয় হইবে। এইটিই বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ চিরকাল একরূপ থাকিবে, কিন্তু স্মৃতির প্রধান্য যুগ পরিবর্ত্তনেই শেষ হইয়া যাইবে।"

অক্লান্ত কালস্রোতের প্রতি তরঙ্গশীর্ষে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়ে থাকে আর তাঁরই নিঃস্বার্থ জনহিতকর নিয়মাবলী জগতকে দান করে উন্নতিরদিকে এগিয়ে দেন। সেই ঈশ্বরকল্প মানবেরা স্বার্থ সাধন বা নামের জন্য নিজ শক্তি বিকাশ করেন না পরন্তু লোক কল্যাণের নিমিত্তই তাঁদের আগমন। চেলা চাপাটিরাই তাঁর প্রতি প্রীতির নিমিত্ত নানা প্রকার গোঁড়ামীর সৃষ্টি করে সকল অনর্থের উৎপাদন করে। যদি কোন বিংশ শতাব্দীর লোকের সহিত খৃষ্ট বা রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাহারা যদি জিজ্ঞাসা করে 'হাঁ মশাই, আপনারা কি নিজ নাম প্রচারের জন্য এত সাধ্য সাধনা জগতে দেখিয়ে গিয়েছেন?' তখন তাঁরা কি উত্তর দেবেন? তাঁরা নিশ্চয় বলবেন 'আমরা থাকি বা না থাকি তাতে

এসে যায় না কিন্তু সত্য অবিনাশী। আমরা সেই সত্য সচেষ্টা বলে লাভ করেছি এবং জগতকে পথ দেখিয়েছি। তোমরাও যে পথ হয় অবলম্বন করে সত্যকে লাভ কর। সেই সত্যকে লাভ করতে তোমার পথে যদি লাখ বিধি-নিষেধের দরকার হয় তা মান, আর যদি সেগুলো অন্তরায় স্বরূপ মনে কর তবে নির্ম্মম ভাবে ত্যাগ কর।' 'আমার পথই একমাত্র পথ' প্রভৃতি তথাকথিত ভগবদবাণী চেলাদের সাজান কথা। কিন্তু গাছ যখন ছোট থাকে তখন ব্যাড়ার দরকার হয়, শিশুকে অপরের সাহায্যে অক্ষর পরিচয় করতে হয়। আবার নূতন—ভুঁইফোড় একটা কিছু নয়—পুরাতনের সঙ্গে চিরন্তন শৃঙ্খলে সে বদ্ধ নচেৎ ক্রমোবিকাশের অর্থই হয় না—কিছু না থেকে কিছু হোতেই পারে না। "আমি চাই গোঁড়ার নিষ্ঠাটুকু, তাহার সহিত জড়বাদীর উদার ভাব। হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর অথচ আকাশবৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। আমাদিগকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতির মত উন্নতিশীল হইতে হইবে আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবহমান কালের চির সঞ্চিত সংস্কারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে—হিন্দুই কেবল প্রাচীন প্রথার সম্মান করিতে জানে। সাদা কথায় বলি, সব বিষয়ই আমাদিগকে মুখ্য ও গৌণ উভয়ের বিভিন্নতা কোথায়, তাহা শিখিতে হইবে। মুখ্য বিষয়গুলি সর্ব্বকালের জন্য—গৌণ তত্বগুলি কোন বিশেষ সময়ের উপযোগী মাত্র। যদি সময়ে সেইগুলির পরিবর্ত্তে অন্য প্রথা সকল প্রবর্ত্তন না করা হয়, তবে সেগুলিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তোমাদিগকে প্রাচীন আচার পদ্ধতিসমূহের নিন্দা করিতে হইবে। কখনই নহে—অতিশয় কুৎসিৎ আচারগুলিরও নিন্দা করিও না। নিন্দা কিছুরই করিও না—এখন যে প্রথাগুলিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইগুলিই অতীতকালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবনপ্রদ ছিল। যদি এখন সেইগুলিকে উঠাইয়া দিতে হয়, তবে উঠাইয়া দিব্যর সময় সেইগুলির নিন্দা করিও না। বরং উহাদের দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনরক্ষারূপ মহৎ কার্য্যের সাধন হইয়াছে, তাহার জন্য তাহাদিগের প্রশংসা কর ও তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"

কে তুমি ?

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু)

(বাউল সঙ্গীত)

কে তুমি আমি সেজে মনের মাঝে কও কথা !
বলহে বল তোমার বসতি কোথা !
তুমি রাজা উজীর, ফকির কি আমীর,
উদাসী কি গৃহবাসী, বিলাসী কি বীর,
তুমি বিষয়ী কি ব্রহ্মচারী, বল স্বরূপ বারতা !
তুমি অযোনি কি সর্ব্বযোনি, পুরুষ কি নারী,
যুবা বৃদ্ধ, কিম্বা তুমি কুমার কুমারী,
সংযমী কি ব্যভিচারী, অসতী পতিব্রতা !
তুমি চোর কি সাধু, নফর কি নেতা,
তুমি অস্থি কি মেধ, শোণিত কি স্বেদ, চিত্ত কি চেতা,
তুমি সুধা গরল, সরল কি ছল, কেমন তুমি বল তা !
তুমি কি ভাবে হে ছিলে কোন্‌খানে,
কি তত্ত্বে এসেছ হেথা কিসের সন্ধানে,
পঞ্চভূতের ফাঁদে তোমায় বেঁধেছে কার মমতা !
তোমায় ধর্‌তে গেলে দাও না ত' ধরা,
মুখে বল আমার আমার কথার ছল করা,
তুমি আপন হয়ে পর করেছ তাইত মনে পাই ব্যথা !
তোমার সাধন ভজন—ছাগল দিয়ে যব মাড়া,
বল কি নাম ধ'রে ডাক্‌লে পরে দাও তুমি সাড়া,
আছে সাধুর উক্তি নামেই মুক্তি—অপার নামের ক্ষমতা !

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

গ্রীনএকার সরাই,
ইলিয়ট, মেন।
২৬শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয় ভগিনীগণ,

আমি অনেকদিন তোমাদিগকে কোন পত্রাদি লিখি নাই, লিখ্‌বারও বড় কিছু ছিল না। খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিকগণ * এই গ্রীনএকারে তাদের সমিতির এক বৈঠক বসান'র দরুন ইহা একটা মস্ত বড় হোটেলখানা ও একটা পাড়াগেঁয়ে বড় গৃহস্থের বাড়ীগোছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত বসন্তকালে নিউইয়র্কে যে মহিলাটীর মাথায় এই বৈঠকের কল্পনাটা প্রথম আসে তিনি আমাকে এথানে আস্‌বার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাই আমি এথানে এসেছি। এ জায়গাটী বেশ সুন্দর ও ঠাণ্ডা, তাতে কোন সন্দেহ নাই আর আমার চিকাগোর অনেক পুরাতন বন্ধু এথানে রয়েছেন। তোমাদের মিসেস মিল্‌স্‌ ও মিস ষ্টক্‌হ্যামের কথা স্মরণ থাক্‌তে পারে। কোয়া ষ্টক্‌হ্যাম এবং আর কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নদীতীরে খোলা যায়গায় তাঁবু খাটিয়ে তাতে বাস কচ্চেন। তাঁরা খুব স্ফূর্ত্তিতে আছেন এবং কথন কথন তাঁরা সকলেই সারাদিন যাকে তোমরা বৈজ্ঞানিক পোষাক বল তাই পরে থাকেন। বক্তৃতা প্রায় প্রত্যহই হয়। বোষ্টন থেকে মিঃ কল্‌ভিন নামে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি প্রত্যহ বক্তৃতা করিয়া থাকেন—সকলে বলে, তাঁর উপর মৃত আত্মার ভর হয়। 'সার্ব্বজনীন সত্যে'র সম্পাদিকা যিনি জিমি মিল্‌স্‌ প্রাসাদের

* Christian Scientist—আমেরিকার একটী প্রবল সম্প্রদায়। ইহারা যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় অলৌকিক উপায়ে রোগীকে আরাম করিতে পারেন বলিয়া দাবি করেন।

উপর তালায় থাক্‌তেন—এখানে এসে জেঁকে বসেছেন। তিনি উপাসনা সম্মিলন কর্‌ছেন আর লোক জড় করে মনঃশক্তিবলে সব রকমের ব্যারাম ভাল কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন—আশা করি, এঁরা শীঘ্রই অন্ধকে চক্ষুদান এবং এতদ্রূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন কর্‌বেন। মোট কথা এই সম্মিলনটী অন্যান্য সম্মিলন থেকে একটু বিশেষ রকমের। এরা সামাজিক বাঁধাবাঁধি নিয়ম বড় গ্রাহ্য করে না—সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাব ও বেশ আনন্দে আছে। মিসেস মিল্‌স্‌ বেশ জাঁকজমকে আছেন, অন্যান্য অনেক ভদ্রমহিলাও তদ্রূপ। মিসেস ব্যাপিন নাম্নী এক ভদ্র মহিলাকে এতদিন আমি বিধবা ঠাউরেছিলাম—এখন দেখ্‌ছি তাঁর স্বামী বরাবরই রয়েছেন। তিনি পরমা সুন্দরী। ডিট্রয়েটবাসিনী আর একটী দীর্ঘ কেশী সুন্দর কৃষ্ণ নয়না উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা সমুদ্রতীর থেকে পনর মাইল দূরবর্ত্তী একটা দ্বীপে আমায় নিয়ে যাবেন বলেছেন—আশা করি তথায় আমাদের পরমানন্দে সময় কাটবে। মিস্ আর্থার স্মিথ রয়েছেন। মিস্ গার্নসি সোয়াম্প্‌স্কট থেকে বাড়ী গেছেন।

আমি এখান থেকে আমিস্কোয়াম যেতে পারি বোধ হয়। এস্থানটী বড় চমৎকার—এখানে স্নান করার ভারি আরাম। কোরা ষ্টক্‌হ্যাম আমার জন্য একটী স্নানের পোষাক করে দিয়েছে—হাঁস যেমন জল পেলে মহা আনন্দ পায়, আমিও তদ্রূপ জলে নেমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে আনন্দ পাচ্ছি আর "মৃৎপল্লীনিবাসী"দের (হাঁসের দলের) পদেও পক্ষেও ইহা পরম উপাদেয় বটে।

আর বেশী কিছু লেখ্‌বার পাচ্ছি না—আমি এখন এত ব্যস্ত যে, মাদার চার্চ্চকে পৃথক্ ভাবে লেখ্‌বার আমার সময় নাই। মিস হাউইকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাবে।

বোষ্টনের মিঃ উড এখানে রয়েছেন—তিনি তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পাণ্ডা। তবে তাঁর 'জলাবর্ত্ত' (?) * মহোদয়ার

* খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস এডিকে স্বামীজি রঙ্গ করিয়া Mrs. Whirplool বলিতেছেন—কারণ, Eddy ও Whirlpool সমানার্থক।

সম্প্রদায়ভুক্ত হতে বিশেষ আপত্তি—সেই জন্য তিনি দার্শনিক, রাসায়নিক, ভৌতিক, আধ্যাত্মিক আরও কত কি বিশেষণ দিয়া নিজেকে একজন মনঃশক্তিপ্রভাবে আরোগ্যকারী বলে পরিচিত করতে চান। কাল এখানে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছিলো—তাতে তাঁবু গুলোর উত্তম মধ্যম 'চিকিৎসা' হয়ে গেছে। যে বড় তাঁবুর নীচে তাঁদের এই সব 'আরোগ্য-বক্তৃতা' চল্‌ছিল, সেটার ঐ 'চিকিৎসা' প্রভাবে এত আধ্যাত্মিকতা বেড়ে উঠেছিল যে, সেটা মর্ত্ত্যলোকের দৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অন্তর্দ্ধান করেছে আর প্রায় দুশ চেয়ার ভাবে গদগদ হয়ে নাচ্‌তে আরম্ভ করেছিল। মিল্‌স কোম্পানির মিসেস ফিগ্‌স্ প্রত্যহ প্রাতে একটা করে ক্লাস করে থাকেন আর মিসেস মিল্‌স্ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সমস্ত জায়গাটায় যেন লাফিয়ে বেড়াচ্চেন—ওরা সকলেই খুব আনন্দে মেতে আছে। আমি বিশেষতঃ কোরাকে এই আনন্দে মাত্‌তে দেখে ভারি খুসী হয়েছি—গত শীত ঋতুতে ওরা বিশেষ কষ্ট পেয়েছে—একটু আনন্দ কর্‌লে ওর পক্ষে ভালই হবে।

তাঁবুতে এরা যে রকম স্বাধীন ভাবে রয়েছে শুন্‌লে তোমরা বিস্মিত হবে—তবে এরা সকলেই বড় ভাল ও শুদ্ধাত্মা—একটু ছিট আছে—এই পর্য্যন্ত।

আমি এখানে আগামী শনিবার পর্য্যন্ত থাক্‌ব—সুতরাং তোমরা যদি পত্র প্রাপ্তিমাত্র জবাব দাও, তবে এখান থেকে চলে যাবার পূর্ব্বেই পাব। একটী যুবক রোজ গান করে—সে পেশাদার—তার কনে তার সঙ্গে রয়েছে—সেও বেশ গাইতে পারে ও পরমা সুন্দরী—তার বোনও সঙ্গে আছে। এই সেদিন তাঁবুর সকলে একটা দেবদারু গাছের তলায় রাত্রি যাপন কর্‌তে গিয়েছিল—আমি রোজ প্রাতে ঐ গাছতলাটায় ভারতীয় ধরণের আসন পীড়ি হয়ে বসে এদের উপদেশ দিয়ে থাকি। অবশ্য আমিও তাদের সঙ্গে গেছ্‌লাম—তারকাখচিত নভোমণ্ডলের নীচে জননী ধরিত্রীর কোলে শুয়ে রাতটা বড় আনন্দেই কেটেছিল—আমিত এই আনন্দের এক ফোঁটা পর্য্যন্ত বাদ দিই নি।

একবৎসর ভোগ বিলাসের ভিতর থেকে পশুবৎ জীবন যাপনের পর

এই রাত্রিটা যে কি আনন্দে কেটেছিল—মাটিতে শুয়ে, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—তা তোমায় কি বল্‌বো। সরাই বা হোটেলে যারা রয়েছে তারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ সবল শুদ্ধ অকপট নরনারী। আমি তাদের সকলকে 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' করতে শেখাই আর তারা উহা আবৃত্তি করতে থাকে—সকলেই যে শুদ্ধাত্মা কারও মনে যে এতটুকু দাগ পর্য্যন্ত নেই—আর কি সাহসী ও নির্ভীক সকলে—সুতরাং এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। ঈশ্বর ধন্য—যে তিনি আমাকে নিঃস্ব করেছেন; ঈশ্বর ধন্য যে, তিনি এই শিবির নিবাসীদের নিঃস্ব করেছেন। বাবু বাবুনীরা রয়েছেন হোটলে কিন্তু তাঁবুবাসীদের স্নায়ুগুলি যেন লোহা বাঁধান, মন তিন-পুরু ইস্পাতে তৈরি আর আত্মা অগ্নিময়। কাল যখন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল আর ঝড়ে সব উল্‌টে পাল্‌টে ফেলেছিল, তখন এই নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ আত্মার অনন্ত মহিমায় বিশ্বাস দৃঢ় রেখে ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায় সেই জন্য তাদের তাঁবুর দড়ি ধরে কেমন ঝুল্‌ছিল, তা যদি দেখ্‌তে তবে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উন্নত হোতো—আমি এদের জোড়া দেখ্‌তে ৫০ ক্রোশ যেতে প্রস্তুত আছি। প্রভু তাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আশা করি, তোমরা তোমাদের সুন্দর পল্লীনিবাসে বেশ আনন্দে আছ। আমার জন্য এক মুহূর্ত্তও ভেবো না—আমাকে তিনি দেখ্‌বেনই দেখ্‌বেন, আর যদি না দেখেন নিশ্চিত জান্‌বো আমার যাবার সময় হয়েছে—আমি আনন্দে চলে যাব।

"হে মাধব, অনেকে তোমায় অনেক জিনিষ দেয়—আমি গরীব—আমার আর কিছু নাই, কেবল এই শরীর মন ও আত্মা আছে—এইগুলি সব তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ কর্‌লাম—হে, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, দয়া করে এইগুলি গ্রহণ করতেই হবে—নিতে অস্বীকার কর্‌লে চল্‌বে না।" (আমি তাই আমার সর্ব্বস্ব চিরকালের জন্য দিয়েছি।) একটা কথা—এরা কতকটা শুষ্ক ধরণের লোক আর সমগ্র জগতে খুব কম লোকই আছে, যারা শুষ্ক নয়। তারা 'মাধব'

অর্থাৎ ভগবানের রসস্বরূপ একেবারে বোঝে না। তারা হয় খুব জ্ঞান-চর্চ্চড়ি করে অথবা ঝাড়ফুক করে রোগ আরাম করে—টেবিলে ভূত নাবায়, ডাইনগিরি ইত্যাদি ইত্যাদি। এদেশে যত প্রেম, স্বাধীনতা, তেজের কথা শুনা যায় আর কোথাও তত শুনিনি, কিন্তু এখানকার লোকে এগুলি যত কম বোঝে আর কোথাও তত নয়। এখানে ঈশ্বরের ধারণা হয় 'সভয়ং বজ্রমুদ্যতং' অথবা রোগ আরামকারী শক্তিবিশেষ অথবা কোন প্রকার স্পন্দন ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু এদের মঙ্গল করুন—এরা দিনরাত তোতা পাখীর মত 'প্রেম' 'প্রেম' 'প্রেম' করে চেঁচাচ্ছে।

তোমরা শুদ্ধস্বভাবা ও উন্নতচিত্তা—তোমাদের শুদ্ধতাতে তোমাদের জন্য আমার ভিতর থেকে শুভচিন্তা টেনে বার কর্‌ছে। এদের মত চৈতন্যকে জড়ের ভূমিতে টেনে না এনে—জড়কে চৈতন্যে পরিণত কর, অন্ততঃ প্রত্যহ একবার করে সেই চৈতন্য রাজ্যের সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য, শাঁন্তি ও পবিত্রতার রাজ্যের একটু আভাস পাবার এবং দিনরাত সেই ভাব ভূমিতে বাস কর্‌বার চেষ্টা কর। অস্বাভাবিক অলৌকিক কিছু কখন খুঁজো না, উহাদিগকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়েও যেন স্পর্শ করো না—তোমাদের আত্মা দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তোমাদের হৃদয় সিংহাসনবাসী সেই প্রিয়তমের পাদপদ্মে গিয়ে সংলগ্ন হতে থাকুক—বাকি যা কিছু অর্থাৎ দেহ ও অন্য যা কিছু তাদের যা হবার হোক্ গে।

জীবনটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়—দিবারাত্র বল, "তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—আমি তোমায় ছাড়া আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না। তুমি আমাতে আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি।" ধন থাকে না, সৌন্দর্য্য থাকে না, জীবন থাকে না, শক্তি থাকে না—কিন্তু প্রভু চিরদিনই থাকেন—প্রেম চিরদিনই থাকে। যদি এই দেহযন্ত্রটাকে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌লে তাতে কিছু গৌরব থাকে, তবে দেহের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আস্‌তে

না দেওয়া আরও গৌরবের কথা। তুমি যে জড় নও ইহাই তার একমাত্র প্রমাণ—জড়কে নিজের ভাবে থাকতে একদম ছেড়ে দেওয়া। ঈশ্বরে লেগে থাক—দেহে বা অন্য কোথাও কি হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে? যখন নানা বিপদ দুঃখ এসে বিভীষিকা দেখাতে থাকে তখন বল—হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়; যখন মৃত্যুর ভীষণ যাতনা হ'তে থাকে, তখনও বল, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়—জগতে যত রকম দুঃখ বিপদ আস্‌তে পারে তা এলেও বল, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়। তুমি এইখানে রয়েছ, তোমাকে আমি দেখ্‌ছি, তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ, তোমাকে আমি অনুভব কর্‌ছি। আমি তোমার, আমায় টেনে নাও প্রভু; আমি এই জগতের নই, আমি তোমার—তুমি আমায় ত্যাগ কোরো না। এই হীরার খনি ছেড়ে কাচ খণ্ডের অন্বেষণে যেও না। এই জীবনটা একটা মস্ত সুযোগ—কি! তোমরা এই সুযোগ অবহেলা করে সংসারের সুখ অন্বেষণে যাবে। তিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ—সেই পরম বস্তুর অনুসন্ধান কর, সেই পরম বস্তুই তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক তা হলে নিশ্চিত সেই পরম বস্তু লাভ কর্‌বে।

সর্ব্বদা আমার আশীর্ব্বাদ জান্‌বে।

তোমাদের—
বিবেকানন্দ।

"শাস্ত্রের মর্ম্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধন কর্‌তে হয়।"

"ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হয়! বসে বসে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে? শ্যালারা, পথে যাবারই কথা—ঐ নিয়ে মরছে!—মর্‌ শ্যালারা ডুব দেয় না!!"—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

বিবেকানন্দ।

(শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার তত্ত্বনিধি, বি, এল,)

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিতে হইলে তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছেন এবং এই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি ইহা অবগত হওয়া যেমন একান্ত প্রয়োজন তেমনি যে সকল ঘটনা ও জীবনীর সংযোগে তাঁহার জীবনকে জগদ্-ব্রত রূপে গঠিত করিয়াছে সেই সকল ঘটনা ও জীবনী বিশেষভাবে অবগত হওয়া আবশ্যক।

(ক) তৎকালীন পারিপার্শ্বিক জগৎ।

তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন সে সময় প্রতীচ্যে ধর্ম্ম materialism বা জড়বাদের আঘাতে সাধারণ মানবহৃদয় হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের আসন জড়বাদ গ্রহণ করিয়াছিল বা গির্জ্জাভ্যন্তরে জনকতক পুরোহিতের নিকট নিবদ্ধ হইয়াছিল। অনেক স্থলে ধর্ম্ম শুধু কতকগুলি নিয়মকানুন, dogmas, forms, rules, প্রতিপালনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম পোষাকী ধরণের মতবাদ হইয়া পড়িয়াছিল। আর খৃষ্টধর্ম্ম—যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রেমের ধর্ম্ম, তাহা বেতনভোগী অনুভূতিহীন প্রচারকের হাতে পড়িয়া অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপবাণী নিক্ষেপ, কুৎসাকীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা আক্রমণে পরিণত হইয়া যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। কতকগুলি দার্শনিক পণ্ডিত মনে করিতেন যে ধর্ম্ম অন্ধ বিশ্বাস মাত্র বা অসভ্য আদিম জাতিদের ভূত বিশ্বাসের একটী সভ্য সংস্করণ মাত্র। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বিজ্ঞানাগারের পরীক্ষাশালায় দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, তাপমান, আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্র, বৈদ্যুতিক শক্তিমান যন্ত্র (Telescope, microscope, thermometer, spectroscope, electrometer) দ্বারা ধর্ম্মের কিছু না পাইয়া বা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (chemical reaction) না পাওয়ায় ভাবিতেন উহা একটা মানসিক বিকার মাত্র।

ধর্ম্মের সহিত কতকগুলি সামাজিক নিয়ম, রীতি, প্রাচীনকাল-প্রিয় রূপক বা কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাসীর সংস্কার জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেহ ঐগুলির কোন একটীকে কোন প্রকারে অসার বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেন তবে সমস্ত ধর্ম্মে কিছুই নাই ভাবিতেন। এমনও হইয়াছিল যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করা দুর্ব্বলতা বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহারা নিজ নিজ জীবনের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, জীবনের কোন্ অংশ উৎকর্ষ লাভ করে নাই তাহা জানিতেন না।

প্রাচ্যেও ধর্ম্মের নামে একদিকে কতকগুলি আচার ও কুসংস্কার খাড়া হইয়াছিল, যদিও কতকগুলি আচারের প্রয়োজনীয়তা সাময়িকরূপে থাকিলেও সেগুলি যে লক্ষ্য নহে, উপায় মাত্র—তাহা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছিল, উপায়ই লক্ষ্যরূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল; সমাজের এক ব্যক্তি তাহার নিম্নতর স্তরের আর এক ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে কয় বার স্নান করিতে হইবে তাহা লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, হয় ত তাহা লইয়া দশ বিশটা শ্লোক সংগ্রহে রত থাকিয়া জীবন ধন্য বিবেচনা করিতেন। মহাপ্রভুর পবিত্র প্রেম নিকেতনে কামের তাণ্ডব নৃত্য, ভৈরবী চক্র, লতা সাধন ইত্যাদিতে শাক্তের শক্তি সাধনার পরিণতি মাতৃভাবের স্থানে পৈশাচিক বৃত্তির চরিতার্থতার ক্রীড়া হইতেছিল। অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণকে প্রতীচ্যের ভীষণ জড়বাদ (materialism)-এর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, তাঁহারা ভাবিতেন হিন্দুর যাহা কিছু সব কুসংস্কার মাত্র, হিন্দুর দেবদেবী পূজা পৌত্তলিকতা মাত্র, প্রতিমা দর্শনে তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাহাতে অশ্লীলতার গন্ধ অনুভব করিতেন (যদিও কথঞ্চিৎ প্রকারে তাহা অন্যপক্ষের কার্য্যের ফল)। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি তাদৃশী ভবেৎ। পাশ্চাত্য শিক্ষার দাপটে হিন্দুধর্ম্ম কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, দলে দলে লোক খৃষ্টান (christian) হইতেছিল, এই সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উপনিষদুক্ত নিরাকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়া এবং তৎসহ সামাজিক বিধিনিষেধের কথঞ্চিৎ শিথিলতা আনয়ন করিয়া সে

স্রোতে কতক পরিমাণে বাধা প্রদান করেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী। একদিকে সমাজের উপেক্ষা, ও স্বল্পমতিদের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের বিকৃতিকরণ অন্য দিকে প্রখর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, নব্য শিক্ষাগুরুদের দ্বারা শিষ্যমণ্ডলীকে স্বমতের দিকে আকর্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্লেষ নিক্ষেপণ, এবং নব্য শিষ্যমণ্ডলীর স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার ফলে যুবকগণ ধর্ম্ম পিপাসা মিটাইবার জন্য বা স্বার্থ প্রণোদিত কঠোর সামাজিক অত্যাচার বা আপাত প্রতীয়মান বিরুদ্ধ ভাবগুলির হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দলে দলে ভাসিয়া যাইতেছিল—রামমোহন তাহাদের সম্মুখে মহোচ্চ ব্রহ্মোপাসনা ও সাম্যবাদের আদর্শ ধরিয়া সে স্রোতের মুখ হইতে তাহাদিগকে থামাইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! কালক্রমে তাহাও ধর্ম্মের একটী ইউরোপীয় সংস্করণ হইয়া দাঁড়াইল।

এইরূপে নানা বিপর্য্যয়ে প্রপীড়িত হইয়া জগৎ যখন ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল, সেই সময়ে কত মহাত্মার কাতর প্রার্থনার ফলস্বরূপে বিবেকানন্দ অবতীর্ণ হন। সত্যের একনিষ্ঠ সেবক নরেন্দ্রনাথ এই সময় অপরিসীম ধীশক্তি ও মহান্ হৃদয় লইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে জন্মগ্রহণ করেন। সত্যানুসন্ধানে প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রাণের আকুল পিপাসা মিটাইবার জন্য তিনি বিবিধ ব্যক্তির নিকট উপনীত হন কিন্তু কোথাও তাঁহার অতৃপ্ত পিপাসা মিটে নাই; অবশেষে তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসারূপ সেই তীব্র অতৃপ্ত পিপাসা তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে অমৃতসাগরের উপতটে উপনীত করায়। সেই সাগরে স্নান করিয়া তাঁহার সকল পিপাস মিটিয়া যায়। সেইখানে তিনি বুঝেন ধর্ম্ম শুধু Intellectualism or sentimentalism—বিচারবুদ্ধিমত্তা অথবা ভাবপ্রবণতা নহে, উহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। ব্রহ্ম উপলব্ধির বিষয় এবং তাহা অতীব সত্য। সেই অমৃতসাগরে আত্মবিলীন করিয়া তিনি নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেন। সেইখানেই তিনি প্রেমসিক্ত অভিনব বেদান্ত শিক্ষা পান—যাহাতে জ্ঞান, কর্ম্ম প্রেমের অপূর্ব্ব সমাবেশ।

সেথানে তিনি শিক্ষা পান—ব্রহ্মই সত্য বস্তু, কিন্তু জগতেরও

আপেক্ষিক সত্যতা আছে। এই শিক্ষায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইয়া তিনি জড়বাদের উৎস ও ক্রীড়াভূমি আমেরিকা ও ইউরোপে গমন করেন। তথায় ভীম হুঙ্কারে জানাইয়া দেন—Religion is not Intellectualisation nor Sentimentalism but Realisation. সেখানে বুঝান Hinduism is not idolatry, হিন্দুত্ব পৌত্তলিকত্ব নহে; আর বুঝান উহার বিশাল উদারতা, বিশ্বজনীনতা। হিন্দুধর্ম্মের মহত্ব কোথায় নিহিত তাহা প্রদর্শন করেন। ধর্ম্ম শুষ্ক বিচার নহে, অনুভূতির বিষয়, খেয়ালের বিষয় নহে; শুধু কতকগুলি theory (মতবাদ) মাত্র নহে। উহার practical side বা কার্য্যকরী দিকও আছে। তিনি দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া প্রকৃত খৃষ্টান হইতে হয়, কেমন করিয়া প্রকৃত হিন্দু হইতে হয়। তাঁহার এই সত্য প্রচারের ফলে ইউরোপ ও আমেরিকাতে বেদান্ত সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠা। তাঁহাতে এক দিকে যেমন জ্ঞান ধর্ম্মের বিকাশ দেখি অন্য দিকে কর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। ভারতের 'দরিদ্র নারায়ণে'র জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়াছিল, তাই তাঁহার সে প্রেম দরিদ্র নারায়ণের সেবারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, সেই প্রেমবশেই তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন। যখন ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া লইল তখনই পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষায় মোহাবিষ্ট নব্য ভারতের কতকটা চমক ভাঙ্গিল, তাহারা চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহার পানে দৃষ্টিপাত করিলেন ও ধর্ম্মে যে কিছু আছে, হিন্দুধর্ম্মে যে অমূল্য রত্নরাজি বর্ত্তমান তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় না গেলে, পাশ্চাত্যগণ তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে, পাশ্চাত্যের মন্ত্রমুগ্ধ শিষ্যগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন কি না তদ্‌বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ, বোধ হয় বুঝিতেনই না। আবার, এই নব শিক্ষায় শিক্ষিতগণই সমাজের নেতা, পথপ্রদর্শক—তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে জনসমাজ ত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বা বুঝিতে পারিত না বা চেষ্টাও করিত না। তাঁহারই নির্দ্দেশে সকলে আজ বুঝিতেছেন ধর্ম্ম কতকগুলি বিশ্বাসের সমষ্টি নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। ধর্ম্মের নামে

পূঞ্জিত কুসংস্কার ও কদাকাররূপ পঙ্ক হইতে যে মহাপুরুষ প্রকৃত ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি জড় উপাসনার হাত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বর্ত্তমান কালোপোযোগী এক অভিনব বেদান্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তাঁহার চরণে স্বতঃই আমাদের মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

আবার দেখি তাঁহার স্বদেশ প্রীতি বক্তৃতামঞ্চের বাক্য বিন্যাসে পর্য্যবসিত হয় নাই। তাই দেখি তাঁহার নিকটে ভারতের প্রত্যেক ধূলিকণা পবিত্র। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্বদেশ প্রীতি কে শিখাইবে? তিনিই বুঝাইয়াছেন, আতুর, দরিদ্র, অন্ধের প্রতি দয়া করা নয়, তাহারা দয়ার পাত্র নহে—নারায়ণ বোধে তাহাদিগকে সেবা করিতে হইবে; আর শিখায়েছেন এই নারায়ণ সেবা সেবকের হৃদয়ের উৎকর্ষ, আত্ম-বিস্তৃতির অবসর মাত্র। আর "যত্র জীব তত্র শিব"রূপ অদ্বৈতমূলক মহাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সেবাধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ এবং বিস্তারেই ভারতের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবন সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান। তাই ভাবিয়া ধন্য হই,—ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ কোথায়?

(খ) তাঁহার সত্য প্রচার।

তিনি আসমুদ্র হিমাচল, ভারত, ইউরোপ, আমেরিকায় সত্য প্রচারে, অভিনব প্রেমসিক্ত বেদান্ত প্রচারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রকৃত ধর্ম্মকে, সমস্ত ধর্ম্মের মূল সত্যগুলিকে অকুতোভয়ে প্রচার করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন। এবং কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস, স্বার্থ প্রণোদিত মতবাদের মূলে কঠোর প্রহার জন্য তাঁহার জীবনও অনেক সময় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বলিতে লজ্জা হয় কতকগুলি নাম যশাকাঙ্ক্ষী ধর্ম্মধ্বজী নীচাশয় ক্ষুদ্রমনা লোক, তাঁহার জীবন যাহাতে বিপন্ন হয়, এমন কি অনাহারে, বা বস্ত্রাভাবে তাঁহার জীবন যাহাতে নষ্ট হয় এরূপ চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান, সত্যের একনিষ্ঠ সেবক, মহা প্রেমিক সেই সকল বিষয় জানিতে পারিয়াও সেদিকে কিঞ্চিৎমাত্রও দৃকপাত না করিয়া জীবনের

লক্ষ্যে অটল থাকিয়া তাঁহার প্রিয়তম মহাসত্যগুলি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশ ঘোর তামসিকতায় পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যাহার ফলে শুধু জড়তা, শুধু অজ্ঞান, অন্ধ বিশ্বাসের সেবা, ধর্ম্ম বিদ্বেষ, ধর্ম্মের নামে পৈশাচিকতার অভিনয়! তাই দেশকে তামসিকতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কর্ম্ম দ্বারা তামসিকতা দূর করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আর ইউরোপ ও আমেরিকা ভোগের চরমে গিয়াছে, ঘোর রাজসিকতায় পূর্ণ, সাত্ত্বিকভাবের একান্ত অভাব, যাহার জন্য কথায় কথায় লক্ষ লক্ষ নরবলি ঘটে কথায় কথায় ভীষণ সংঘর্ষ, তাই ইউরোপ ও আমেরিকাকে সত্ত্ব ভাবের অনুশীলনের উপদেশ দিয়াছেন। অবশ্য মূল লক্ষ্য সকলের সম্মুখে এক রাখিয়াছেন, সে লক্ষ্য গুণাতীতে পৌছান।

(গ) বিবেকানন্দের জীবনে রামকৃষ্ণের প্রভাব।

বিবেকানন্দ-জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব বুঝিতে হইলে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক পরিচয় অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং ঐ পরিচয় অবগত হইবার জন্য আমি শ্রীঅমিয়ধারা হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটী উদ্ধৃত করিতেছেন—

"বুদ্ধ লয় শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন, শঙ্করাচার্য্য পরিষ্কার ক'রে দিছিলেন। বুদ্ধের উত্তর শঙ্করাচার্য্যের কার্য্যের কাছে। জ্ঞানী ছাড়া বুঝ্‌তো না কি না, তাই চৈতন্যের আবির্ভাব। ধর্ম্ম নিয়ে হিংসা হয়েছিল কি না তাই একত্ব দেখাতে এসেছিলেন রামকৃষ্ণ। থাক্ ধর্ম্ম কর্ম্ম, আমার আমিত্ব পেলে বাঁচি এখন।"

আমরা এই মহাবাক্য হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে ভারতবর্ষে অভিনীত মহালীলার চারিটী অঙ্কের প্রধান ৪ চারিজন নায়কের জীবনের পরস্পর সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। চতুর্থ নায়ক জগতে মুখ্যতঃ অভিনব ভাব প্রবর্ত্তনের জন্য আগমন করেন নাই, বর্ত্তমান ভাবসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য, এবং বিবেকানন্দের প্রচারিত শিক্ষায় এই সত্যই ধ্বনিত হইতেছে। "I want Hindus to

be better Hindus, Christians to be better Christians and so on."

বহু সংখ্যক ধর্ম্মমতে পরিপূর্ণ জগতে অভিনব ভাবের প্রচার ও প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে, সকল ধর্ম্মমতের মধ্যে সমন্বয় প্রদর্শন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের অর্থ ইহাই যে বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে বর্ত্তমান সার সত্যগুলি যে এক ইহা ব্যক্ত করা। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মের অভ্যন্তরে সংকীর্ণতা ও আবিলতা উপস্থিত হইয়াছে কেবলমাত্র ধর্ম্মসমূহের সমন্বয় দ্বারা সেই আবিলতা দূরীভূত হয় না। আমরা দেখিতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ দেব মুখ্যভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ আবিলতা ও সংকীর্ণতা দূর করিবার প্রয়াস পান নাই কিন্তু সমন্বয়ের দ্বারা ঐ সকল বিদূরিত করিবার পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। যথা তিনি নিজে ছাগ বলি দর্শনে একান্ত ব্যথিত অথবা অসমর্থ হইলেও তিনি উহাতে সাধারণ মানবের ন্যায় বাধা দেন নাই। যিনি বৃক্ষ হইতে পত্র ছিন্ন করায় অথবা দূর্ব্বাদলকে পদদলিত করায় ব্যথিত হইতেন, তিনি এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখিয়া স্থানান্তরিত হইতেন, বাধা প্রদান করেন নাই।

এই অলৌকিক কার্য্যের রহস্যের উদ্‌ঘাটন করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না এবং তাঁহাকে বুঝিলেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। তিনি যদি বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রচলিত রীতি নীতিতে বর্ত্তমান দোষ উদ্‌ঘাটন করিতেন তবে তাঁহার কৃত সমন্বয় তাঁহার কার্য্যের দ্বারা অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

(ক্রমশঃ)

মনুষ্যত্বের সাধনা।

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(১০)

এই জাতীয় কর্ম্মতপস্যার দৃষ্টান্ত বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য হইতেই গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের দেশে কি এরূপ দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব? তাহা নয়। তথাপি একথা নিশ্চয় বলিতে হইবে জেনোয়ার যে ঘড়ির দোকানের কর্ম্মচারী বালক দিনের পর দিন নূতন প্রকারের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মুদ্রা যন্ত্র উদ্ভাবনের ধ্যানে আহার নিদ্রা ভুলিয়া পরিশ্রম করিয়া-ছিল, সেরূপ প্রকৃতির অধ্যবসায় ভারতবর্ষে সুলভ নহে। তাহার কারণ, অনুশীলনী শক্তির অভাব নহে অনুশীলনে মনঃসংযোগের অভাব।

আজ কাল এই একটী কথা অনেকের মুখে শুনা যায়, অনেক প্রবন্ধে দেখা যায়, যে "পাশ্চাত্যের গতি প্রবৃত্তির দিকে, প্রাচ্যের নিবৃত্তির দিকে।" পাশ্চাত্য ভোগের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, প্রাচ্য ত্যাগের আদর্শ। কিন্তু বোধ হয় প্রকৃত পক্ষে আদর্শ সর্ব্বত্রই ত্যাগের, ত্যাগকেই আমরা ভোগের উপাদানরূপে গড়িয়া লই। খৃষ্টানধর্ম্মের আদর্শ ত্যাগ, ভোগ নয়, কিন্তু ক্যাথ্লিকের ত্যাগের মন্দির কপটতার উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া ভোগ মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। অকপট মার্টিন লুথার সেইজন্য ত্যাগের চিহ্নস্বরূপ গৈরিক বস্ত্রে সান্ত্বনালাভ করিতে পারেন নাই। অপর দিকে, যাহাকে আমরা ত্যাগের নিকেতন বলিয়া গর্ব্ব করি সেই ভারতবর্ষেও ইহার সমদৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভক্তি শাস্ত্র পাছে ভাবের দিকে বেশী হেলিয়া পরিণামে আত্মবিনোদনের বিলাসিতায় পরিণত হয় সেজন্য বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ পদে পদে সাবধান হইয়াছেন, তথাপি যে সাধনা রাধিকার সর্ব্বত্যাগী প্রেমকে আদর্শ করিয়া চন্দ্রাবলীর প্রেমকেও ধিক্‌ত করিয়াছে, "কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্রই" যে সাধনার মূল মন্ত্র, যে সাধনা লোকাচারের বন্ধন দুস্ত্যজ

আর্য্যপথ পর্য্যন্ত ত্যাগ করাইয়া সাধককে লোক দৃষ্টে কলঙ্কের পথ আশ্রয় করাইয়াছে, যে সাধনার প্রচলিত উক্তি "ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিন থাকিতে নয়" সেই অতি উচ্চ প্রেম ও ভক্তির সর্ব্বত্যাগের আদর্শ কেমন করিয়া ভাবের বিলাসিতাটুকুই গ্রহণ করিয়া অপৌরুষ ও অধঃপতনের পথে চলিয়াছে তাহার দৃষ্টান্তের কোন অভাব নাই। জগতের সকল ধর্ম্মেই, স্বর্গের প্রলোভন, নরকের ভয়, অন্ততঃ পক্ষে ভগবান লাভের প্রলোভন কিম্বা তাঁহার বিরাগের ভয় অনুশাসন দণ্ডরূপে গোচারণের ন্যায় মানব চারণে নিয়োজিত হইয়াছে; এমন যে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনার পরম উপদেশ ভগবদ্গীতা, পরবর্ত্তীগণ ঔষধের সহিত মধু অনুপানের ন্যায় গীতা মাহাত্ম্যে তাহারও ফলশ্রুতি উপসংহার দিয়া গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এবং যে গীতার প্রতি ছত্রেই ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ আছে গীতা মাহাত্ম্য পাঠ না করিলে সেই "গীতা" পাঠেরই কোন ফল হইবে না বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সিংহবিক্রমী শাক্য সিংহ এ আবরণ একেবারেই ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যজ্ঞের প্রকৃত তাৎপর্য্য আত্মোৎসর্গ, সহজ পথচারী ফলকামী মানব সহজে আত্মদানের ফল লাভের জন্য পরিবর্ত্তে ছাগল ঘোড়া ধরিয়া বলি দিতে আরম্ভ করিল। পরে আবার প্রতি-নিধিত্বটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য মানুষ বলি দিতেও দ্বিধা করিল না। অবশেষে বলির এক শাস্ত্রই বাহির হইল, তাহাতে সকল রকম বলির জীবের সম্বন্ধে ব্যবস্থা রহিল কেবল আত্মবলিদানটুকুই বাদ রহিল। বুদ্ধদেব মানবের এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া বাক্য দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া কর্ম্মের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি ঈশ্বরের নামোল্লেখ করিলেন না, আত্মা সম্বন্ধেও বিশেষভাবে কিছু বিচার করেন নাই, কেন না সেরূপভাবে বুঝাইতে গেলে মানব ব্যক্তিত্ব বুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ করিয়া স্বার্থপরায়ণতার পন্থাকেই ধর্ম্মের নামে অভিহিত করিবে। আত্মার কোন ব্যাখ্যা নাই, হইতেও পারে না, তাহা কেবল উপলব্ধিগম্য। নির্ব্বাণধর্ম্ম আত্মতত্ত্বের কর্ম্মময় ব্যাখ্যা, মৌখিক ব্যাখ্যা নহে। একদা কোন পরিব্রাজক বুদ্ধের নিকট আসিয়া "মৃত্যুর পর পরলোক আছে

কি না, বোধিসত্বগণ ইহলোক ত্যাগের পর সূক্ষ্মশরীরে বর্ত্তমান থাকেন কি না” প্রভৃতি নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধদেব সে প্রসঙ্গে কোন উত্তর না দিয়া মৌন রহিলেন। পরিব্রাজক উত্তর না পাইয়া চলিয়া যাইবার পর আনন্দ দুঃখিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভো, আপনি উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসুকে নিঃসংশয় করিলেন না কেন?” তদুত্তরে বুদ্ধদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন “ইহাতে উত্তর দিবার কিছু নাই। মৃত্যুর পর পরলোক নাই জানিলে এ ব্যক্তি জানিত ইহলোকই সার, এবং পরলোক আছে জানিলে পারলৌকিক সুখ দুঃখ কল্পনা করিয়া তাহাতেই বদ্ধ রহিত।” অন্যত্র, এইরূপ প্রশ্নাদিতে নিরুত্তরে রহিবার হেতু বুঝাইবার জন্যই যেন বলিয়াছেন “যদি কেহ বক্ষঃস্থলে সুতীক্ষ্ণ তীরের আঘাত পাইয়া মরণাপন্ন হয়, সে যদি তখন পণ করে ‘এই তীর কোথা হইতে আসিল, যে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে তাহার আকৃতি কিরূপ, কে প্রস্তুত করিয়াছে, এই সমস্ত অবগত না হইয়া ঔষধি পান করিব না’ তবে, সে সময় তাহার আত্মীয়স্বজন কি তাহার কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করেন অথবা ঔষধ দিয়া তাহার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেন? এরূপ স্থলে, কৌতূহল নিবৃত্তিই প্রয়োজন, অথবা যাহাতে প্রাণরক্ষা হয় সেইরূপ ঔষধ প্রয়োজন?”

বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতের প্রতিধ্বনি স্বরূপ কেহবা বৌদ্ধধর্ম্মকে চার্ব্বাকের দেহাত্মিকা ধর্ম্মের ন্যায় নাস্তিক ধর্ম্ম বলেন, কিন্তু যথার্থ বলিতে গেলে চৌদ্দ আনা তথাকথিত ঈশ্বর বিশ্বাসী চার্ব্বাকের ধর্ম্মই কার্য্যতঃ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধের নির্ব্বাণ, প্রেমে, করুণায়, দয়ায়, পরসেবায় স্বার্থবোধের লয়। কুমার সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে বাহির হইলে কিসা গৌতমী নামে এক শাক্য কুমারী তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া এই গাথা গান করিয়াছিল,—

“যাহার এমন পুত্র সেই জননীই সুখী,
“যাহার এমন পুত্র সেই জনকই সুখী,
“যাহার এমন স্বামী সেই রমণীই সুখী,
“যাহার এমন পিতা সেই পুত্রই সুখী”

এই সঙ্গীত শ্রবণ মাত্র কুমার সিদ্ধার্থের হৃদয়ে নির্ব্বাণের অনুভূতি স্পষ্টতর হইল। কুমার ভাবিলেন এই সঙ্গীতের ভাবার্থ,—

সেই জননীই সুখী যিনি পুত্রস্নেহে নির্ব্বাণ লাভ করেন।
সেই জনকই সুখী যিনি পুত্রের স্নেহে নির্ব্বাণ লাভ করেন।
সেই পত্নী সুখী যিনি স্বামীর প্রেমে নির্ব্বাণ লাভ করেন,
সেই পুত্র সুখী যিনি পিতৃভক্তিতে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

ইঙ্গিতে এইরূপ বলা হইতেছে। সিদ্ধার্থ তখন গুরুদক্ষিণাস্বরূপ শাক্য কুমারীকে নিজ কণ্ঠের বহুমূল্য রত্নহার পাঠাইয়া দিলেন।

কিন্তু যিনি উত্তরাধিকার সত্বে নিজ শিশুপুত্রকে ভিক্ষাপাত্র ও গৈরিক-বস্ত্র দিয়া নির্ব্বাণ মন্ত্র দান করিয়াছিলেন তাঁহার ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী-গণও ভোগকে ত্যাগের বস্ত্র পরাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। পরিণামে তাঁহাদেরই ধর্ম্মরক্ষার কুটনীতি রাজ্যরক্ষার কুটনীতিকেও পরাস্থ করিয়াছিল।

অন্যদিকে আবার, মহম্মদ তরবারি সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া-ছিলেন। রৌদ্রপ্রখর আরবদেশে স্বাধীনচেতা মরুসন্তানগণের মধ্যে মহম্মদের অভ্যুদয়। মহম্মদ এক হাতে তরবারি ও অপর হাতে কোরাণ লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এই কথা বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার নিন্দা করেন। কিন্তু ইহা কখনও সম্ভব নয় যে একক মহম্মদ অস্ত্রবলে সমস্ত দেশকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন। ভবিষ্যতে এই তরবারি সাহায্যে ধর্ম্ম প্রচার যদিও বিধর্ম্মীপীড়নরূপেই পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমে কোন্ ভাব হইতে তরবারি সাহায্যে ধর্ম্মপ্রচার অভ্যুদিত হইয়া-ছিল ভাবিয়া দেখিলে একথা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, তরবারির পশ্চাতে নিয়ত জাগ্রত একটী কল্যাণ ইচ্ছা বর্ত্তমান ছিল বলিয়া এককের তরবারির নিকট অসংখ্য মস্তক নত হইয়াছিল। জননীও অবোধ সন্তানের কল্যাণের জন্য তাহার উপর কখনও কখনও বলপ্রকাশ করেন। অন্যে যেখানে মুখে উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হয়, তাঁহার স্নেহাতুর কল্যাণকামী হৃদয় সেখানে মুখের কথায় না বুঝিলে বলপ্রকাশেও সন্তানকে অকল্যাণ হইতে নিবৃত্ত করে। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই,

প্রেমাবতার মহাপ্রভু ভাবাবেশে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে দণ্ড দিয়াছিলেন। যীশু জেরুজিলামের ধর্ম্মমন্দিরে ব্যবসায়ীদিগকে বাজার পাতিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাদের মুদ্রা প্রভৃতি ছড়াইয়া দিয়া কষাঘাতে তাহাদিগকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সে কষাঘাত ব্যবসায়ীদের পৃষ্ঠে আঘাত করা নয়, ধর্ম্মমন্দিরে ব্যবসায় রূপ অন্যায়কেই আঘাত দেওয়া। মহম্মদের প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব লাভের ইচ্ছা হইলে অনায়াসেই তিনি আরব-পুরোহিতগণের নেতৃত্ব লাভ করিতে পারিতেন, সেই দুর্দ্ধর্ষ মরু-সন্তানগণকে নব ধর্ম্মপথ দেখাইতে গিয়া, উত্তেজিত করিয়া তাঁহার নিজের জীবন বিপন্ন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তিনি না করিয়া পারেন নাই। তাঁহার তরবারি গ্রহণের মূলে যে কি ভাব বর্ত্তমান ছিল, কোরাণের একটী উক্তি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

"তোমার ভাই মুসলমানকে সাহায্য কর, যদি সে নিজে পীড়নকারী হয়, অথবা অন্য কর্ত্তৃক পীড়িত হয়। কিন্তু একজন পীড়নকারীকে কেমন করিয়া সাহায্য করিবে? ইহার ভাবার্থ—তাহার অন্যায় কর্ম্মে বাধা দাও, অর্থাৎ তাহাকে দোষী হইতে দিও না।"

ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের সৌভাগ্যের অধিকারী বলিয়া আমাদের সকলের মনই নিবৃত্তিমার্গে অবস্থিত, একথা বলার তুল্য বাতুলতা আর কি আছে? ভিক্ষুক আবার কি ত্যাগ করিবে? প্রবৃত্তি পূরণের শক্তিই যাহার নাই তাহার মুখে নিবৃত্তির উপদেশ,—সে যে কেবল উপহাসের বিষয়। আমাদের জাতীয় কবি বজ্রস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব দণ্ড বজ্রসম তারে যেন দহে।"

আমরা অন্যায়কে মন ও বাক্য দ্বারা অস্বীকার করিলেই সকল সময় অস্বীকার সম্পূর্ণ হয় না, অনেক সময় বাহু দ্বারাও অস্বীকার করিতে হয়; পরসেবা ও পরপীড়ন নিবারণ উভয়ে যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে তাহা নহে। "যুদ্ধ" এই নাম দিয়া মানুষ মানুষকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিতেছে, এটী যতদূর ভীষণ, মীরজাফরের যুদ্ধবিমুখতা তদপেক্ষা অধিক

ভীষণ, ইহাতে মতভেদ নাই। যদি অস্ত্রত্যাগ করিলেই হিংসাবৃত্তি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইত, তাহা হইলে সশস্ত্র জাতিই হিংস্রাপরায়ণ এবং নিরস্ত্র অহিংসক হইত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যায়, প্রতীকারে অসমর্থ কাপুরুষই অধিক হিংসাপরায়ণ হয়। ব্যক্তিগতভাবে বিচার না করিয়া জাতীয় ভাবের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে কেবল এই মতে আমরা বলিতে পারি পাশ্চাত্যের আদর্শে ও প্রাচ্যের আদর্শে অনেক প্রভেদ আছে। ভারতবর্ষ আজ যুদ্ধবিমুখ হইলেও চিরদিন যুদ্ধবিমুখ জাতি নহে, সমস্তদিনের যুদ্ধান্তে উভয়পক্ষ পরস্পরের শিবিরে গিয়া কুশল প্রশ্ন করিতেছেন এমন কাহিনীও রাজস্থানের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মের নবযুগ।

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী।)

একটা নূতন ধারায় প্রবাহিত স্রোত এখনকার দিনে সকল দেশেই বইতে দেখচি—ধর্ম্ম নিয়ে—ঈশ্বরতত্ত্ব জগৎ রহস্যের বিচার নিয়ে সমস্ত মানবচিত্তই চমকে উঠেছে। পৃথিবীর প্রাণবহা নাড়ী চঞ্চল,—সেথা উষ্ণ রক্তের তর তর স্রোত একটা উন্মাদনা জাগিয়েছে। এ আর এখন তুমি নও, আমি নয়, সকল দেশের সকল জ্ঞানী তত্ত্বান্বেষী মাত্রেই আজ চিন্তার পদ্ধতিকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এতদিন ধর্ম্ম বলতে ছিল—বিশ্বাস। যে দেশে যেমন যেমন মতবাদ প্রচলিত সে দেশের লোক সেইটেকেই আঁকড়াত, এই আঁকড়ে ধরার অটুট দৃঢ়তাটাই ছিল ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ। এইটে এইটে আমার দেশে সকলে সত্য বলে মানুচে। এই গুলোকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন আর তাঁদের মত তেমন সুমহান চরিত্র নরলোকে আর পরিস্ফুট হয় নি, অতএব দ্বিধা নয় বিচার বিতর্ক নয়,—বিশ্বাস। এই সব মত গুলো বিশ্বাস কর্ত্ত।

বুকের পাঁজরের মত এগুলো আমা হতে অচ্ছেদ্য হবে। এই দৃঢ়তাই ছিল ধর্ম্ম,—এই প্রতিজ্ঞাই ছিল ধর্ম্ম।

এখন হঠাৎ এসে গেছে সন্ধানের যুগ। মানুষ মাত্রই আজ কিছু কিছু প্রত্যক্ষ কর্ত্তে চায়। তারা বলে জানতে চাই না—হতে চাই। মানতে চাই না—পেতে চাই। আমার দেশে যা প্রচলিত আছে সে যদি সত্য হয় তবে তার প্রমাণও আছে। পূর্ব্ব পুরুষগণ যা মেনে জীবন কাটিয়ে গেছেন তা কেবল মাত্র মানার দ্বারা তাঁদের ভক্তি করা যেতে পারে। কিন্তু ভক্তি করাতেই পূর্ব্ব পুরুষের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না। আমাদের মধ্যে যদি কেউ পাগল জন্মে থাকে মাত্র সেই-ই মনে কর্ত্তে পারে যে, আমার ছেলে কেবল দুবেলা দণ্ডবৎ হয়ে আমায় প্রণাম করুক আমায় ভক্তি করুক, আমার গুণগ্রামের অধিকারী হয়ে তার কাজ নেই। পরবর্ত্তী পুরুষের প্রতি যেমন আশা কর্চ্ছি পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষদেরও তেমনি; এই সন্ধানের যুগে আমরা মানুষেরা, একই ভাবে কল্পনা কর্ত্তে আরম্ভ করেছি। আমরা অনুভব কর্চ্ছি নিজেদের মধ্যে বিষম দৈন্য। ভাবচি কি ছাই কল্লুম! পূর্ব্বপুরুষরা আমাদের, তাঁদের আপনারই থাকব বলেই না আমাদের এই তাঁদের অনুবর্ত্তী হওয়া? তাঁরা যা অবলম্বন করে দিন কাটিয়ে গেছেন সেই গুলোর প্রাধান্য স্বীকার কল্লুম না কল্লুম সত্যকার অনুবর্ত্তীতার কাছে তা বয়েই যাবে যদি না আমরা তেমনি আমাদের চরিত্রও গড়ে তুলতে পারি। অতএব তাঁরা যা মেনে গেছেন জয় ঘোষণা করে আমরা তা মানব না। সে গুলির সাহায্যে তাঁদের তুল্য চরিত্র সঞ্চয় করেই মানুব। অথবা যেমন করে ঠিক তাঁদের মত চরিত্র সঞ্চয় কর্ত্তে পারি তাইই কর্ব্ব।

এইতে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন চক্ষের সম্মুখে বিভ্রম বাঁধিয়ে দিয়েছে। এখন তাঁদের মতগুলোকে যতই মানতে শিখি পথটার দোহাই দিয়ে যতই গৌরব করি, সত্য সত্য আমরা তাঁদের থেকে খানিকটে দূরে এসে পড়ছি। এতদূর যে, তাঁদের পদচিহ্ন, যে পথটার নাম আমরা কর্চ্ছি সে পথটার কোথায় পড়েছিল কিংবা আজো মুদ্রিত আছে, এখনও মোছে নি, তা আমরা জানি না। বর্ত্তমান এই দূর

স্থানটায় দাঁড়িয়ে জগতের মধ্যে সত্যই যাঁরা বড় ছিলেন তাঁদের সম্ভ্রম এক রকম করে বজায় করে আসছি। এখন সদ্‌ উদ্দেশ্যেই না হয় হল,—এই যে আপনাকে ভেঙ্গে গড়তে যাব, এই চেষ্টায় সম্ভ্রমটাকে যদি খুইয়ে বসে, তারপর পরিবর্ত্তে কিছু না পাই তখন দশা কি হবে? সে যে 'ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ' অবস্থা।

আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধি-বেণিয়া আছে তার ব্যবসাবৃত্তিকে সন্ধানের যুগ কিছুতেই আপন বসে আনতে পার্ব্বে না। তার দাম-চোকাচুকির যে সংস্কার, সে কেবলই আপনার হিসাবের খাতা খুলছে—নূতন প্রেরণা ওখানে একটা কিছু ভজিয়ে দিতে পারে, এতটা প্রস্তুত বোধ হয় হয়ে ওঠেনি, গণ্ডগোল তাই চলেইছে।

সে বলে বেণের কাজ নয় গড়া। বেণে ত চোরের জাত আসলটাকে ডুবিয়ে দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার নকল একটা চালবাজি বলে কি খাড়া করে। যখন গড়তে হবে তখন খাঁটি জিনিষ চাই, ও চালাকির বেণে-গিরি এখন শিকেয় তোলা থাক।

বুদ্ধির বেণেও দাঁত খিঁচিয়ে হাঁ হাঁ করে চিৎকার কর্চ্চে ব্যাপার ত এই, এমনি ধাঁরা মাথা ঠোকা ঠুকি।

এমনিধারা যখন চলেচে, পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়া আপন দেশে সব লণ্ডভণ্ড করে ভারতের ওপর দিয়ে হুহু করে বয়ে গেল।

সেখানে সন্ধানীর দল জিতেছিল। বেনেকে হটিয়ে দিয়ে নববলোদৃপ্ত জিজ্ঞাসা-বিজ্ঞানের মহাস্ত্র এমন নির্ঘাত হানছিল যে বিশ্বাসের প্রাচীর সেখানে টলে গিয়েছিল। Faith বলতে সেখানে আর কিছু ছিল না, সকল মানুষই আপনার পায়ে দাঁড়িয়ে সন্ধানের জয়ধ্বনি সেখানে তুলেছিল, তাদের হৃদয়মন্দির আলোকিত করে তখন জলে উঠেছে Knowledgeএর প্রাচীন আবর্জ্জনাদাহী শিখা। এ সেই 'নিষিদ্ধ-বৃক্ষের' ফল নয়, সে জ্ঞান নয় বরং যাজক-প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্মের শোচনীয় ব্যর্থতাই এ জ্ঞানের উদ্ভবের কারণ।

বিশ্বাস জিনিষটা অন্ধ। এর রাজত্ব যখন চলে তখন আর ঐ যে ভাববার চিন্তাবার দেখবার প্রয়োজন তা থাকে না। সুতরাং যার ওপর

বিশ্বাস তার মধ্যে বিশ্বাস পদার্থের অতীত বস্তুর রাজত্বের প্রয়োজন হয়। মানুষ পিছিয়ে পড়ায় সে জিনিষটা তখন আর তার মধ্যে ছিল না। বিশ্বাসের রাজত্বের পরিণামও ভাল হয় নি। যিশু সত্যই মানবের ত্রাণের জন্য এসেছিলেন—শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যেতে লাগল, যারা আপনারই ত্রাণের জন্য এসেছে তারা আর তাঁর নামের মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে কত ত্রাণ কর্ত্তে পারে? শীঘ্রই আচার্য্যদের মধ্যে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' ভাবটা প্রবল হয়ে হয়ে অপ্রতিভ আতিশয্যে ফেটে পড়ে অত্যাচারে রূপান্তরিত হল। লোকে তাঁদের বিশ্বাস কর্চ্চে সুতরাং ওখানে ইচ্ছা-পূর্ব্বকই অন্ধ, তাদের আর অজ্ঞানে কুসংস্কারে মোড়াই করে দেওয়া কঠিন কি? কালে কালে এমনি হল—যিনি ত্রাণ কর্ত্তে এলেন এসে জীবন দিয়ে গেলেন, তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন বন্ধনের উপলক্ষ।

সন্ধানের যুগে মানুষের যাই চেতনা ফুটল তারা শিউরে উঠলে। কি সর্ব্বনাশ! যেটা সবচেয়ে ভাল তারই নিমিত্ত এই সবচেয়ে মন্দ এসে দাঁড়িয়েচে। এমন করে পচিয়ে তোলবার শক্তি মানুষে আছে?—না মানুষ-জানোয়ারের ওপর আর বিশ্বাস নয়! দেখ মানুষ ছাড়া আর কে আছে আমাদের ত্রাণ কর্ত্তে পারে? এই যে জীবনব্যাপী ভয়-দুঃখ-হিংসা ব্যাধি এ সবের হাত হতে জগতে রক্ষা কর্ত্তে পারে? কার ওপর নির্ভর করা যায়?

সন্ধানী তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল তার চক্ষের সম্মুখে যতখানি আছে সব। তাদের দৃঢ় সবল মাংসপেশী অদম্য সাহস দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা,—প্রাণেও ব্যাঘ্রবৎ জ্বালা! প্রকৃতিকে একেবারে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কুটে তারা তার অণু অণু পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে লাগল। দেখতে দেখতে বিশাল সাহসে একদিন গর্জ্জন করে তারা বলে উঠল—পেয়েছি পেয়েছি! এই যে এতবড় প্রকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এরে ধরে রেখেচে—চালাচ্ছে, এই দেখ কতগুলি অমোঘ নিয়ম। এর ত নড়চড় নেই যুগ যুগান্তর ধরে—কবে থেকে কেউ জানে না—অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে আপন মনে আপন কাজ করে আসচে। জগৎ ত ওরই ওপর নির্ভর করে রয়েচে। আমরা তবে কারে মানছিলুম এতদিন?

যাজকের ক্ষমতার অভ্রভেদী প্রাসাদ সেই অট্টহাস্যের মহা ঝটিকার অভ্যুত্থানের ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়ে গেল। চাপা পড়ে গেল ঈশ্বরের বিচারাসন। মানুষ উপহাস করে উড়িয়ে দিলে স্বর্গ নরকের সত্যতা।

কিসের পরিত্রাণ? স্বর্গ নরক এ সকলের কল্পনার মূলে যদি কোনও উদ্দেশ্য থাকে তবে সে কোন্ উদ্দেশ্য? কোন জিনিষটা ঈশ্বর কল্পনার উদ্দীপক? অতীত যুগে ভারতেও যেমন চার্ব্বকবাদ প্রচার প্রয়োজন হয়েছিল তেমনি ভগবানের কোনও গূঢ় অভিপ্রায়ে বিশ্বাস স্থাপিত ধর্ম্মকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে নাস্তিকতার প্রবল বন্যাস্নাত পাশ্চাত্যে মানুষ বেপরোয়া প্রকৃতির বাহ্য জড় অংশটাকে অবলম্বন করে জীবন ও জগতের তাৎপর্য্য বুঝতে লাগলো। অধর্ম্মের রাজত্ব এলো এ কথা যে বলতে পারে বলুক, তবে, ধর্ম্মের রাজত্ব শেষ হলো তা আমি বলচি।

সন্ধানী সন্ধান করে স্থির সিদ্ধান্তে এলো—উন্নতি আর সুখ, এর বড় স্বর্গ নেই। আপনার অজ্ঞান নাশ, আত্মশক্তির স্ফুরণ, প্রতিষ্ঠা—এর বড় আর পরিত্রাণ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে সরল অন্তঃকরণে সকলে সকলের জন্য ঐ সকলের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম (Sacrifice)—এর বড় আর ভগবান নেই।

তখন তার দলে আদর্শ তৈয়ারী হয়ে গেল—প্রচুরতমের প্রভূততম সুখসাধন (greatest good of the greatest number)।

কিসে তা হয় কেমন করে তা হয় সন্ধানীরা এই নিয়ে লেগে পড়ল। এখনও তাই লেগে আছে।

বিজ্ঞানের এক একটা আবিষ্কার আবার সেই আবিষ্কারকে কলকব্জার মধ্যে জুড়ে দিয়ে শিল্পী আপনার প্রতিভাপ্রকাশ, বণিকমণ্ডলীর সেই সব শিল্পপ্রণালীকে সুবিহিত ভাবে কর্ম্মতৎপরতায় বিন্যাস (Organisation), আত্ম পুষ্টির জন্য বল প্রয়োগার্থ পরস্পরকে একত্রিত রাখবার নিয়ন্ত্রিত কর্ব্বার উপায় (Political life)—এই সমস্ত পাশ্চাত্যের জীবন মন্ত্র হতে লাগ্‌ল।

ঐ যে ইয়োরোপের শিল্পবাণিজ্য রাজনীতি যুদ্ধ কূটনৈতিক চাল সমস্তই প্রচুরতমের প্রভূততম সুখ সাধন! কিসে সুখ তারই সন্ধান।

চেষ্টারই কেবল ব্যর্থ আত্মপ্রকাশ। ঐ দেখ উপকরণরাশি পুঞ্জীভূত গগনপ্রমাণ উচ্চতায় সকলকে ছাপিয়ে উঠল। ঐ দেখ কিসে সুখ এখনও সন্ধানী স্থির সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে অপারগ, ঐ দেখ সন্ধান ক্রমেই সমগ্র হয়ে জগৎটাকে বিকট কোলাহলে পরিপূর্ণ করে তুল্‌লে!

সে যাই হোক ঐ আপন দেশ লণ্ড ভণ্ড করা পশ্চিমের হাওয়া আচমকা ভারতের বুকে এসে লেগে এই সুপ্ত অচলায়তনের রুদ্ধদ্বার গবাক্ষমালাকে ঠেলে দিয়ে ঝনৎকার ধ্বনি মন্দ তোলেনি।

এখানকার সন্ধানীর দলও বেণেকে কড়া কড়া গালাগাল সুরু করে দিলে। বেণেও এখানে মুখে কম যায় না, সেও উত্তর বেশ গুছিয়ে দিতে লাগল। মেয়েরা যেমন সপ্তম পর্য্যন্ত গলা তুলে ঝগড়াঝাঁটি করে অবশেষ কেউ আর কাকেও যখন আঁটতে পারে না কান্না জোড়ে, তেমনী ছিঁচ-কাঁদুনীতে দেশ ভরে গেল।

সন্ধানীরা কেঁদে মরে—এ দেশ পূতিগন্ধময় ছিন্ন মাংসখণ্ডের মত কীটাণুকীটের বাসা, এখানে দাসেরা বাস করে—হিংসায় এর পবন উত্তপ্ত হয়ে রয়েচে! ভগবান তোমার মহাসমুদ্রে কি জল নাই! প্রভু, এ দেশ ডুবে যাক ভেসে যাক। আবার নূতন বালি পড়ে নূতন জাত না জন্মালে উদ্ধার নেই।

বিশ্বাসের ব্যাপারী কাঁদে—সব উৎসন্নে গেল। ঘাড়ে যখন দুর্ব্বুদ্ধি চেপেছে ওরা ত মর্ব্বেই—শীঘ্র মরুক। হায় হায় ধোপা বন্ধ কর্লুম নাপিত বন্ধ কর্লুম আড়াল হতে পৃষ্ঠদংশকের কাজ করে যথাসাধ্য দুর্ণাম ছড়ালুম ওদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগুলোকে পর্যন্ত গালিগালাজ কর্লুম তবুও যে রে 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।'

পাশ্চাত্যের অশংসয় প্রমাণ যে ও ধর্ম্মওয়ালাদের পুঁথিপাঠ্য সব ভূয়া। তারই আবৃত্তি করে এখানকার সন্ধানীরা জেহাদ ঘোষণা করে দিলেন। কিন্তু ঐ যে রবিবাবু বলেচেন—

দেশটা হচ্চে গরম বিছানাটাও নরম
প্রেয়সীর সেই হাসিটুকু তাও হচ্চে চরম।

কাজেই ওই রকম একটার তাড়াতে সন্ধানীরা জেহাদ তুলেই বসে

রইলেন। বিশ্বাসের দুর্জ্জয় দুর্গ যে জ্ঞানের অগ্নিবান চালিয়ে পুড়োতে হবে, প্রাচীন আবর্জ্জনারাশি যে তপঃপূত শক্তিগঙ্গাপ্রবাহ নামিয়ে এনে ধুয়ে বার করে নিয়ে যেতে হবে, তার জন্ত আর বার হওয়া হল না। পশ্চিমের আচমকা হাওয়া অচলায়তনের জানালা দরজা আছড়ে শিকল ছিটকিনি নাড়িয়ে দিনকতক আচ্ছা রকমের ঝনৎকার বাধালে মাত্র, ধর্ম্মের নবযুগ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের যুগ বলে পরিচিত হল, বাঁশপাতার আগুন দপ্‌ করে জলে থপ্‌ করে নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হুজুগেরও সোয়াস্তি।

কিন্তু এই গ্লানি জর্জ্জরিত হিন্দুত্বের বক্ষ কোটরে এখনও যে আছে—আছে সেই মহানপ্রাণ, যা মানবত্বের শৈশবে সভ্যতার সত্যযুগের দোলাখানি দুলিয়েছিল। অজ্ঞান কুসংস্কার বিকৃতার্থ সম্ভূত কদাচারের গলৎকুষ্ঠগ্রস্ত আপনার আশ্রয়রূপ দেহটার ব্যাধি সারাতে সেও একবার সময় মত আপনার জীবনী শক্তি প্রয়োগ কর্লে সেও একবার আপনার অমোঘ সত্যবাণী আপনার অমৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে এই যুগধর্ম্মের নিঃশ্বাস ছাড়লে।

—বাহিরের ঝড় ঝাপ্টা যা পারেনি, ভেতরের কি একটা অদ্ভুত শক্তি হঠাৎ আপনি তাই করে দিয়েছে! সন্ধানী বিশ্বাসী সবাই কি একটা অনুভব করে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে! ভেতর থেকেই এক একটা জানালা খুলে গিয়ে বাহিরের আলো অচলায়তনের ঘরের মধ্যে প্রবেশ কচ্ছে। এই শক্তিই নবযুগের যুগধর্ম্ম—নূতনের প্রকাশ।

এরই অগ্রদূত কে এলেন?—রামকৃষ্ণ।

কি আশ্চর্য্য! এলেন একেবারে অধঃপতিত জাতির সর্ব্বাপেক্ষা পচ্যমান আবর্জ্জনা কুণ্ড হতে। এলেন গোঁড়া পূজারী বামণের ঘরে যাদের কুসংস্কার যাদের অজ্ঞানের দম্ভ এত নিদারুণ নির্ম্মম নির্লজ্জ যে তার তুলনা নেই। আরও আশ্চর্য্য তাঁর মিশন স্থাপয়িতা হলেন—নরেন্দ্রনাথ। জন্মেছেন সমাজ অচলায়তন ঘরের কায়স্থবংশে। ব্রাহ্মণ রামমোহনকে বাঁধা দিয়েছিলেন—রাধাকান্ত, ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্রকে বাধা দিয়েছিলেন—কালীপ্রসন্ন। এবার নরেন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রগামী পতাকা-ধারী সৈনিক হলেন, সাজলেন বিবেকানন্দ মূর্ত্তিতে। ভারতের নিজস্ব

সত্য মহামানবের বিবেক বাণী এই গলৎকুষ্ঠগ্রস্ত দেহে প্রাণরূপে অচলায়তন যা ধরে ছিল সেই বহু বহু শতাব্দীর প্রচ্ছন্ন নিগূঢ়তত্ত্ব তিনি বীর কণ্ঠে বিশ্বের সম্মুখে ঘোষণা কর্লেন।

বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে শুনল সেই বজ্রদৃঢ় কণ্ঠের অবিচল অভয় বাণী—পৃথিবী যতদূর সন্ধান করে এগিয়েছে সে সত্য কিন্তু চরম সত্যের জন্য আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। 'প্রভূততমের প্রচুরতম সুখ সাধন' ঠিকই আদর্শ। সত্যই ঈশ্বর স্বর্গ নরক সবই এই প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার উপাদান, তোমরা যা আবিষ্কার কচ্ছ তাও উপাদান বটে কিন্তু তোমাদের আবিষ্কার একদেশদর্শী। কিসে সুখ তা জানা চাই সত্য, তবে কোথায় সুখ তা না জানলে এ সব উপাদান সঞ্চয় কার জন্য? কিসে সুখ তাও জান কিন্তু আরো ভাল করে জান কিসের সুখ। সুখের উপাদান সঞ্চয় কর্লে কি হবে, যে সুখের বোদ্ধা তারে জেনেছ কি? আমাদের ভারতবর্ষ তারই আবিষ্কার করেছে। আমরাও তাই তোমাদের দিতে পারি। তোমাদের সভ্যতাকে সম্পূর্ণ কর্ত্তে হলে আমাদের সঙ্গে তোমাদের যোগ চাই। আমাদের আবিষ্কারও তোমাদের নিতে হবে। এই বোদ্ধাকে জানতে হবে। তিনি আত্মা। আত্মানং বিদ্ধি।

"স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্য্যন্তও অসম্ভব।"

"যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেইদিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ।"—বিবেকানন্দ।

আলো।

(শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী)

জীবনের অন্ধকারপূর্ণ এই পথে
দাঁড়াইলে দেব! তুমি আলোক ধরিয়া
হেরিয়া তোমার জ্যোতিপূর্ণ মুখখানি
আমার হৃদয় আজি উঠিল ভরিয়া।
চকিতে সরিয়া গেল ঘোর অন্ধকার
আলোক—আলোক শুধু দেখি নিরখিয়ে
বহুদূরে গিয়াছে যে আঁধার সরিয়া
পারিবে না আর মোরে ফেলিতে সে ছেয়ে।
হে গুরো! হৃদয় মম ভগ্ন অবসাদে
নিরাশার মাঝে আমি নিজেরে ভাসায়ে
দিয়াছিনু; জানি নাই কি হইবে শেষে
ভেবেছিনু একা আমি রয়েছি দাঁড়ায়ে।
আশা দিলে, উঠাইলে হাত ধ'রে মোরে
জানাইলে কেন আমি নত হয়ে রই,
হীন ভেবে আপনারে কেন বা মলিন
সংসারের সুখ দুঃখ শিরোপরে বই?
হে গুরো! জীবন তুমি করেছো উজল
নিজেরে বিকাশ তুমি ক'রগো হেথায়
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা তব করিবার তরে
আমার এ প্রাণ প্রভু! ভিক্ষা সদা চায়।
তুমি রাজা—অনুমতি দাও যদি তবে,
প্রজার বাসনা ওগো, হইবে সফল
তোমার জিনিষ যার রাখ অধিকারে
করে রাখ তারে তুমি পবিত্র বিমল।

সাধু সঙ্গ

(দুলাল)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৫)

এইরূপ আলোচনায় ৫।৭ দিন পরে এটর্ণি শ্রীযুক্ত প্রাণধন ঘোষ মহাশয় স্বামী সত্যব্রতের সঙ্গে দেখা ক'রে বল্‌লেন, "আপনি কি মধ্য প্রদেশে দরিদ্র ও পীড়িতদের জন্য আতুরাশ্রম স্থাপন করেছেন ? এখানকার বাসন্তী নামে এক বারবিলাসিনী লক্ষাধিক টাকা মূল্যের তার সমুদয় সম্পত্তি আপনার সেই শুভ কার্য্যে দান করেছে। এই তার দান-পত্র।"

স্বামিজী দান-পত্র হাতে নিয়ে বল্‌লেন, "হাঁ, আমি আশ্রম স্থাপন করেছি আর তার জন্য অর্থেরও যথেষ্ট প্রয়োজন, শ্রীভগবান ঠিক সময়েই তাঁর কাজের ভার নিজেই নিয়েছেন। আচ্ছা সেই মেয়েটি এখন কোথায় বলতে পারেন ?"

এটর্ণি বাবু বল্‌লেন, "তার বাড়ী ঘর অলঙ্কার সব বিক্রি ক'রে টাকা আমার হাতে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। লোকে বলে আপনার কথায় তার বৈরাগ্য হয়েছে বৃন্দাবন কিম্বা কাশী এমন কোন স্থানে মাধুকরী করে খেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে তার ইচ্ছা। টাকা ব্যাঙ্কে আছে আর এই রসিদ দেখালেই আপনাকে দেবে। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে এখন আসি।" এই বলে প্রণাম করে তিনি চলে গেলেন। স্বামিজী দান-পত্র হাতে নিয়ে কিয়ৎক্ষণ বসে রইলেন। পাষাণ ফাটিয়া বিন্দু বিন্দু জল ঝরতে লাগ্‌ল।

(৬)

সীতানগর মধ্যপ্রদেশে একটি গণ্ডগ্রাম। গ্রাম খানির লোক সংখ্যা যদিও বেশী কিন্তু তাহারা অধিকাংশই দরিদ্র ও অশিক্ষিত।

গ্রামের অধিবাসিগণ যদিও রূপ, শোভা সম্পদহীন কদাকার কিন্তু প্রকৃতি দেবী গ্রাম খানিকে অতি যত্নে সাজিয়েছেন। ছোট ছোট পাহাড়গুলি হাত ধরাধরি করে তার তিন দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আর এক দিকে একটি স্বচ্ছ ক্ষীণসলীলা তটিনী দিনরাত এক অনাদি সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শুনিয়ে নেচে ব'য়ে যাচ্ছে। নদীর পরপারে সুদূর বিস্তৃত পলাশ ও শালবন, তাতে হরিণ, ময়ূরের দল নেচে বেড়ায়, প্রাতে সন্ধ্যায় তারা নদীতে জল পান কর্‌তে আসে আর বড় বড় ভীত-চকিত-চোখ তুলে অবাক হ'য়ে গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে একটা আধটা বাঘের ডাকও শুনা যায় তবে তা কদাচিৎ। শীতকালে যখন শাল ও পলাশ বনে ফুলের আগুন জ'লে ওঠে তখন বনের যা শোভা হয় তা শুধু দেখবার, মজবার জিনিষ, বর্ণনা কর্ত্তে যাওয়া ধৃষ্টতা ও অসাধ্য।

গ্রামের শেষে, নদী ও পাহাড়ের মাঝে স্বামীজি আশ্রম স্থাপন ক'রেছেন। আশ্রমটি বহুদূর বিস্তৃত ও নানা ভাগে বিভক্ত। ঠিক্ মাঝ খানে নদীর ধারে মন্দির। মন্দিরের অধিষ্ঠাতা সদাশীব চা'র হাতে জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ও সেবা আশ্রমবাসী ও জগৎবাসীকে বিতরণ কচ্ছেন।

মন্দিরের খুঁব নিকটেই সাধু ও সেবকদের থাকবার মঠ। মঠের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় একশত। তাঁহারা অধিকাংশই যুবক, শিক্ষিত ও সৌম্যদর্শন। তার কিছু দূরেই অনাথ বালকবালিকাদের থাকবার আবাস। ও তাহাদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়। মন্দিরের অন্য দিকে গ্রামের ও অনাথ বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি বিরাট কর্ম্মশালা, তাতে তাঁত, চরখা, ছুতারের কাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্ম্মশালার পরেই পুস্তকালয় তাহা ধর্ম্ম, দর্শন শিল্প, ইতিহাস, ভূগোল ও শিশুদের শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাবলীতে পরিপূর্ণ। ৭।৮ খানা সাময়িক পত্রও নিয়মিত সেখানে এসে থাকে। পুস্তকালয়ের পর সুদূর বিস্তৃত আতুরাশ্রম। সেখানে প্রায় তিন শত দরিদ্র আতুর নারায়ণ জ্ঞানে সেবা পেয়ে থাকে। পাহাড়ের ধারে কুষ্ঠাশ্রম,

তাদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা বন্দোবস্ত, তাদের পাঠের ও শিক্ষার জন্য পৃথক অপেক্ষাকৃত ছোট পাঠাগার ও শিল্পাগার আছে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি ছোঁয়াচে ব্যাধির জন্যও পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে। এই বিরাট ব্যাপার স্বামী সত্যব্রত স্থাপন করেছেন ও নিজ পরিশ্রমে সুচারু রূপে চালাচ্ছেন। সেথানে যেন জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম মূর্ত্ত রয়েছে। সত্য শিবসুন্দরের এই অপূর্ব্ব উপাসনা-স্থান একটা দেখবার ও শেখবার জিনিষ।

এক দিন যখন গোধূলির রক্তিমরাগে আশ্রম রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছিল, গৃহছাড়া পাখী হাওয়ার সাগর বেয়ে নীড়ের দিকে ছুটে আস্‌ছিল স্বামী সত্যব্রত নদীর ধারে আপন মনে-ভ্রমণ কর্‌ছিলেন আর পরপারের আলো আঁধারের খেলা দেখ্‌ছিলেন এমন সময়ে মুণ্ডিত মস্তক, সুন্দর দর্শন, গৈরিকধারী একটি নবীন কিশোর সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রণাম কর্‌লেন। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা থেকে আসা হচ্ছে?" "আপাততঃ কাশী থেকে।" "আপনার কি আশ্রম দর্শনের অভিলাষ?" নবাগত উত্তর করিলেন—"যদি দয়া ক'রে এখানে স্থান দেন তবে জীবনের অবশিষ্টকাল সেবাকার্য্যে কাটাবার জন্য ইচ্ছা আছে।"

স্বামিজী সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন।

কিশোর সন্ন্যাসী করুণাময়ের অপূর্ব্ব চরিত্র মাধুর্য্যে আজ আশ্রমবাসী সকলেই মুগ্ধ। তাঁর প্রাণপণ সেবানিষ্ঠা, নিরভিমানতা, নিঃসঙ্গভাব সকলকেই আকৃষ্ট ক'রেছে। তিনি নিঃশব্দে নতমুখে দিনরাত রোগীর শিওরে বসে থাকেন, আহার বিশ্রাম নাম মাত্র, রোগীরাও যেন তাঁর কাছে অন্য রকম হ'য়ে যায়। তিনি যখন তাঁর কোমল সুচারু অঙ্গুলীগুলি পীড়িতদের মাথায় সঞ্চালন করেন তখন তারা অসুখের কথা ভুলে যায়, শিশু যেমন মায়ের স্নেহের গানে ঘুমিয়ে পড়ে তারাও তেমনি সেই মমতামাখা সর্ব্বত্যাগীর কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়ে। এখানকার সাধু সেবকরা অক্লান্ত ভাবে, তাদের ইষ্টজ্ঞানে আতুরের সেবা করে। কিন্তু এ বালক যেন তার প্রাণের রস নিঙড়ে নিঙড়ে সব অশান্তের গায়ে মাখিয়ে দেয় আর সবাই স্থির হয়ে যায়।

সেবার ছোটনাগপুরে দুর্ভিক্ষ রাক্ষস ঘোর রবে তাণ্ডব নর্ত্তন জুড়ে দিলে, স্বামিজী আশ্রম থেকে ১০।১২ জন সহচর নিয়ে তাকে শান্ত করবার জন্য ছুটে গেলেন। তিন মাস অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনিয়মিত আহারের পুরস্কার স্বরূপ টাইফয়েড সঙ্গে নিয়ে তিনি আশ্রমে ফিরলেন। পথেই তিনি চেতনা হারিয়েছিলেন, করুণাময় মূর্ত্তিমতী করুণার মত তাঁর সেবার ভার নিলেন। সেরূপ বিনিদ্র অক্লান্ত সেবা সাধুরাও কখনও দেখে নাই। একবার মানবীর সঙ্গে মৃত্যুর যুদ্ধ হয়েছিল সেবার মরণ পরাজয় স্বীকার করে, এবার বুঝি মানব তার গায়ে পরাজয়ের কালিমা মাখিয়ে দিলে।

স্বামিজী তখনও সম্পূর্ণ বল পান নাই। বৈকালে আশ্রমের বারান্দায় ব'সে উদাস নয়নে নদীর দিকে চেয়ে ছিলেন এমন সময়ে একটি সাঁওতাল রমণী একটী শিশুকে কোলে ক'রে নিয়ে এসে তাঁর সামনে বসে পড়্লো। মেয়েটী প্রথমে কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না শুধু কাঁদ্‌তে লাগল। স্বামিজী তাঁকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করে জানলেন যে সে অতিশয় দরিদ্রা তার সম্বলের মধ্যে পঙ্গু স্বামী ও এই শিশু। বহুকষ্ট ক'রে সে এই দুটি অশক্তকে পালন করে। আজ ছ' দিন হলো এই দুজনেরই বসন্ত হয়েছে। গ্রামের লোকের কাছে সে সাহায্য চেয়েছে তারা সাহায্যতো বিন্দুমাত্র করেই নি তার উপর এ অবস্থায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। সে যে কোন উপায়ে হোক তার স্বামীর সেবা করবে কিন্তু তার প্রাণের পুত্তলিকে আর কোন রকমেই দারিদ্র্যের মধ্যে, অচিকিৎসার মধ্যে রাখতে পার্চ্ছে না, ইহার একটা উপায় তাঁকে করতেই হবে। স্বামিজী এই মর্ম্মভেদী কাহিনী শুনে আকুল নয়নে সকলের দিকে চাইলেন। অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে করুণাময়ও সেখানে ছিল, সে ধীরে ধীরে এসে শিশুকে বুকে তুলে নিলে ও করজোড়ে বল্লে, "প্রভু যদি অনুমতি করেন ও যোগ্য বিবেচনা করেন তাহলে এই শিশুর সেবা আমি করবো।" স্বামিজীর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো তিনি বল্লেন—"আর তোমার কোন ভয় নাই, আজ যেন জগজ্জননী তোমার সন্তানকে আশ্রয় দিয়েছেন যমের সাধ্য কি তাকে মারে? এই ২০৲ টাকা নিয়ে যাও প্রাণপণে স্বামীর সেবা

করগে, আশ্রম থেকে চিকিৎসক প্রতিদিন যাবে, প্রয়োজন হয় আরও টাকা নিয়ে যাবে তারপর সবই ভগবানের ইচ্ছা।" বন্য-রমণী কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলে না তার নয়ন দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগ্‌ল। অতুলনীয় সেবাধর্ম্মের আদর্শ দেখিয়ে, যমের হাত থেকে শিশুকে কেড়ে নিয়ে যখন তিনি তাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন, তখন সবাই মনে ভাবলে যে—এ মানুষ—না দেবতা—না আর কিছু! সেদিন রাত্রে সকলে প্রসাদ ধারণ কর্ত্তে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লে যে করুণাময় উপস্থিত নেই। প্রসাদ ধারণ ক'রে করুণাময়ের কক্ষে গিয়া স্বামিজী দেখ্‌লেন যে একখানা মোটা কম্বল গায়ে দিয়ে তিনি জ্বরে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছেন। স্বামিজী এসে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"করুণা, কখন জ্বর এলো?" কোন উত্তর না পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখ্‌লেন উত্তাপ খুব বেশী, তিনি আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলুতে লাগ্‌লেন, তার যেন সমস্ত যন্ত্রনার অবসান হ'য়ে গেল, সে যেন ঘুমিয়ে পড়ল। স্বামিজী কক্ষ হতে বেরিয়ে একজন সেবককে তার শুশ্রূষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সেবক এলে করুণাময় বললে "আমার কোন দরকার নাই, বেশ আছি, তুমি বিশ্রাম করগে, দরকার হলে ডাকবো।" সেবক অনেক ক'রে বল্‌লে, কিন্তু কিছুতেই তাকে রাজি কর্‌তে না পেরে পাশের ঘরে শয়ন করতে গেল।

খুব ভোরে স্বামিজী করুণাময়ের খবর নিতে এসে দেখলেন যে শয্যায় কেউ নাই। কোন প্রয়োজনে গেছেন মনে করে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর্‌লেন কিন্তু তখনও সে ফির্‌লে না। তিনি সেবককে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, সেবক যা জান্‌ত তা বললো। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল কিন্তু করুণাময় ফিরল না। স্বামিজী সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করে খুজ্‌লেন, গ্রাম গ্রামান্তরে লোক পাঠালেন দিন রাত শেষ হয়ে গেল কিন্তু কেউ তা'র সন্ধান বল্‌তে পার্‌লে না। হতাশ হ'য়ে সকলে ফিরে এলো। স্বামিজী কিছু বল্‌লেন না কেবল ঝরিবার পূর্ব্বের জলভরা মেঘের মত গম্ভীর হয়ে রইলেন।

তিন দিন পরে একজন সাঁওতাল কাঠুরে এসে বল্লে যে এখান থেকে

দেড়ক্রোশ দূরে বনগাঁর জঙ্গলে পাহাড়ের ঝরণার ধারে একজন গেরুয়া পরা সাধুকে পড়ে থাকতে দেখেছে। স্বামিজী সেই কথা শুনে সদল বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে তথায় গিয়ে দেখ্‌লেন প্রাণপাখী চিদাকাশের অনন্ত নিলীমার কোলে কোথায় উধাও হয়ে মিশে গেছে। বসন্তে তার সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেছে সে আগে থেকেই তা জানতে পেরেছিল পাছে তার সেবা করতে গিয়ে আশ্রমের কারু অনিষ্ট হয় তাই পালিয়ে এসে এই ঝরণার ধারে দেহ পরিত্যাগ করেছে।

স্বামিজী বল্‌লেন—"এই পবিত্র দেহ আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সেই পূণ্য ভূমিতে ইহাঁর পরিণতি কর্‌তে হবে।"

সেবকেরা দেহ নেবার জন্য তুল্‌তে গিয়ে বিস্ময়ে অবিভূত হ'য়ে বল্লে,—"মহারাজ, এযে নারী।" স্বামিজী বল্‌লেন—"হোক নারী, তবু একে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেব মন্দির এখনও অসম্পূর্ণ মহেশের পাশে শবাসনার আসনের জন্য আমি এরূপ পবিত্র দেহই খুঁজছিলেম, এর সমাধির উপরেই উমার মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে আজ আমাদের অন্তরের দেবতা পূজা সম্পূর্ণ করবো।"

সমালোচনা।

(১)

(ক) **নারীর কথা**—(শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৮।) লেখিকার আক্ষেপ যে, অতি আদিম কাল থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগ পর্য্যন্ত সকল মহাপুরুষই নারী জাতির প্রতি অতি অবিচার করে এসেছেন, তাদের পুরুষদের সহিত সমকক্ষ এবং সমাসন না দিয়ে ভোগের উপকরণ স্বরূপ সমাজ বক্ষে স্থান দিয়েছেন, এমন কি নিজেদের জননী, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী, কন্যাকে পর্য্যন্ত পিশাচী স্বৈরিণী বলতে কুণ্ঠিত হন নি। নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য লেখিকা রামপ্রসাদ রচিত একটি গানের কিয়দংশ উদ্ধার করেছেন,—

"রমণীর মুখে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী ;
ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি।"

যদিও তিনি গানের রচয়িতাকে "খুব শ্রদ্ধা" করেন কিন্তু ভগবানের নিকট রামপ্রসাদ প্রমুখ ভক্ত বন্ধুগণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা করেছেন। এক্ষণে দেবীর নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে কোনও "ভক্তিভাজন আত্মীয়ের মুখে," "শ্লেষের সুরে" উক্ত গানের কিয়দংশ শুনে বিবেকবুদ্ধি পরিত্যাগ করে সমগ্র মহাপুরুষ-কুলকে কলঙ্কিত করে নারী-জাতীর মহত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কি সফল হবে? ভালমন্দ সব জাতিতেই আছে—তা কি নারী, কি নর। আমরা সাধারণত ভাল গ্রহণ করি এবং মন্দটা ত্যাগ করি। সেইরূপ শাস্ত্র ও মহাপুরুষেরা বিদ্যা স্ত্রীর স্তুতি এবং অবিদ্যা স্ত্রীর নিন্দাই কীর্ত্তন করেছেন। "নারীত্বের মহিমা" এবং অমহিমা উভয়ই "শাস্ত্র বুঝতেন"; তাই "নারীদের পূজা করিলে দেবতা সন্তুষ্ট হন" একথাও যেমন বলেছেন আবার "বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনে নারীর থাকিতে হইবে—কদাচ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিৎ নহে" একথাও আবার তেমনি বলেছেন। ভারত এবং ভারতীয় শাস্ত্র যেমন নারীর দেবীত্ব এবং মাতৃত্বের উপলব্ধি করেছেন এমন বোধ হয় আর কোনও দেশ বা শাস্ত্র করে নি এবং পুরাকালে স্ত্রী জাতির প্রতি তথা-কথিত অবিচার এবং অবরোধ সত্ত্বেও ভারতীয় নারী যেরূপ দেবীত্ব ও মাতৃত্বের বিকাশ দিয়েছেন এরূপ আধুনিক অতিবাদী বিদুষীদের মধ্যেও দেখা যায় না কেন? এত স্বাধীনতা, এত বিদ্যার অবাধ চর্চ্চা সত্ত্বেও আধুনিক জগতে ত সতী, গৌরী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি পতিপ্রেমের আদর্শমণি সকল, ঋষি কন্যা বাক্‌, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীগণ, বিপুল সাম্রাজ্য পরিচালনকারিণী মদলসা, লীলা, চূড়লা প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞা, স্বামী শিক্ষয়ত্রী সম্রাজ্ঞীগণ, এবং এই সভ্যযুগের কিছু পূর্ব্বেও সঙ্ঘমিত্রা, উভয়ভারতী, লীলাবতী, ক্ষমা, বেহুলা, পদ্মিনী, মিরাবাঈ প্রভৃতি নারী-জাতির অপূর্ব্ব রত্ন সকল ত রাস্তা ঘাটে পড়ে নেই। এত আদর্শ এঁকেও হে ভারতীয় সভ্যতার

স্তম্ভ স্বরূপ অতীত ঋষিগণ! তোমরা নারী ঘৃণাপরায়ণ এ কলঙ্ক তোমাদের মুছবে না। তোমরা যেমন নারীর পতিপ্রেমে সতীত্ব, সন্তান পালনে মাতৃত্ব, চিত্তানুশীলনে দেবীত্ব দেখিয়ে তাঁদের পূজার্হ করেছ, তেমনি আবার তার হীনত্ব দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করেছ, এই তোমাদের অপরাধ। আবার সতী অসতীর মধ্যে, লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর মধ্যে সেই এক পরমা শক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করে যে স্তুতি করেছ হে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অতীত এবং বর্ত্তমানের ঋষিগণ! তোমাদের এ মনভাব বৃথা তর্ককারীরা কখনও বুঝবে না, তারা হীন, যথেচ্ছাচারীর দোষ নিজেদের এবং সকলের ওপর জোর করে চাপিয়ে বৃথা তর্কের অবতারণা করে নিজেদের বড় মহিমান্বিত মনে চিরকালই করবে।

আবার লেখিকার মত হচ্চে যে, শাস্ত্রে যায়গায় যায়গায় সতীমাহাত্ম্য যা দেখা যায় যার তেজে তপস্বীর তেজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, চন্দ্র সূর্য্যের গতি রুদ্ধ হয়েছে, ব্রহ্মা রুদ্রাদি ঈশ্বরগণের শক্তিও স্তব্ধ হয়েছে, যে সতীর পবিত্র প্রতীক গ্রহণে মানব মোক্ষ-মার্গাবলম্বী—এমন যে নারী মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়েছে সে কেবল "নরপূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন" "পতি-দেবতার সন্তুষ্টি সাধন"। লেখিকা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন যে সীতা সাবিত্রীর ভর্তৃ অনুগতত্ব প্রেমই তার হেতু দাসত্ব নয়, প্রেমের সর্ব্বজয়ীত্বই শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হয়েছে দাসত্বের নয়। এ কথা না বুঝে তিনি "রম্ভার" কথাকেই শ্রেষ্ঠ-রূপে গ্রহণ করে নারদের উপর কলঙ্কের আরোপ করেছেন, পবিত্র সনাতন ধর্ম্মকে অপবিত্র আখ্যা দিয়েছেন। একটি সত্যকে সর্ব্বদা লেখিকার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যতকাল বিদ্যা অবিদ্যা, সুখদুঃখ সম্বলীত সংসার বর্ত্তমান থাকিবে ততকাল রম্ভার ন্যায় স্ত্রী ও তদুপযোগী পুরুষেরও অভাব হইবে না এবং তৎপ্রণীত অসৎ কার্য্যের অভাবও ঘটবে না, তা সে যত বড়ই সভ্য শিক্ষিত সমাজ হ'ক না কেন। আবার সেই সভ্যতার অনুশীলন ফলে বিদ্যাকে অবলম্বন করে পবিত্র চিত্ত নর নারীর জগতে অভাব হবে না; যদিও শেষোক্তই আমাদের আদর্শ, তথাপি পূর্ব্বোক্তও জগতে চিরকাল থাকবে।

(শ্রী—)

(খ) "যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে, নন্দতে তত্র দেবতা।"

এই শ্লোকের দোহাই, লেখিকা দিয়াছেন। এই শ্লোকের মত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলাই প্রধান উদ্দেশ্য।

"রমণীর মুখে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।"

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের এই গানটির এক ছত্র শ্রবণ করিয়াই লেখিকা পুরাণ, মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া তুলসীদাস, কবির এবং বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক পরমহংস রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উপর অজস্র বাক্যবান বর্ষণ করিতে মোটেই সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। বাক্যবান বর্ষণ করিবার পূর্ব্বে লেখিকা যদি ভাবিয়া দেখিতেন কি অবস্থায় ঐ সব মতামত নারীজাতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা হইলে তিনি হঠাৎ কঠোর মতের ফোয়ারা এরূপ করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না। এরূপ সহজ ভাবপ্রবণতা বদহজমের লক্ষণ বলিয়াই বিশ্বাস।

আমরা কোন বিষয় পড়িবার বা চিন্তা করিবার পূর্ব্বেই যদি কোনও বিশেষ ভাবদ্বারা অকারণে বিচলিত হইয়া পড়ি—তাহা হইলে সেই সম্বন্ধে যতই চেষ্টা করি না কেন ধীর মস্তিষ্কে তাহার চালনা করিতে সক্ষম হই না,—সঠিক সমালোচনা করিতেও দ্বিধা বোধ করি। কোনও ব্যাপারেই চরমে উপস্থিত না হইয়া ধীর পন্থার অনুসরণ করিয়া ভাল মন্দ দুইদিক বিচার করিলেই আমরা অনর্থক ভ্রমে পতিত না হইয়া এবং হঠাৎ চঞ্চল চিত্ততার প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে ভাবের ঐক্য রাখিতে পারি এবং নির্ব্বিবাদে নিজ মতের (তাহা সার্ব্বজনীন হউক আর নাই হউক) পোষকতা করিতে পারি। বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী তিনিই যিনি সহজে পাঠককে আত্মভাব ধরিতে দেন না,—অথচ কথার প্যাঁচে নিজ মত সাধন করিয়া লয়েন। নিজের দুর্ব্বলতা সহজে ধরা পড়িলেই, পাঠক সমাজে ততটা প্রতিপত্তি জমাইয়া তোলা মুস্কিল হইয়া দাঁড়ায়—বিশেষ এই তর্কযুক্তি বহুলতার দিনে।

এই গণতন্ত্রের যুগে আমরা সকলেই নিজের বা নিজদলের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ ও প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। হে নবীন নবীনা, মানিয়া লইতাম

তোমাদের তর্কযুক্তি, যদি তোমরা তোমাদের পাণ্ডিত্যের অকাট্য যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারিতে। দোষ নিজেদেরই যদি সত্যই অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। নিজেদের অবস্থার পর্য্যালোচনা না করিয়া, নিজেদের দোষ ত্রুটীর অনুসন্ধান না করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির শিরে দোষভার নিক্ষেপ সুসাধ্য। আমি বলিতে চাই যে তথাকথিতা নিন্দিতা, নিষ্পেষিতা জননী, যখনই তুমি তোমার নিজের মোহের ভাব অবগত হইবে, যখনই তুমি বুঝিতে পারিবে, সত্যই তুমি আজ পদদলিতা, অকারণে নিষ্পেশিতা, তখন তোমার প্রয়াস হইবে না, অপরকে তোমার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের জন্য দায়ী করিতে—তখন সত্য সত্যই তোমার মোহান্ধকার দূরীভূত হইবে ;—শিশু তার জননীকে আর বলিবে না, "মা আমার খিদে পেলে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।"

ভবিষ্যৎ জনসমাজের মঙ্গলবিধায়িনী মাতৃসমাজ তোমার ঐ ঘুমের ঘোর আজ কাটাইয়া তোল—তোমার মাতৃত্ব আবার ফুটাইয়া তোল,—রমণীত্বকে চাপা দিয়া। তোমার অন্নপূর্ণামূর্ত্তী আবার প্রকট কর।

"হে ভারত, ভুলিও না তোমরা নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী"। যখনই আমাদের এই ভুল (?) আসিবে তখনই আমাদের পতন, তাই সন্নাসী দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে সতর্ক করাইতেছেন "ভুলিও না, ইত্যাদি" বাক্যে। আত্মবিস্মৃতিই আত্মবঞ্চনা, ও পতনের মূল কারণ—এই আত্ম-বিস্মৃতি আজ আমাদের সমাজকে ধ্বংসের মুখে উপনীত করিয়াছে—এই আত্মবিস্মৃতির মূলে বর্ত্তমান বিলাসাবিল শিক্ষা, ভাব, ও সভ্যতা যে কতটা দায়ী তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধি ভারতীয়, বিশেষ স্ত্রীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে আজ বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের প্রসঙ্গ পরে উত্থাপন করিব—পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে ভাব কিরূপ ছিল তাহার দু একটা কথা উত্থাপন করিয়া লেখিকার অযথা সন্ন্যাসীর উপর দোষারোপ স্খালনের চেষ্টা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখি স্বামী বিবেকানন্দ পরম-হংস রামকৃষ্ণ দেবের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য—তাঁহার জ্যোতিতেই স্বামিজী জ্যোতিষ্মান। স্বামিজী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন—

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারা তিনি যে মোটেই বুঝিতে পারেন নাই এমন মনে হয় না। বিশেষ তিনি কিছুকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষেত্রে বসবাস ও কার্য্য করিয়াছিলেন এবং ঐ সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে সংশ্লিষ্টও হইয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামিজী তদীয় শিষ্যা নিবেদিতা প্রভৃতি কতিপয় ব্রহ্মচারিণীর সাহায্যে আমাদের ভারতের পুরাতন স্ত্রীশিক্ষা ও সভ্যতাকে নূতন ভাবে ঢালিয়া গড়িতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। যদি কথা উঠে পাশ্চাত্য রমণীর নিকট হইতে ভারতীয় ভাব ও আদর্শ শিক্ষা করিব কি প্রকারে? উত্তর—স্বামিজী ও নিবেদিতার জীবনী ও কার্য্যের বিশ্লেষণ করিলে, তবেই সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে। বেশী ঘটনা ও কথার মাত্রা বাড়ান নিষ্ফল।

শেষ কথা, বর্ত্তমান শতাব্দীর সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন স্বামী বিবেকানন্দ মাতৃ শক্তিকে পুনরায় প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন—উদাহরণ, তাঁহার প্রবর্ত্তিত মেয়ে মঠ বা "মাতৃমন্দির" ও মেয়েদের তথায় সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা।

সেই স্বামী বিবেকানন্দ স্ত্রীজাতিকে সমাজের একটা অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ (যাহা বাদ দেওয়া চলে না—পুরুষের মতই সমান রূপে) বলিয়া জানিতেন, যিনি বলিয়া গিয়াছেন এই অকারণে নিষ্পেষিতা স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দীক্ষা ক্ষমতায় যতদিন তোমাদের (পুরুষদের) সমকক্ষ করিয়া না তুলিতে পারিবে—ততদিন ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশ তমসাচ্ছন্ন; আজ না তাহাকেই আমরা সদর্পে woman hater (নারী বিদ্বেষী) বলিয়া ঘোষণা করিতে লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করি না। নারী জাতি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে তাঁহার পত্রাবলী প্রভৃতি হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠক বর্গকে দেখালেই যথেষ্ট হইবে।

"জগতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই; এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।"

"সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী গুরু গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব

সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার। সেই জন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ।"

"শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। * * আবার গার্গী, মৈত্রেয়ী, জগতে জন্মাবে। * * শক্তির কৃপা না হলে কিছুই হবে না।"

"মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষের ভেদ নাই। শক্তির বিকাশ চাই, হাজার হাজার পুরুষ চাই—স্ত্রী চাই—।"

"আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্য কীট নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। প্রভু কি গপ্পি বাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উতবা কুমারী—আর আমরা বলছি "দূরমপসর রে চণ্ডাল, কেনৈষা নির্ম্মিতা নারী মোহিনী।"

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াই কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষদের বিষয়ে দুচার কথার আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহারে উপনীত হইব।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব মাতৃমূর্ত্তির বা শক্তির উপাসক ছিলেন—চির-জীবন মা মা করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ও পঞ্চবটী উদ্যান মুখরিত করিয়া, পাষাণ মূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়া এবং স্বীয় জীবন দ্বারা ঐ ভাব সাধারণে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আজও গঙ্গার তীরে ঐ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে সত্য সত্যই দর্শকের মন মাতৃভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—সে জগতে মাতৃমূর্ত্তি বিনা আর যেন কিছুই দৃষ্ট হয় না।

একদিন কলিকাতার রাস্তার পার্শ্বে জনৈকা বারবনিতাকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন "ঐ যে মা আমার বেশ্যারূপে বিরাজ করিতেছেন"। তাঁহার নিজ জীবনের সাধকাবস্থায় সাক্ষাৎ নারীমূর্ত্তির পূজা করিয়া জগতের স্ত্রীজাতিকে মাতৃরূপে আবাহন করিয়াছিলেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব "কামিনী কাঞ্চন" বিষয়ে বিশেষ করিয়া তাঁহার নবীন সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন; সত্যই যে যোষিৎ

সন্ন্যাসীর উন্নতির পথের কণ্টকস্বরূপ এরূপ কথা শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক জগৎগুরু সন্ন্যাসিগণ এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যিশু-খৃষ্টও বলিয়া গিয়াছেন। নবীন সন্ন্যাসীর অবস্থা দুধের মত, জলের সহিত মিশাইলেই মিশ খাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী—সে তখনও মাখনে পরিণত হয় নাই যে জলে ভাসিবে—তাহার ঘটি তখনও সোণার ঘটিতে পরিণত হয় নাই যে কলঙ্ক পড়িবে না। পরমহংস দেব তাঁহার গৃহস্থ ভক্তদিগকে কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধে তদ্রূপ কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা জানি না,—তিনি ভব রোগের উত্তম বৈদ্য ছিলেন, জানিতেন কোন্ ছেলেকে অবস্থাভেদে কি পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। লেখিকা এই দেশকাল পাত্রের বিবেচনা না করিয়াই বৃথা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। এইটা বেশ বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে সন্ন্যাসী এক ভিন্ন জাত—তাদের সঙ্গে জগতের গৃহস্থালীর সম্পর্ক অল্প।

তুলসীদাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটা কথার অবতারণা করিব। তুলসী-দাসের ধর্ম্মপ্রেরণা কোথা হইতে আসিয়াছিল বোধ হয় সকলেই জানেন; তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অন্যায় স্ত্রী-আসক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন এই আসক্তি ভগবানে (রামে) অর্পণ করিলে তাঁহার জীবন সার্থক হইত। স্ত্রীর এই ভৎর্সনাসূচক উপদেশেই তুলসীদাসের চৈতন্য উদয় হইল। তিনি তাঁহার এই আসক্তি "রামসীতায়" অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদের দর্শন (ভগবদ্দর্শন) করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সীতাতে তাঁহার অহৈতুকী ভক্তি ও ভালবাসা ছিল বলিয়াই তিনি সীতাচরিত্রে মাতৃত্বের ও সতীত্বের ভাব অমন সম্যকরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন! কি স্থলে, কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে গিয়া তুলসীদাস "দিনকো মোহিনী, রাঁতকো বাঘিনী" ইত্যাদি কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষয়।

আমি এই শতাব্দীর স্বতন্ত্রভাবের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়ার জোরে আজকাল আমরা, মেয়েদের বন্ধন দূর হইয়াছে, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সমূহ উন্মুক্ত বাতাসে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে, যথেষ্ট বুঝি—যদি শুধু দেখিতে পাই রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার

ক্ষমতা থাকে, Vote এর অধিকার লাভ করে এবং যদি স্বামীকে বলিতে পারে "তোমার আমার অধিকার সমান"। এইরূপ স্বাধীনতা আমাদের দেশপ্রসূত নয়, উহার আগম পাশ্চাত্য দেশ হইতে। কই, যদি পাশ্চাত্য সভ্যতাই একমাত্র আদর্শ সভ্যতা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইউরোপ ও আমেরিকায় আজ যে সামাজিক ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে তাহার কারণ কি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কোন ব্যাপারেরই বাড়াবাড়ি ভাল নহে—একটা সীমা ঠিক রাখিয়া চলা ভাল। উশৃঙ্খল জীবন কষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে,—আমরা চাই liberty, libertinity নয়। যে সভ্যতা ও শিক্ষার বিষ উদ্‌গীরিত হইয়া আজ পাশ্চাত্য সমাজ ও জীবন বিধ্বস্ত, যে সভ্যতার ফলে আজ গার্হস্থ্য জীবন বিষময়, স্নেহ মমতা শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং যে সভ্যতার সংস্কার করিবার জন্য আজ পাশ্চাত্য সমাজ বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে, আজ না আমরাই আপন রতন চিনিতে না পারিয়া সেই আপাতমধুর ঝুটা সভ্যতার মোহ কাটাইতে পারিতেছি না,—বরং দিনের দিন সেই দিকেই ঝুকিয়া পড়িতেছি। সম্মুখে অগ্নি শিখার সম্মোহিনী শক্তি—পতঙ্গ সাবধান! পরানুকরণই শিক্ষার ও জ্ঞানের চিহ্ন নহে—আত্মশক্তির বিকাশ কর, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও এবং নিজের দেশ, হাওয়া ও অবস্থার সঙ্গে আত্ম সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার খাপ খাওয়াইয়া তোল—তবেই ত ঠিক ঠিক ভারতীয় ভাব ফুটিয়া উঠিবে—তবেই ত আবার ভারত ললনা শিক্ষা দীক্ষায় গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত, স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা, কোমলতা ও সতীত্বে সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর মত হইয়া উঠিবে।

(২)

(শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সিংহ।)

গত চৈত্র মাসের প্রবাসীতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের "জাতিগঠনে বাঁধা—ভিতরের ও বাহিরের" বক্তৃতার সারাংশ বাহির হইয়াছে উহাতে কাজের কথা অনেক আছে সত্য কিন্তু কয়েকস্থলে গুরুতর ভ্রম থাকায় উহার প্রতিবাদ নিতান্ত আবশ্যক।

(১) "বিবেকানন্দের ভক্ত বলবেন—বেদান্ত পাঠ কর—দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিচার কর।"—বিবেকানন্দের ভক্ত সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু সন্তানগণকে আপন আপন ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক রাখিয়া বেদান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। দ্বৈত অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্যে আপন অভিরুচি মত যে কোনরূপ ব্যাখ্যা করুন তাহাতে আপত্তি নাই। এক উদ্দেশ্য—হিন্দুধর্ম্মের সকল শাখা প্রশাখাই বেদান্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অপর উদ্দেশ্য—"অন্তর যার বাধা নির্ম্মুক্ত তার কাছে বাহিরের বাধা কখনও সাংঘাতিক হয় না। বাহির যে অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। অন্তরে সত্যের আলোকে যা গ'ড়ে ওঠে, বাহিরে তার প্রতিষ্ঠা হবেই, সে কোন বাধা মান্‌বে না।" তাই বেদান্ত পাঠ করিলে সকলেই আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষরূপ মনের শক্তি লাভ করেন। জেলে ভাল মাছ ধরিতে পারে, উকীল ভাল জেরা করিতে পারেন, ডাক্তার ভাল রোগ নির্ণয় করিতে পারেন। হিন্দু ব্যতীত অপর ধর্ম্মাবলম্বী যদি ইহা পাঠ করেন তবে তাঁহার নিজের ধর্মশাস্ত্র বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, আরও তিনি আপন ধর্ম্মেই অধিকতর নিষ্ঠাবান হইবেন। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য বেদান্ত পড়িতে হইবে বলিয়া যে, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, রসায়ন বা বাণিজ্য প্রভৃতি অন্য কোন বিদ্যা আর শিখিতে হইবে না এমনকি খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন, পরিধানের জন্য বস্ত্র বয়ন, নদী নালা পার হইবার জন্য নৌকাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কিছুই করিতে হইবে না বিবেকানন্দের ভক্ত কবে একথা বলিয়াছেন? বরং সম্পূর্ণভাবে তার বিপরীত কথাই চিরদিন বলিতেছেন। বিবেকানন্দের ভক্তগণই বলিতেছেন হে ভারত সন্তান! তোমাদের ধর্ম্ম যথেষ্ট আছে এখন কর্ম্ম কর। আগে খাইয়া বাঁচ তারপর ধর্ম্ম করিও। বিবেকানন্দের ভক্ত সন্ন্যাসিগণই ভক্তি, মুক্তি সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষুধাতুরকে খাদ্য ও পীড়িতকে ঔষধ দিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিবেকানন্দের ভক্তগণই সর্ব্বাগ্রে মেথর, মুচি, হাড়ি ডোম, চণ্ডালকে দরিদ্র নারায়ণ আখ্যা দিয়াছেন ও সেবা না বলিয়া পূজা বলিয়া আসিতেছেন!

(২) "পরম ধার্ম্মিক হিন্দু রাজার রাজত্বকালে শূদ্র তপস্যা করেছে

ব'লে তার শিরচ্ছেদনের ব্যবস্থা হল";—যিনি প্রজাগণের মনোরঞ্জনার্থ প্রিয়তমা পত্নীকে বনে দিয়া অসহ্য বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তিনি কেন তপস্যা করার অপরাধে শূদ্রকে হত্যা করিলেন? তিনি ত নিজেই বানরকে "উপনিষদ্" শুনাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছিলেন। তবে ঐ কঠোর দণ্ড কেন? এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই প্রকৃত সদুত্তর পাওয়া যায়—শূদ্র, পদদ্বয় গাছের ডালে বাঁধিয়া মাথা নীচুদিকে ঝুলাইয়া আবার মাটীর উপর প্রবল অগ্নি জ্বালাইয়া কঠোর কৃচ্ছ তপস্যা করিতেছিলেন, সে সময় লোকে ঐরূপ তপস্যায় দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া যে বর লাভ করিত; তাহার শক্তিতে আপন সুখের আশায় অনেক লোকের উপর উপদ্রব আরম্ভ করিত। ইহাতে সমাজে অশান্তির ভয়ে তাহাকে ঐরূপ দণ্ড দিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ ভ্রাতৃকল্প শূদ্রগণের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করিয়া কলখানাওয়ালারা তাহাদের আত্মোন্নতির সরল, শান্তিময় ও সমাজের নিরুদ্বেগ জনক তপস্যা ধ্বংস করিয়া দিল, সে সময় কিন্তু এই শ্রেণীর বক্তাগণ নীরবে শাস্ত্র আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। আর তাঁহার আদর্শ মত, কল কারখানার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ শত শত তপস্বিশূদ্রের মস্তক ছেদন অহরহ হইতে থাকিবে ইহা যেন একটু ভাবিয়া দেখেন। আর আজকাল শূদ্র বলিতে যেরূপ হীন জাতি বুঝায় তখন সেরূপ ছিল না, মহাভারতকার স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন "সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল, ক্রমে অবনতি হওয়াতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে আবার সত্যযুগের আরম্ভে সমস্ত জাতিই ব্রাহ্মণ হইবেন।" তখন সমাজে জাতিবিভাগ আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, জীবন্ত সমাজে যদি কেহ কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পাদনে ক্রটী করে তাহাকে কঠোর দণ্ডই ভোগ করিতে হয়। সমাজ গঠনের প্রথমেই যদি কেহ নিজ সম্প্রদায়ের কার্য্য সম্পাদনে অনিচ্ছুক হয় তবে তাহার প্রথমেই ঐ দলে প্রবেশ না করাই অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, শূদ্রের যদি তপস্যা করিবারই এত সাধ হইল, তবে সে পৈতা গলায় দিল না কেন? তখন এক বাপের দুই ছেলের একজন পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ ও অন্যজন ক্ষুর নরুণ ধরিয়া নাপিত হইলেন এ দৃষ্টান্ত

ও বিধির অভাব ছিল না, আবার আজকালকার মত পৈতা লইতে হইলে থালা, ঘটি, বাটী, গেলাস প্রভৃতির আবশ্যক হইত না কতকগুলি ফল, ফুল, কুশ, মৃগচর্ম্ম ইত্যাদি বন হইতে কুড়াইয়া আনিতে পারিলেই হইত! মনে রাখিতে হইবে যে রাজা শূদ্রের মাথা কাটিয়াছিলেন, তিনিই হীনতম চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন।

(৩) "মনু মহাশয় ব্যবস্থা করেন যে শূদ্রের কর্ণে বেদোচ্চারণ শব্দ প্রবেশ করিলে উত্তপ্ত তরল সীসক সেই কর্ণে ঢালিয়া দিতে হয়। এই মনুস্মৃতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয় কি?" মনু মহাশয় না হয় বেদ শুনিলে তাহার কর্ণে উত্তপ্ত তরল সীসক ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু এ দিকে যে, "যজুর্ব্বেদ" স্বয়ং বলিতেছেন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে হইবে, সকলেই বেদ পড়িবে। বেদ স্বয়ং যাহা বলিতেছেন তাহা না শুনিয়া পরবর্ত্তী কালে রচিত স্মৃতির উপর এত ভক্তি কেন? "যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানীজনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যভাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥ (শুক্লযজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিনীয়া শাখা, ২৬ অধ্যায়, ২য় মন্ত্র) আর মনু তখনকার সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা দেখিয়া তখনকার জন্য সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন ত কলিতে "পরাশর স্মৃতি" চলিবে। অতীত যুগের সেই সুপ্রাচীন প্রথা স্মরণ করিয়া মনুর উপর এত ক্রোধ কেন? যাঁহারা মনু মহাশয়ের হুকুম বজায় রাখিতে গিয়া বেদ পড়িতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা মনুর অপর আদেশগুলি (ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা, সন্তান উৎপাদন, অর্থ উপার্জ্জন, ধনসঞ্চয়, সকল বিষয়ে সংযম ও দান প্রভৃতি ব্যবস্থা) যথাযথ প্রতিপালন করিয়া কতদূর উন্নত হইয়াছেন? মনুর আদেশে বেদের সংহিতা ভাগ না হয় পড়া চলিল না, কিন্তু বেদের সার উপনিষদ্‌ভাগ যাহার কোন কোন অংশের শ্রোতা বনের বানর তাহা পড়িয়া শূদ্রগণ আত্মোন্নতি করিতে পারিলে না কেন? উপনিষদের জীবনপ্রদ অমৃতবাণী শূদ্রগণকে এতদিন এমন অবস্থায় লইয়া যাইত যাহা ব্রাহ্মণগণেরও বিশেষ লোভনীয় হইত। আর সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মুকুটমণি শ্রীমৎ ভগবৎগীতা খানা, পুরোহিত ঠাকুর যে, দুয়ারে দুয়ারে

প্রত্যেক শ্রাদ্ধে, প্রত্যেক পুষ্করিণী, কূপ ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠায় পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মেথর মুচি নির্ব্বিশেষে সকলকে শুনাইয়া বেড়াইলেন তাহার সেই "মৃত সঞ্জীবনী" অমর বার্ত্তাই বা কয়জন শুনিলেন ?

মনুর পর পুরাণকার বলিলেন

"চাণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

তৎপরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন—

"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে॥"

এবং তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধু, দেশাত্মবোধের জলন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্য নিজ পিতার শ্রাদ্ধপাত্র যাহা সুলক্ষণযুক্ত বেদজ্ঞ কুলীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহাকেও কথন দেওয়া হয় না, তাহা "যবন হরিদাসকে খাইতে দিলেন", শত শত ব্রাহ্মণের আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। সেই সকল মহাপুরুষগণের আদেশ ও উপদেশ, কার্য্য ও দৃষ্টান্ত লঙ্ঘন করা হইতেছে কেন ? মুচি রামদাসের ব্রাহ্মণ হইতে কোটীগুণ সম্মানদর্শনে শূদ্রজাতি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইল না কেন ?

বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী পণ্ডিতগণ, ব্রাহ্মণজাতি ও তাঁহাদের পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষগণ, কি বর্ত্তমান অবনত বংশধরগণকে যত ক্ষুদ্র হৃদয় বলিয়া ঘোষণা করুন না কেন আমরা বিশেষ অনুসন্ধান বলে সাহসের সহিত বলিতেছি তাঁহারা তত ভীষণ নহেন। বঙ্গদেশে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "ঋক্‌বেদের অনুবাদ" শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস মহাশয়ের "ঋক্‌বেদের অনুবাদ" শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়ের সংগৃহীত "বেদসংহিতা" শ্রীযুক্ত উমেশ-চন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় প্রকাশিত সানুবাদ "ঋক্‌বেদ" শত শত ব্রাহ্মণের ঘরে সাদরে রক্ষিত ও পঠিত হইতেছে। ইঁহাদের একজনও ব্রাহ্মণ নহেন। এদিকে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ভিন্ন তৃতীয় জাতি নাই। বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণমণ্ডলী কর্ণে উত্তপ্ত সীসকের পরিবর্ত্তে বেদপাঠক শূদ্রের মস্তকে "অগুরু"সিঞ্চনই করিতেছেন। প্রমাণ—"ময়নাজলের ঘোষঠাকুর

মহাশয়গণ কায়স্থ হইলেও তাঁহাদের শত শত কুলীন ব্রাহ্মণ শিষ্য। আর স্বামী বিবেকানন্দ কায়স্থ হইলেও তাঁহার শত শত সুশিক্ষিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শিষ্য।" মহাত্মা গান্ধীর মহামন্ত্রে মেথর, মুচি, কুলী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ যেরূপ জাগিতেছে তাহাতে অচিরে আমরা শত শত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি মিলিয়া তাহাদের পদতলে বসিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণে "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" বোধ করিব। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ যে সুবীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, মহাত্মাগান্ধি আজ তাহাকে ফলপুষ্পে সুশোভিত করিতেছেন, অচিরে সমগ্র ভারত তেত্রিশ কোটী ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়া, ঐক প্রাণ, এক জাতি ও এক কর্ম্মী হইয়া পড়িবে। তাহাতে ব্রাহ্মণকে "বেদ", মুসলমানকে "কোরণসরিফ" বা খৃষ্টানকে "বাইবেল" ছাড়িতে হইবে না বরং অধিকতর দৃঢ়ভাবে ধরিতেই হইবে।

(৪) "বেদ, বেদান্ত পাঠ্য হ'লে বাঙ্গালার শতকরা ৫২ জন মুসলমান কি করবে? দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ—কোন পন্থী হলে মুসলমান ভ্রাতাদের টেনে নেওয়া যেতে পারে?" যে যে প্রতিষ্ঠানে মাত্র বেদ-বেদান্ত পাঠ্য হইয়াছে কিন্তু কোরাণসরিফ বা বাইবেলের স্থান নাই, সেই সেই প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায় বিশেষের জন্যই স্থাপিত বুঝিতে হইবে। কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের সকল বিদ্যার্থীই যে ঐ গুলিতেই অধ্যয়ন করিবে তাহা নহে, যাহাতে অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা নাই, ভোগের পরিবর্ত্তে ত্যাগেরই জয় জয়কার শত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে তাহার ছাত্র সংখ্যা আর কত হইবে? ঐ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত মিলিত হইয়া সাধারণ জাতীয় বিদ্যাপীঠ গুলিতেই পড়িবে। তবে, মাত্র বেদবেদান্ত পাঠ্যযুক্ত বিদ্যা-মন্দিরগুলিরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, কেননা আমাদের বেদবেদান্ত উপনিষদ্-গুলি যেরূপভাবে আলোচিত হইলে আমরা উহার সুধাময় ফল উপভোগ করিতে পারি, বর্ত্তমান "টোল ও দেবালয়গুলি" সে ভাবে যাইতেছেন না, যদি বর্ত্তমান "মাদ্রাসা ও মসজিদ" অথবা "খৃষ্টীয় বিদ্যালয় ও চার্চ্চ" মুসলমান ও খৃষ্টিয় ভ্রাতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতে না পারিতেছে, যদি কোরাণ সরিফ ও বাইবেল যথাশাস্ত্র আলোচনার ত্রুটী হইতেছে তবে

অচিরে ঐ দুইশাস্ত্র আলোচনার জন্যও পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিতেই হইবে। অর্থ, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ভারত সন্তানই প্রদান করিবেন। প্রত্যেক ভারত সন্তানকেই কিছু কিছু সাধনা করিতে হইবে, নতুবা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইত্যাদি সকল শ্রেণীকে এক স্থানে বসাইয়া যদি শত বৎসরকাল, ধর্ম্মহীন, একধর্ম্ম বিশিষ্ট, আপন আপন ধর্ম্ম বিশিষ্ট, সমগ্র মিশ্রিত ধর্ম্ম বিশিষ্ট অথবা আরও যত রকম কল্পনা করিতে পারেন সেইরূপ মাত্র মৌখিক বাহ্য শিক্ষা প্রদান করা যায় তবে কিছুতেই তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে পারিবে না। হিন্দু ধর্ম্ম ভাল কি মুসলমান ধর্ম্ম ভাল তাহা লইয়া ত ঝগড়া নয়, ঝগড়া হইতেছে "কি! আমি বল্‌ছি হিন্দু ভাল, আমার কথাটা থাক্‌বে না?"—"আমি বলছি মুসলমান ভাল আমার আবার প্রতিবাদ?" যতক্ষণ এই যে ভীষণ মহাপাপ—"আমি", ইহার সম্পূর্ণ ধ্বংস সম্ভব না হইলেও—কঠোর দমন না হইতেছে ততদিন মিলনের আশা সুদূর পরাহত। একত্র আহারী ও একধর্ম্মী হইলেই যদি দেশে শান্তি স্থাপিত হইত তবে ইউরোপে এই মহাকুরুক্ষেত্র হইল কেন? ভিন্ন প্রদেশের সহিত পরস্পর বিবাহ চলিলেই যদি শান্তি স্থাপিত হইত তবে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের মধ্যে সেই ভীষণ মনান্তর জন্মিল কেন? দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দ কোন-পন্থী না হইয়া "স্বপন্থী" অবস্থাতেই মুসলমান ভ্রাতাদের 'টেনে' নেওয়া যেতে পারে! নিজের হৃদয় যাঁর প্রশস্ত তিনি পৃথিবীর সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মের লোককেই টেনে নিতে পারেন। আর যাঁর হৃদয় সংকীর্ণ তিনি সকলকেই পর ভাবিয়া তাড়াইয়া দেন।

(৫) "মনুর মতে রাজা দেবতা, তার বিরুদ্ধে অভিযোগের স্থান নেই, যা বল্‌বেন তাই মান্‌তে হবে।" মনুর মতে রাজা যাহাই হউন পঞ্চম বেদ মহাভারত কিন্তু জলন্ত ভাষায় রাজার কুলের কথা বাহির করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান নূতন নূতন রাজনৈতিক মত সমূহ বাহির হইবার কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই মহাভারত বলিয়াছেন যে, "রাজা আর কিছুই নয়, পূর্ব্বে ত এর নাম গন্ধই ছিল না. পরে কতকগুলি লোক মিলিত হইয়া একজনকে নেতা ঠিক করিল, আর সকলে মিলিয়া কতকগুলি

নিয়ম প্রণয়ন করিল। সেই নেতার অধীনে ঐ নিয়মগুলি প্রতিপালন করিয়া ঐ দল বেশ সুখ শান্তিতে আছে দেখিয়া আরও অনেকে ঐ দল ভুক্ত হইয়া একটী রাজ্য স্থাপন করিল, তাহার অনুকরণে শত শত রাজ্য স্থাপন চলিতে লাগিল।" যদি দেশের লোককে জাতীয় ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হইত তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যেও স্বাধীনতার আন্দোলন জাগিয়া উঠিত নিশ্চয়। কারণ, অত্যাচারী রাজা বেণ ও নহুষকে রাজ্যচ্যুত করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান কালে একজন ভারত সন্তান "হাম্‌ডেন্" ও "পিম" প্রভৃতির নামও জানিত না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কুলি-সেবাকার্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কুলি-সেবাকার্য্যের (গোয়ালন্দ ২৫শে মে এবং চাঁদপুর ২৮শে মে হইতে ২৮শে জুন, ১৯২১) হিসাব।

জমা—রামকৃষ্ণমিশন প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে গৃহীত ৪০৩৸/০, বর্ত্তমান প্রাপ্ত দান ২৩৯৭৸/০, কার্য্য স্থানে প্রাপ্ত দান ৭৭৵০, খুচরা জিনিষ পত্র বিক্রয়ে প্রাপ্ত ১৩॥/১৫, মোট ২৮৯২।/১৫।

খরচ—কুলিদের চাল, ডাল, নুন, চিঁড়া, গুড় প্রভৃতি ১৬৩৬৸৶৫, গোয়ালনন্দ হইতে কুলিদের নৈহাটি পৌছিবার জন্য (২৫।৫।২১) ৩৫০ খানি টিকেটের দাম ৩০৩৲, কুলি রোগীদের জন্য নূতন কাপড় ৫৩।৶১৫, চাঁদপুরের কুলিদের (৮১৮) আর্থিক সাহায্য ৬৯৬॥৵০, ঐ বাবদ অপরাপর খুচরা খরচ ১৪৷৷/০, কলিকাতা, ঢাকা, বরিশাল কেন্দ্র হইতে ২৯ জন সেবকের যাতায়াত ও খাওয়াদাওয়া, ষ্টেসনারী, পোষ্টেজ, উপকরণ ইত্যাদি বাবদ মোট খরচ ১৮৭॥৶১৫, মোট খরচ, ২৮৯২।/১৫।

এতদ্ব্যতীত ৪/ মন চাল, ।০ সের ডাল, ।০ সের নুন্ এবং তরীতরকারী (দান স্বরূপ প্রাপ্ত) কুলীদের মধ্যে বিতরিত হয়।

কংগ্রেস কমিটি ৪৩২১।১৫ এবং মারবারী সেবক সমিতি ১১২৬৶১৫ কুলিদের সাহায্যের নিমিত্ত আমাদের হাতে দেন। ঐ টাকার হিসাব পৃথক ভাবে তাঁহাদের নিকট দেওয়া হইয়াছে।

আগামীবারে খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষ কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিব। যাঁহারা সাহায্য দানে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় হাওড়া বা সেক্রেটারী, উদ্বোধন অ্যাফিস, বাগবাজার, কলিকাতা, এই ঠিকানায় অর্থ বস্ত্রাদি পাঠাইলে বাধিত হইব। (স্বাঃ) সারদানন্দ।

আগমনী।

(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়)

সুনীল নভের বক্ষে ভাসে শাদা মেঘের ভেলা,—
নীল সাগরে শুভ্র ফেনার হরেক রকম খেলা।
শরৎ-শেষের অর্ঘ্য লয়ে ঐ যে আকাশ সাজে ;
ভুবন ব্যেপে কাহার আগমনীর সুর বাজে !
বাংলা মায়ের দীন আলয়ে শ্যামল সভায় পূজা ;—
আয় মা ! মোদের সকল আশা ! আয় মা দশভুজা !

*　　*　　*

শিউলি ফোটা শ্যামল বনে রূপের ছড়াছড়ি,
গন্ধ তাহার উবিয়ে গেল বাতাস পাগল করি।
হরেক ফুলের রঙীন নেশায় ভ্রমর আকুল হ'ল ;
দোয়েল শ্যামা গোপন ঝোপে আকুলিয়া গেল।
বাংলা মায়ের কানন-ঘেরা শিউলি-কুঞ্জে পূজা ;—
আয় মা ! মোদের সকল আশা ! আয় মা দশভুজা !

*　　*　　*

শিশির মালার মুক্তো দিয়ে পান্না সবুজ সাজে ;
করুণ চোখের অশ্রুকণা তাতেই সুধু রাজে।
শিশির-ভেজা শীতল-করা বায়ুর লহর ছোটে ;
প্রাণের জড় কারার বাঁধন অলক্ষ্যে আজ টুটে।
বাংলা মায়ের শান্তি-শীতল অঙ্গনে আজ পূজা ;—
আয় মা ! মোদের সকল আশা ! আয় মা দশভুজা !

*　　*　　*

সরসীর আজ ফুল্ল কোলে কমলিনীর আলো,
কাহার আগমনীর প্রদীপ হরষে জালালো !
শোভার পুরে হীরক-মালা, তটিনী আজ সাজে,—
ঢেউএ ঢেউএ আগমনীর জল-তরঙ্গ বাজে।
কমল-কুমুদ অর্ঘ্য দিয়ে তোরি চরণ পূজা ;—
আয় মা ! মোদের সকল আশা ! আয় মা দশভুজা !

*　　　*　　　*

কাশের বনের শুভ্র শির ঐ প্রতি স্তরে স্তরে,
তোমার আসার আনন্দেতে নর্ত্তনেতে ওড়ে।
শুভ্র ঢেউএর অভ্র মাঝে চরণ দুটি ফোটে ;
তোরি তরে জগৎ জুড়ে কি আনন্দ ছুটে !
শুভ্র বকের অর্ঘ্য দোলে, রক্ত জবার পূজা ;—
আয় মা ! মোদের সকল আশা ! আয় মা দশভুজা !

*　　　*　　　*

বুলবুলি আর পাপিয়ার ঐ মোহন বাঁশীর খেলা ;
আলোয় রাঙা আকাশতলে কাটছে সকাল বেলা
তোরি তরে জগৎ জুড়ে আয়োজনের সাড়া ;—
মূর্চ্ছনা আর গমক মীড়ে বাহির ভিতর হারা।
জগৎ জোড়া চরণ দুটির দীনপ্রাণের এই পূজা ;—
আয় মা ! মোদের সকল আশা ! আয় মা দশভূজা !

*　　　*　　　*

বাংলা মায়ের দীন কুটীরে—হাসির-লহর ছবি,
সেথায় তোরে বরিয়ে লব আয় মা প্রাণের দেবি !
আয় মা গগন-ভুবন ব্যেপে, আয় মা গৃহের কোণে,
আয় মা চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভায়, আয় মা বনে বনে।—
আয় মা মনোমন্দিরেতে সেথায় তোরি পূজা ;—
আয় মা ! আয় মা ! আয় মা দেবি ! আয় মা দশভুজা !

কথাপ্রসঙ্গে।

এক অনন্ত অপার শক্তি সমুদ্র। সে স্বচ্ছ শক্তি সাগর অণুপরমাণুর রঙ্গভঙ্গীতে আবিল, কোথাও বা নীহারিকার ফেন পুঞ্জে ধবল বক্ষ; আবার আবিলতার ঘন সন্নিবেশে গভীর বিপুল আকাশে অসংখ্য ভাসমান দ্বীপমালার চকিতে বিকাশ, চকিতে বিলয় ঘটিতেছে। সে শক্তির স্পন্দন কালের সূচক, প্রতি তরঙ্গ দেশের জনয়িতা, তরঙ্গের পরম্পরা নিমিত্তের বোধিকা। পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্যজগতের সময়ে জন্মস্থিতিভঙ্গ হয় বলিয়া তাঁহার মহাকাল আখ্যা কিন্তু যাঁহার স্থিরতায় মহাকালও বিলীন হইয়া যান তিনিই আদ্যাশক্তি ভগবতী কালী। এই আদ্যাশক্তি এক হইয়াও বহুরূপে ক্রীড়াশীলা—যাহার ফল বিবর্ত্ত, পরিণাম, বিকার ক্রমবিকাশ বা পরিবর্ত্তন। জগৎ অর্থে গমনশীল—প্রবাহ বা পরিবর্ত্তনেই ইহার প্রাণ—পরিবর্ত্তন নাই, জগৎও নাই।

*　　　*　　　*

"হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী,
শব্দহীন সুর।
অন্ত হীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্ব্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘর ছাড়া !
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা,—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;

অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে;
বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।"

* * *

"যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে,—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।"

* * *

চঞ্চলার প্রতি পাদক্ষেপে অন্তর ও বাহ্যজগতে পরিবর্ত্তন ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্ট বা অনুভূত হইতেছে। ব্যষ্টির পরিবর্ত্তনে সমষ্টির পরিবর্ত্তন। অণুপরমাণুর পরিবর্ত্তন জগদ্ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্ত্তনের বোধক। অন্তর বিভাগে এই অনাদি প্রবাহের পরিচয় আমরা পাই ধর্ম্মে, রাজনীতিতে সমাজে, সাহিত্যে। যখন বিরাট ইচ্ছাশক্তি ধীরে ধীরে ব্যষ্টি মানব-মনের মধ্য দিয়া বিকশিতা তথা একীভূতা হইতে থাকেন, তখন ক্ষীণ-প্রায় বিরুদ্ধ ইচ্ছাধার 'পুরাতন' তাহাকে অন্তর্বিপ্লব আখ্যা দেয়, কিন্তু 'নবীন' সেই স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনে আদি ইচ্ছাশক্তির সফলতা ও পরিপূরণই অনুভব করিয়া থাকে। সেই অনাদি ইচ্ছাশক্তির ঐক্যতানে সুর মিলাইতে অপারগ পুরাতনের কর্ত্তব্য হয় শেষ এবং লীলাধার নবীন রাজ্য, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্যের হয় উত্থান।

* * *

পরিণাম ত সর্ব্বক্ষণই চলিয়াছে, তবে পুরাতনে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার ফল ব্যভিচার বা সংস্কার, অরাজকতা বা সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন, ভাষার অস্পষ্টতা বা সুমধুরত্ব। পরন্তু নবযুগাগমনের যথার্থ কারণ নবজ্ঞানোন্মেষ। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব প্রতি ব্যষ্টিতে অজ্ঞানাবরণে সুপ্ত; ক্রমে যতই সেই আবরণ উন্মোচিত হইয়া ব্যষ্টির স্বরূপের প্রকাশ ঘটিতে থাকে তখন আর সে মৌলিকত্বহীন পুরাতনের পরিবর্ত্তনে তৃপ্ত হইতে না পারায় এক বিরাট গুপ্ত-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে —যে অস্থির অতৃপ্ত শক্তি ধীরে ধীরে সমষ্টি সভ্যতার ভিত্তিতে আঘাত দিয়া একদিন অকস্মাৎ ভূকম্পনের ন্যায়, আগ্নেয়গিরির বিস্ফারণের ন্যায় পুরাতনের জীর্ণ প্রাসাদ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। কিন্তু পুরাতনের অজীর্ণাংশ ভবিষ্যৎ নবীন সভ্যতা প্রাসাদ নির্ম্মাণের উপকরণ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

*　　*　　*　　*　　*

আমরা অতীতকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারি না। কারণ অতীত-দৃষ্টিহীনের কদাচ ভবিষ্যৎদৃষ্টি সম্ভবপর নয়। কারণ—অতীত, কার্য্য—বর্ত্তমান, কারণ—বর্ত্তমান, কার্য্য—ভবিষ্যৎ। কার্য্যকারণের তরঙ্গ পরম্পরায় এই বিরামবিহীন জগৎপ্রবাহ। অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের বীজ নিহিত। যখন কোন অতিমানবের শুভাগমনে পুরাতনের বিপর্য্যয় উপস্থিত এবং নব নব ভাব তরঙ্গের অভ্যুত্থানের দ্বারা নবজ্ঞানবন্যায় জগৎ উপপ্লাবিত, তখন সাধারণ কল্পনা করে এ অতিমানব কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিত—ভুঁইফোঁড়!—এ নবজ্ঞান প্লাবন আকস্মিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভ্রূণ যেমন গর্ভে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা লাভে অকস্মাৎ নানা যন্ত্রণা ও উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, পদ্মার অন্তর্নিহিত শক্তি ধীরে ধীরে কার্য্যকারিণী হইয়া হঠাৎ একদিন যেমন গ্রামকে গ্রাম নিজ গর্ভে টানিয়া লয়, সেইরূপ নব জ্ঞানোন্মেষে পুরাতনে অতৃপ্ত মানবের ইচ্ছাশক্তি সকলের অজ্ঞাতসারে কার্য্যকারিণী হইয়া উপযুক্ত আধার লাভে প্রচণ্ডবেগে নিঃসরিত হয়। এই আধারকেই আমরা অতি-মানব বা যুগ-নায়ক

আখ্যা দিয়া থাকি। তাঁহারা নবীন শক্তির স্রষ্টা নহেন, পথ প্রদর্শক! আলোক স্তম্ভ!

* * *

পুরাতনের পতনেরও একটা আবশ্যকতা আছে। জলধী তরঙ্গের উত্থান-পতনই ইহার উদাহরণ। তরঙ্গ পড়ে কেন?—প্রবল বেগে, নূতনরূপে উঠিবার জন্য। এইরূপ ক্রমবিকাশের অঙ্গরূপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলিয়াছে। কি চিন্তা জগতে, কি পারিবারিক জগতে, কি সমাজে, কি আধ্যাত্মিক রাজ্যে সর্ব্বত্রই এই ক্রমবিকাশের গতি ঝঙ্কারে আরোহণ ও অবরোহণের চির সমাবেশ। উত্থান তাহার নবীনত্বের উজ্জলতায় লোকচক্ষুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু আমরা বুঝি না যে অতীতের ভাবরাশি পরিপাকের নিমিত্ত পতনের বর্ত্ম দিয়া লোকচক্ষুর অদৃশ্য হইতেছে নবজ্ঞান সমন্বয়ে প্রবলবেগে উঠিবার জন্য।

* * *

যুগ নায়কের মর্ম্মস্থলে লেখা থাকে প্রাচীন যুগের সকল ইতিহাস। কারণ সমগ্র তরঙ্গশক্তি কেন্দ্রীভূত হয় শীর্ষদেশে এবং শীর্ষদেশেই যুগ নায়কের অবস্থান। যদি আমরা ইঁহাদের প্রতি উক্তি এবং কার্য্যকলাপ লিপিবদ্ধ করি তাহা হইলে বিশ্বের সমগ্র পুস্তকাগারে তাহা ধরিবে না, যদি তাঁহাদের অপূর্ব্ব বাণী এবং কার্য্যের বিশ্লেষণ আমরা করি তাহা হইলে কত যুগ যুগান্তরের ইতিহাস তাহার কঞ্চুক মোচন করিয়া বাহির হইবে তাহার ইয়ত্তা কে করে। তাঁহারা সেই অতীতের জ্ঞানরাশি নবাবিষ্কৃত জ্ঞানের সহিত সমবায়ে জগৎকে দান করিয়া দিশেহারা মানবের পথপ্রদর্শক হন।

* * *

প্রতি ব্যক্তিগত জীবনে অতীতের সংস্কারবীজ সংগোপনে নিহিত যাহা বর্ত্তমানে চরিত্ররূপে প্রকটিত হয়। বংশ, বেষ্টনী, শিক্ষা এবং পূর্ব্বজন্মাভিজ্ঞতা হইতে উহা জীবের হৃদয় গর্ভে সঞ্চারিত। সুতরাং প্রতি জীবে বহুযুগের সমুদয় অতীত সম্পত্তি বর্ত্তমান। তাই কবি অতীতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"যুগযুগান্ত ঢালে তা'র কথা
তোমার সাগর তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে!
সেথা এসে তা'র স্রোত নাহি আর,
কল কলভাষ নীরব তাহার,—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন!
তুমি তারে কোথা লও!
"কোন কথা কভু হারাওনি তুমি,
সব তুমি তুলে লও,—
"তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া!
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হ'য়ে বও!"

* * *

সাধারণ ব্যক্তি এবং যুগনায়কে প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ এই —আমরা যেন চিরচঞ্চল কালপ্রবাহে অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ আর তাঁহারা যেন বিরাট তরঙ্গ; আমাদের তন্বী-স্মৃতি অতীতের ইতিহাসকে অতি অল্পই প্রকাশ দিতে সমর্থ, আর তাঁহারা যেন অতীতের মূর্ত্ত-বিগ্রহ তথা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের দ্রষ্টা। কবি তাই জাতিস্মরের অটুট স্মৃতি অনুভব করিয়া বলিতেছেন,—

"কত কি যে আসে কত কি যে যায়
বহিয়া চেতনা-বাহিনী!

আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তারি পড়ে থাকে কত,—
ছিন্ন সূত্র বাছি শত শত
তুমি গাঁথ ব'সে কাহিনী।
"কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন,
কত ভুলি, কত হ'য়ে আসে ক্ষীণ,
তুমি তাই ল'য়ে বিরাম বিহীন
রচিছ জীবন কাহিনী।"

"'দুর্ভাগা' এশিয়া! তুমি কি এশিয়া মহাদেশকে 'দুর্ভাগা' এশিয়া বলিতে চাও? পারমার্থিক ভাবরাজি ও অধ্যাত্মিক অভাবের লীলা-নিকেতনকে তুমি এই আখ্যা দিবে? বিশ্বের অন্যান্য অংশের যাকে তুমি 'জাগরণ' কহিতেছ তদপেক্ষা এশিয়ার এই 'ঘুমঘোর' অধিক আবশ্যক, কারণ প্রতিভাবান্ ব্যক্তির স্বপ্ন সাধারণ মনুষ্যের সতর্ক জাগরণ অপেক্ষা অনেক মূল্যবান্। তবুও বলিবে 'দুর্ভাগা' এশিয়া? হায় ইউরোপের দুর্ভাগ্যের জন্যই আমার দুঃখ হইতেছে?"

—Benjamin Disraily.

"আমাদের কার্য্য-প্রণালী অতি সহজেই বর্ণিত হইতে পারে। ঐ প্রণালী আর কিছুই নহে, কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে পুনরায় স্থাপিত করা। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, কিন্তু ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ গৌরব-শিখরে আরোহন করিল। ইহাই রহস্য। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটী বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যা কিছু আপনা আপনিই উন্নত হইবে। এদেশে ধর্ম্মের নিশান যতই উচ্চ করা হউক, কিছুতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।"

—বিবেকানন্দ।

বেদান্ত চর্চ্চা।

(অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ)

উর্দ্ধে অনন্ত বিসারি নির্ম্মল নীলাম্বর, তলে হিমশুভ্র দুই এক খণ্ড মেঘ ধীরে, সন্তর্পণে অনন্তের কোলে গা ঢালিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রখর কিরণ মালা আকাশ সাগরে ঢেউ খেলিয়া দিগ্-দিগন্তে ছুটিয়াছে, মাঝে মাঝে চিল শকুনি পক্ষ বিস্তার করিয়া উর্দ্ধ হইতে ভূতলে আহার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছে। নিম্নে পুঞ্জীকৃত সৌধমালা,—রাজপথে অবিশ্রান্ত জনসমারোহ, শ্রবণবধিরকারী বিকট কোলাহল, জীবন মরণের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ, ঐহিক সুখদেবতার তাণ্ডব নৃত্য, দারিদ্র্য পিশাচীর ভীতিপ্রদ অট্ট হাস্য। মধ্য প্রদেশে দাঁড়াইয়া 'আমি'। কে 'আমি'! ঐ অনন্ত আকাশের সঙ্গে আর এই চাক্ষুষ মর জগতের সঙ্গে কি আমার সম্বন্ধ! বাস্তবিক ভাবিবার বিষয়ই বটে। অনন্ত প্রকৃতি অনন্ত সম্ভার লইয়া চারিদিক হইতে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন। বস্তুতঃ এই বাহ্য জগৎ পরিবর্ত্তন প্রবাহ বই আর কিছুই নয়। প্রত্যেকটী পদার্থই অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্। আবার একটী পদার্থ এই মুহূর্ত্তে যদ্রূপ পরমুহূর্ত্তে অন্যরূপ। এই অবিরাম পরিবর্ত্তনশীলতাই জগতের জগত্ব। এই পরিবর্ত্তন বা ভেদই জগতের মূল সূত্র; অথবা এই ভেদই জগৎ। এই—নিয়ত পরিবর্ত্তন রাশির মাঝে দাঁড়াইয়া—আমি কে?—এই চিন্তা মানব মনে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেসঙ্গেই অনাদি কাল হইতে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। এই—অতি জটিল অথচ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সমস্যার মীমাংসার জন্য একএক জন যুগব্যাপি তপস্যায় জ্ঞানের আলোক লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই সমস্যা পূরণে যিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন কেবল মাত্র তিনিই তাহার ফল ভোগী হইয়াছেন, তাঁহার শ্রমলব্ধ রত্ন অন্যের উপভোগ্য হয় নাই।

এক্ষেত্রে যার যার পথ তাহাকেই করিয়া লইতে হইয়াছে। অপরে কেবল পথ প্রদর্শক মাত্র। তাই আজও মনে হয় ঐ গুরুতর সমস্যা বুঝি কোন কালেই মীমাংসিত হয় নাই বা হইবেও না। সেই জন্য প্রাচীন কালের ন্যায় বর্ত্তমান যুগেও আমরা ঐ সমস্যা পূরণের একটা তীব্র আকাজ্ক্ষা লক্ষ্য করি। কিন্তু উভয়যুগের অন্বেষণ পন্থা বড়ই বিভিন্ন ও বিসদৃশ। ইহাই এক্ষণে আমরা আলোচনা করিব।

এই 'আমি'র স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া একএক জন একএক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বিভিন্ন মনীষীর চিন্তা-প্রবাহ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল মনীষী প্রকৃত সত্যোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না তাহা আমাদিগের দেখিবার প্রয়োজন নাই; তবে এটুকু নিশ্চিত যে তাঁহারা প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যিনি যাহাই বলুন না কেন অবিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করাই যে মানব জীবনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করিলে সে বিষয়ে কাহারও মত দ্বৈধ হইবে না। এই সুখ-সমুদ্রে প্রবহমান চিন্তাধারার অন্যতম ধারা বেদান্ত। বেদান্ত বলিতে ষড়্দর্শনের অন্যতম বেদান্ত বা উত্তর মীমাংসাই সাধারণের বোধের বিষয় হয়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে উপনিষৎ সমূহই প্রকৃত বেদান্ত। উপনিষদের তত্ত্বগুলি যুক্তি তর্ক সহকারে পরস্পরের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করেন এবং পরবর্ত্তী যাবতীয় বেদান্ত গ্রন্থই ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া রচিত।

বর্ত্তমানে বেদান্ত আলোচনায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অন্যান্য যে বিষয়ে যতই পারদর্শিতা লাভ করুন না কেন বেদান্ত বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে তিনি স্বীয় জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ মনে করেন। Indians are born philosophers, কথাটা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। ভারতবাসী নিরক্ষর কৃষকের মুখেও বেদান্তের চরম সত্যের আভাস শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন এদেশের দরিদ্র কুটীরের চরকায় সোঽহম্ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। বেদান্তের তথ্যগুলি যেন এদেশবাসীর অস্থি মজ্জাগত। এমন

দেশে শিক্ষিত সমাজ যে বেদান্তের প্রতি এতটা আগ্রহান্বিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে যে পদ্ধতিতে বেদান্ত আলোচিত হইতেছে তাহা প্রকৃতই ভয়াবহ। আমাদের মনে হয় এইরূপে আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বেদান্ত একটা নেহাৎ ছেলেখেলা হইয়া দাঁড়াইবে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বলিতে গেলে সুরসাল আম্র কাননের শাখা পত্র গণনা করিতেই আমাদের শক্তি সামর্থ নিঃশেষিত হইবে, আম্ররসাস্বাদন কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। তাই একদিকে যেমন আনন্দ, অপরদিকে আবার ততোধিক নিরানন্দ।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। মনে করুন, এক ব্যক্তি মায়াবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিবেন মায়াবাদটী কাহার প্রবর্ত্তিত। শঙ্কর না অন্য কেহ? অন্য কেহ হইলে কে, কবে, কোথায় তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি মঙ্গোলিয়ান কি ভারতবাসী, শ্বেত কি পীত ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কোন্ সময় হইতে ঐ মায়াবাদ তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, উহাতে শঙ্করের হাত কতটা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে শঙ্করের হইলে, তিনি তাঁহার কোন্ গ্রন্থে ঐ মত ব্যক্ত করিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু মায়াবাদ জিনিষটী কি, উহার মূল্য কি, বাস্তবিক উহা একটা dogma না প্রকৃত কিছু এ বিষয়ে অতি অল্প লোকেই বিচারশক্তি প্রয়োগ করেন। দশখানা গ্রন্থের কোন্ কোন্ স্থলে ঐ মতের আভাস পাওয়া যায় ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করাই বর্ত্তমানের 'মৌলিক গবেষণা'। অনেকেই এতৎ সম্বন্ধে বহু বহু অবান্তর বাক্য বিন্যাস করিয়া স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু মূলে কেহই বড় একটা আঘাত করেন না। ফলে শাখাপত্র গণনাই সার হয়।

ছান্দোগ্যোপনিষদে একটী গল্প দেখিতে পাই—কয়েকজন শ্রোত্রিয় গৃহস্থ ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া একস্থানে মিলিত হন। কিন্তু বহু আলোচনায়ও প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহারা এক ব্রহ্মজ্ঞের শরণাপন্ন হন এবং ঐ তথ্য উপলব্ধি করিবার জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার

করেন। অবশেষে এক ক্ষত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজার কৃপায় তাঁহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন। এখানে দেখিতে পাই প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহাদের মনে একটা উৎকট ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন ঐ তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে না পারিলে প্রকৃত সুখের স্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা বেদান্ত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট বেদান্ত আলোচনা আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং প্রকৃত শান্তির উৎস—আর বর্ত্তমানে উহা Intellectual culture এবং যশোলাভের পন্থা। আজকাল এমন অনেক বেদান্ত বিশারদ দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে একান্ত অপরিচিত, এবং উপনিষদের নাম মাত্র হয়ত শ্রবণ করিয়াছেন, অথচ বর্ত্তমান যুগের তাঁহারাই বেদান্তের আচার্য্য। জীবনে যাঁহারা বেদান্তের একটী তথ্যও উপলব্ধি করেন নাই তাহারাই আজ খট্টারূঢ় হইয়া বাহ্বাস্ফোট করিতেছেন।

বেদান্ত যেন একটা ঐতিহাসিক বিষয় হইয়া পড়িয়াছে; প্রবন্ধে, বক্তৃতায় ঐ একই ধারা। কেহ উপলব্ধি করিতেই পারিতেছেন না যে তাঁহারা কেবল মাত্র খোসা ভুসি লইয়াই টানা-হ্যাঁচড়া করিতেছেন। একটী সমস্যা উপস্থিত হইলে এ বিষয়ে অমুক ভাষ্যকার কি বলেন, অমুক টীকাকার কি বলেন, অমুক বৃত্তিকার কি বলেন ইত্যাদি নিরূপণ করিতে পারিলেই যেন সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। নারদ পঞ্চরাত্র নামক পুরাণে কোন বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার একটী অতি সুন্দর উপায় বর্ণিত আছে। সন্দিগ্ধ বিষয়টী গুরুর অনুমোদিত, স্বীয় অনুভবের গোচরীভূত এবং শাস্ত্রবাক্যসম্মত হইলে উহা সত্য, অন্যথা নহে। বর্ত্তমানে যেন একমাত্র শাস্ত্রবাক্য ও নিজ কল্পিত যুক্ত্যাভাসই সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের তুলাদণ্ড। ব্যাপারটী ভিতর হইতে সম্পূর্ণ বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। যিনি স্বমত সংস্থাপনের জন্য শাস্ত্রবাক্য যত উদ্ধৃত করিতে পারিবেন তাঁহার বাক্য ততই প্রামাণ্য। প্রামান্যেরও তারতম্য! বস্তুতঃ বিচার-লব্ধ জ্ঞান যদি একটা নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ প্রদান করিতে সমর্থ না হয় তবে উহা যতই যুক্তিতর্ক সম্মত হউক না, প্রকৃত কার্য্যকরী হইতে পারে

না। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি সূর্য্যোদয় বা আপ্ত বাক্য দ্বারা স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেও যেমন তাহার একটা মানসিক অশান্তি থাকিয়াই যায় উহাও তদ্রূপ।

বর্ত্তমানের আলোচনাকারিগণ আলোচ্য বিষয়ে কতকগুলি মতামত নির্দ্ধারণ করিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু পূর্ব্বকালে বিচারকগণ যুক্তি তর্ককে বর্ত্তমানের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেন বলিয়া মনে হয় না। আত্মতৃপ্তিই যেন তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল ছিল। মায়াবাদের প্রবর্ত্তক এবং উহার কালাদি নিরূপণ করিয়া দর্শন আলোচনার কি ফল যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। ঐতিহাসিকের পক্ষে উহার একটা মূল্য আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে উহা কি একটা বিকট বিড়ম্বনা নয়? বস্তুতঃ আলোচ্য বিষয়কে যুক্তিতর্কের সুদৃঢ় নিগড়ে যতই দৃঢ় সম্বদ্ধ কর না কেন সন্দেহ দানব অলক্ষিতে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করিবেই। যত বড় উর্ব্বর মস্তিষ্কই হউক না কেন উহার সুশৃঙ্খল যুক্তি তর্কেরও একটা সীমা আছে। কতকদূর অগ্রসর হইলে সমস্ত যুক্তি তর্কই পরাহত হইয়া পড়ে। যুক্তির৹পর যুক্তি যোজনা করিতে করিতে এমন একস্থানে পৌঁছাইতে হয় যাহার পর যুক্তির প্রসার একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। সে স্থলে কেবল অনুভূতিরই একাধিপত্য। আর ঐ অনুভূতি ভিন্ন প্রকৃত তথ্য চিরকালই অজ্ঞাত রহিয়া যায়। এবং সেই অজ্ঞতা জনিত একটা অস্বস্তি দুঃসহ হইয়া পড়ে। তাই যাহারা প্রকৃত তত্ত্বোপলব্ধি করিয়া শান্তি লাভে অভিলাষী হন তাহারা যুক্তি তর্ককে ততটা শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতে পারেন না।

উপনিষদে দেখিতে পাই ইন্দ্র অত্মতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত বহু বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবশেষে প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা একদিনেই তাঁহার সম্মুখে সমগ্র বিষয়টী উপস্থাপিত করেন নাই। তাঁহার মানসিক অবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। আজকাল আমরা একদিনেই তত্ত্বজ্ঞ হইয়া উঠি। এবং অধিকারী অনধিকারী বিচার না করিয়াই বেদান্তের দুরূহ

জটিল সমস্যাগুলি তাহাদিগের নিকট উপস্থাপিত করি। ফলে গুরু শিষ্যের বড় একটা বৈষম্য থাকে না। "অন্ধেনৈব নীয়মানো যথান্ধঃ"। সংস্কৃত শাস্ত্রে কোন একটী বিষয় অবতারণা করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার সর্ব্ব-প্রথমে অধিকারী নির্ণয় করেন। বর্ত্তমানে উহা আমরা একেবারেই উপেক্ষা করি। এই বেদান্ত বিচারের অধিকারী প্রসঙ্গে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন প্রমাতাই প্রকৃত বেদান্ত বিচারে অধিকারী। বর্ত্তমানে উহা আমরা একটা কথার কথা বলিয়া উড়াইয়া দেই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যিনি আপনাকে যতই জ্ঞানী বলিয়া মনে করুন না কেন উক্ত সাধন সম্পন্ন না হইলে তিনি কিছুতেই বেদান্তের সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারেন কিন্তু তত্ত্বদর্শী হইতে পারিবেন না। তত্ত্বজ্ঞানীর একটা লক্ষণ এই যে তিনি বিষয়টী অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, শ্রোতৃবর্গের নিকট মহা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি একবার অন্তর্দৃষ্টি করেন তবে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন তিনি কত বড় আত্মপ্রবঞ্চক। পক্ষান্তরে তত্ত্বদর্শী বাগ্ বিন্যাসে পটু নহেন। তিনি আপনাতে আপনি ভুলিয়া প্রকৃত রসাস্বাদনে মত্ত থাকেন। বস্তুতঃ মানবের যাহা চরম সত্য তাহা বাক্যে প্রকাশ্য নহে, পরন্তু উপলব্ধব্য। মহাত্মা বাষ্কলি যখন বাদ্ধের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন তখন বাদ্ধ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও যখন তিনি কোন কথাই বলিলেন না তখন বাষ্কলি একান্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাদ্ধ বলিলেন, "আমি ব্রহ্ম পদার্থ সম্যক্ ব্যক্ত করিলাম, কিন্তু তুমি বুঝিলে না। তিনি 'অবাঙ্-মনসোগোচরম্'।—'বাক্য ও মনের অতীত'। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, 'নুণের পুতুল সমুদ্র মাপিতে যাইয়া নিজেকেই হারাইয়া ফেলিল, সমুদ্রের খবর আর দিবে কে?' বাস্তবিক চরমসত্য বাক্যদ্বারা প্রকাশ্য নহে। বর্ত্তমানে কিন্তু বাক্যই উহার একমাত্র প্রকাশক।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে সাধন চতুষ্টয়কে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পক্ষে একান্ত অনুকূল এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে অনেকের

নিকট তাহা একটা মস্ত রকমের বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইতে না পারিলে তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর নিকট প্রকৃত সত্য কিছুতেই পরিস্ফুট হইবে না। এক্ষণে আমরা ঐ সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্রার্থ ফলভোগ বিরাগ, শমদমাদি সাধন ষট্‌ক এবং মুমুক্ষুত্ব—ইহাই শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। প্রথমতঃ, নিত্য (Eternal, Permanent) ও অনিত্য (Transitory) বস্তুর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে হইবে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিভেদ জানা হইলে প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানই লাভ হইল, সাধনান্তরের প্রয়োজন কি? কিন্তু এস্থলে অভিপ্রায় এই যে সংসারে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকটী বস্তুই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলতা এত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হইতেছে যে সাধারণ মানুষ তাহা ধরিতে পারে না। এক খণ্ড কাষ্ঠ ফলকের অগ্রভাগে একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রাখিয়া তাহাকে বেগে ঘুরাইলে যেমন একটী অখণ্ড অগ্নিরেখাই প্রতিভাত হয়, অন্তরালগুলি যেরূপ চক্ষে পড়ে না; বায়স্কোপের ছবিগুলি যেরূপ একটীর পর একটী আসিয়া একটা অখণ্ড অঙ্গ চালনার জ্ঞান জন্মায়, সেইরূপ জগতের প্রত্যেক বস্তু প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু খোলা চোখে ঐ পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না, মনে হয় যেন জগৎ একটা স্থির পদার্থ। এই ভ্রান্ত স্থিরতার উপর নির্ভর করিয়া, অথবা এই নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীলতা লক্ষ্য করিতে না পারিয়াই মানুষ ঐহিক সুখে আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় জগতের কিছুই নিত্য চিরস্থায়ী নয়—যে গগনভেদী পাষাণস্তূপ কালের কঠোর পীড়ন সহ্য করিয়া ধীর ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাও একদিন সমুদ্রের অতল তলে বিলীন হইয়া যায়—ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য। দৈনন্দিন জীবনেও একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে কিছুই স্থির নয় পরন্তু অস্থির, চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী। পার্থিব বস্তুর এই—অনিত্যতা যাহার আপাততঃ হৃদয়ঙ্গম

হইয়াছে যাহার মনে সময়ে সময়ে এই অনিত্যতা উকি ঝুকি মারিয়া এই অনন্ত পরিবর্ত্তনের অন্তরালে একটা নিত্য-বস্তুর অস্তিত্বের বার্ত্তা আনিয়া দিয়াছে, সেই ব্যক্তিই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকসম্পন্ন।

পার্থিব সামগ্রীর এই—অনিত্যতার উপলব্ধি যখন প্রকটাকার ধারণ করে সাধকের প্রাণ তখন সেই নিত্য বস্তুর জন্য আকুল হইয়া উঠে; ইহ-লৌকিক পদার্থের উপর তাহার একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়; এই নিত্য বিবর্ত্তনশীল জাগতিক বস্তুর জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা কমিয়া যায়; ক্রমে পার-লৌকিক স্বর্গাদি সুখ-ভোগের প্রতি ও তাহার একটা বিরাগ উপস্থিত হয়। সাধক তখন বুঝিতে পারেন কার্য্য (effect) কারণের অনুরূপই হয়। অনিত্য যাহার সাধন তাহা নিত্য হইতে পারে না। অনিত্য হইতে নিত্যের উৎপত্তি অসম্ভব। পারলৌকিক সুখ-ভোগের মূলে পার্থিব যজ্ঞাদি সাধন অতএব স্বর্গাদি সুখ ভোগও অনিত্য। সেই জন্য সাধকের তখন ঐহিক ও পারলৌকিক যাবতীয় বস্তুর উপর একটা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

বৈরাগ্যের প্রধান সুফল শম বা শান্তি। আকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দমনীয় তাড়নায় মানুষ যে নিরন্তর ছুটাছুটি করিয়া অহরহঃ অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতেছ, সেই দুরাশা পিশাচীর কবল হইতে মুক্ত হইয়া সাধক তখনি শান্ত হইয়া যায়। বাসনার উত্তাল তরঙ্গান্দোলিত মানস সমুদ্রে বৈরাগ্য তৈলধারা—দুর্দ্দম, অশিক্ষিত মানসাশ্বের বৈরাগ্য কশা।

সেই বৈরাগ্যের প্রভাবে মন যখন শান্তভাব ধারণ করে তখনই সে দমিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বন্যঅশ্ব যখন শিক্ষার ফলে শান্তভাব ধারণ করে তখনই তাহাকে দমিত (trained) বলা হয়। সেই দমিত অশ্বই শকটাদি বহনের যোগ্য। সেইরূপ বৈরাগ্যের কশাঘাতে শান্ত মনই দমিত বা যোগ্য। কিসের যোগ্য?—

—উপরতির। বিষয় বিলাস দুরীভূত হইয়া যখন মন শান্ত—হইয়া গেল তখনই সাধক উপরম বা সন্ন্যাসের যোগ্য হন। বিষয় হইতে উপরত বা বিরত হওয়াই উপরতি।

বিষয় বিরত ব্যক্তির বিষয়ের আগমে বা বিগমে সুখ বা দুঃখ

অনুভূত না হওয়াই স্বাভাবিক। তখন তিনি "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"। সংসারের কোন দুঃখ কষ্টই তখন আর তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে পারে না। ইহাই তিতিক্ষা।

তৎপরেই শ্রদ্ধা। গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। এস্থলে গুরু ও শাস্ত্র কথা শ্রবণ করিয়া অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। আমরা বারান্তরে তাহার উত্তর দিতে প্রয়াস পাইব। আমি যে বিষয়টীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা করি তাহার প্রতি যদি আমার একটা অন্তরের টান না থাকে, একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা না থাকে তবে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে না। গুরুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কোন সাধন মার্গে অগ্রসর হইলে নিন্দা স্তুতি অনেক সহ্য করিতে হয়। তিতিক্ষা হীন হইলে গুরুর বাক্যে আস্তিক্য বুদ্ধির ব্যাঘাত হওয়া অনিবার্য্য।

সাধক যখন গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে অচল অটল বিশ্বাস সম্পন্ন হন তখন তিনি সেই বিষয়ে চিত্ত সমাধান করেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তাস্রোত ঐ একদিকেই প্রবাহিত হয়।

ইহাই হইল সাধন ষট্‌ক। তারপর মুমুক্ষুত্ব। মোক্ষের বা মুক্তির ইচ্ছাই মুমুক্ষা। বদ্ধ ব্যক্তিরই মুক্তি হয়, যাহার আপনাকে বদ্ধ বলিয়া জ্ঞান আছে তাহারই মুক্তি বা মোক্ষের ইচ্ছা সম্ভব। পূর্ব্বোক্ত সাধন ত্রয় সম্পন্ন ব্যক্তিই আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করেন। তিনি দেখেন, চতুর্দ্দিকে অনন্ত ভোগ বিলাস। আকাঙ্ক্ষার সুবিস্তৃত মায়াজাল, আসক্তির দুর্ভেদ্য প্রাচীর। যখনই মন এই অনন্ত আবিলতার মাঝখান হইতে আপনাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া মুক্ত বাতাসে বিচরণ করিতে চায়, তখন চারিদিক হইতে বাসনার সহস্র লেলিহান জিহ্বা তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠে বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সংসারের আবর্জ্জনা-রাশির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, বন্ধন আরও কমিয়া যায়। সংসারে বন্ধনটা যে কি তাহা যিনি সাধনমার্গে একটু অগ্রসর হইয়াছেন তিনি বেশ বুঝিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে বিষয়াসক্তিই বন্ধন। যে সাধক

বিষয়কে তীব্র হলাহলবৎ মনে করিতে শিখিয়াছেন তিনি বিষয়পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছুক হইবেনই। সুতরাং মুমুক্ষুত্ব পূর্ব্বোক্ত সাধনত্রয়সম্পন্ন ব্যক্তির প্রাণে স্বতঃই জাগিয়া উঠে।

এক্ষণে এই মোক্ষলাভের উপায় কি? পূর্ব্বে আভাস দেওয়া হইয়াছে যে বিষয়ের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দেওয়াই (indentify) করাই প্রকৃত বন্ধন। আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিই বন্ধন। সুতরাং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করাই মোক্ষ। এই মোক্ষ বা আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হিন্দুশাস্ত্রের মতে সদ্‌গুরুর স্মরণ। গুরুকৃপালব্ধ শিষ্য স্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই শাস্ত্রালোচনা করিবেন ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, ঋষিদের অভিপ্রায়। আমাদের মনে হয় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই প্রাচীন যুগে শাস্ত্র গ্রন্থ লিখিত হইত। বর্ত্তমানে শাস্ত্রালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি (যদিও প্রায় সব ক্ষেত্রেই আগাছার জন্ম), রসনা ও হস্তের কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি এবং যশোলিপ্সা। ফল—

ষড়্‌দর্শন মহাকূপে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে।
পরমার্থং ন জানন্তি দর্ব্বী পাকরসং যথা॥

দুর্ব্বার গর্ব্ব।

(শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়)

অঙ্গ মলিন ধূলিতে মোর
মাটীর সঙ্গে মিলে।
তাইতে কিগো যাওগো চলে
চরণতলে দলে॥
"মানুষ তুমি," দীনের কদর
বুঝবে কেমন কো'রে।
"দেবতা যিনি," রাখেন আমায়
আদর কোরে শিরে॥

বিবেকানন্দ।

(শ্রীপ্রমথনাথ সিকদার তত্ত্বনিধি, বি, এল্)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভগবান বুদ্ধদেব বেদান্ত নিহিত নিত্য সত্যের উপর আপনার ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেও, তিনি পশু হননাদি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড মুক্তি বিরোধী ও ভোগমূলক বলিয়া উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন। এইজন্য তত্ত্বতঃ হিন্দুধর্ম্মের সহিত তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র পার্থক্য না থাকিলেও হিন্দুগণ তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধের মহত্ত্বে সমগ্র হিন্দুসমাজ মুগ্ধ, তাঁহার প্রেমে বৌদ্ধ-হিন্দুগণ সমভাবে আকৃষ্ট। তিনি হিন্দুসমাজে বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে সর্ব্বজন সম্মতিক্রমে গৃহিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দুর পরম উপাস্য বিষ্ণুর সহিত তাঁহার একত্ব স্বীকার করিয়াও হিন্দুগণ তৎপ্রচারিত ধর্ম্মকে হৃদয়ে স্থান দান করিতে পারেন নাই।

হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে লইয়া কিরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত কল্কিপুরাণের উদ্ধৃত বাক্য হইতে দেখান যাইতেছে।

পুনরিহ বিধিকৃত বেদধর্ম্মানুষ্ঠান-বিহিত-নানাদর্শন সংঘৃণঃ সংসার কর্ম্ম ত্যাগ বিধিনা ব্রহ্মাভাসবিলাস চাতুরীং প্রকৃতি বিমান নাম সম্পাদয়ন্ বুদ্ধাবতারস্তমসি।

অধুনা কলিকুলনাশাবতারো বৌদ্ধ পাষণ্ড ম্লেচ্ছাদিণাঞ্চ বেদধর্ম্মসেতু পরিপালনায় কৃতাবতারঃ কল্কিরূপেণাস্মান্ স্ত্রীত্বনিরয়াদুদ্ধৃতবানসি তবানুকম্পাৎ কিমিহ কথয়ামঃ॥

পুনর্ব্বার আপনিই বিধাতৃবিহিত বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে নানাপ্রকার ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়াপ্রপঞ্চ পরিহার করিবার উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধ অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন নাই।

এক্ষণে আপনি কলিকুল ধ্বংসের নিমিত্ত এবং বৌদ্ধ পাষণ্ড ম্লেচ্ছ প্রভৃতির শাসনের জন্য কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিক ধর্ম্মরূপ সেতু রক্ষা করিতেছেন।

অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন, কল্কিপুরাণকারীর দশা দেখিলেন, দেখিলেন, কি কুসংস্কার ও অনুদারতার পূর্ণ পরিচয়? লেখক একবার বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বলিতেছেন আবার পরক্ষণেই বুদ্ধভক্ত-বৌদ্ধ বিনাশক কল্কিরূপে সেই বুদ্ধ দেব অথবা ভগবানকে স্তুতি করিতেছেন।

এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় হয় নাই। সেই হেতু বলিয়াছি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারক, রামকৃষ্ণ যদি বিভিন্ন ধর্ম্মে বিদ্যমান দোষসমূহ প্রকাশিত করিতেন তবে সমন্বয় বিরোধে পরিণত হইত। তাঁহাকে এই সমন্বয় কার্য্যের জন্য যে যে পন্থা ও যে যে অবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে সেই সেই পন্থা ও অবস্থার অবলম্বন তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের অন্তরায়রূপে কার্য্য করিয়াছে। এই জন্য তাঁহার সাধক ভাবাদির আলোচনা করিয়া লোকে তাঁহাকে একজন অসামান্য ভক্ত বলিয়াই মনে করে। অনেক লোকে বুঝিতে পারে না তাঁহার নানাবিধ ভাব সাধনাদি সিদ্ধির জন্য নহে, আপনার নিজের জন্য নহে, লোকশিক্ষার জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহুকাল সাধনা করিয়া মহাপুরুষদিগেরও যে অবস্থা লাভ করা সুকঠিন, বিনা সাধনায় অতি সাধারণ অবস্থায় এবং বাল্যকালে তিনি সেই অবস্থা উপলব্ধি করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের ন্যায় অনন্যমুখী কৃষ্ণপ্রেমের স্রোতে ভাসিয়া জগতকে মুগ্ধ করেন নাই। মানুষ শ্রীচৈতন্যের অভ্যন্তরে প্রেমের যে অদ্ভুত ও অলৌকিক স্ফুরণ অনুভব করিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যন্তরে সেইরূপ প্রেমের বিকাশ অনুভব করে নাই। যদি তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের প্রেমলীলার ন্যায় লীলায় মগ্ন থাকিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিতে হইত তবে আর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ভাবের পূর্ণাভিব্যক্তি সম্ভব হইত না। বৈজ্ঞানিক যুগে শাস্ত্রীয়যুগের ন্যায় কেবল মাত্র ভাব প্রবণতা দ্বারা অপ্রস্তুত হৃদয় মানবমণ্ডলীকে মুগ্ধ করা কখনই সম্ভব নহে। মানুষের জাগতিক প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সহিত

মহাপুরুষ বিশেষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলে অথবা সামঞ্জস্য আছে তাহা না বুঝিলে কখনই তাহা সর্ব্ব সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে না। এই সকল কারণে তিনি যে মহাসত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র তাহাই প্রচার করিলে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা শত গুণে অধিক হইতে পারিত কিন্তু তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। বর্ত্তমানকালে এই ভারতবর্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানবসকল যে ভাবে একত্রিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্য্যের সময়ে সেইরূপ মহামানবের সম্মিলন ভারতভূমিতে সংঘটন হয় নাই। এই বিশ্বমানবের সম্মিলন জন্য বর্ত্তমান যুগ অভ্রান্ত সত্য প্রচার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ব্যতীত সকল ধর্ম্মমতের লোকের সম্মুখে সত্যপ্রচারের চেষ্টা করিলে প্রচারিত সত্য হয়ত সম্প্রদায় বিশেষের মতের প্রতিকূল হওয়ায় আরব দেশের ন্যায় প্রেমবন্যা প্রবাহের উপলক্ষ্য করিয়া রক্তবন্যা প্রবাহিত হইবার কারণরূপে পরিণত হইত। বিশ্বমানবের হৃদয়ে সত্য গ্রহণোপযোগী সাম্যভাব, উদারতা ও জিজ্ঞাসুভাবের বীজবপন করাই শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। মানব হৃদয়রূপ অসমন্বয় ক্ষেত্রসমূহ যেন সমন্বয়রূপ যন্ত্রের সাহায্যে সমতল ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী করিয়া গঠিত করা হইয়াছে। যে মানদণ্ডের দ্বারা মানুষ বুদ্ধ, চৈতন্য ও শঙ্করাচার্য্যকে মাপিয়া থাকে রামকৃষ্ণের পরিমাণের জন্য সেই মানদণ্ড প্রযুক্ত হইলে রামকৃষ্ণের স্বরূপ ও মহিমা বোধ করা কখনই সম্ভব হইবে না, এবং এই জন্যই বুদ্ধ, চৈতন্য অথবা শঙ্করাচার্য্যকে মানুষে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে ও হৃদয়ের যে স্থানে উহাঁদিগকে আসন দান করিয়াছে রামকৃষ্ণকে সেস্থানে আসন দান করিতে পারে নাই। যাঁহারা এই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় কারকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তাঁহারাই রামকৃষ্ণ হৃদয়ের বিশ্বব্যাপী প্রসারতা দেখিয়া মুগ্ধ ও তৎ পদাশ্রিত হইয়াছেন।

তাঁহার মাতৃভাবের উপাসনাবলম্বনও মানব হৃদয় প্রস্তুত কার্য্যের প্রধানতম সহায়। দেশে মাতৃভাবের অথবা কামহীন ভাবের একান্ত

অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। মাতৃভাবের ভিতর দিয়া অগ্রসর না হইলে কখনই প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এই জন্যেই বিশ্বমানবকে প্রেমরস আস্বাদন করাইতে হইলে এবং মানবের অপূর্ণতা দূর করিয়া উপযুক্ত করিয়া গঠন করিতে হইলে সমগ্র মানব সমাজে যে ভাবের অভাব সেই মহাভাবকে জগতে আবির্ভূত করান একান্ত আবশ্যক। এইজন্যই বিশ্বমানব জীবনের কেন্দ্র স্বরূপ রামকৃষ্ণের জীবনের অভ্যন্তর দিয়া মাতৃভাবরূপ মহাভাব জগতে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের সর্ব্বপ্রধান অপূর্ণতা ও অভাব দূর করিয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনাসমূহ হইতে বুঝা যাইতেছে রামকৃষ্ণ লীলা অপূর্ণ; কারণ রামকৃষ্ণ লীলায় বিশ্বমানবের হৃদয় সত্য গ্রহণোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইলেও সত্য প্রচার কার্য্য সম্যক্‌রূপে সংসাধিত হয় নাই। আমরা দেখাইয়াছি প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত দোষ উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক মাত্র মূল সত্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার জীবনে সম্ভব ছিল না। ইহা সম্ভব করিতে হইলেও তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের বিরোধী হইয়া পড়িত।

তিনি বলিয়া গিয়াছেন "আবার আমাকে জন্মাতে হবে জানি কি না, জন্মাবার উপযুক্ত এক আধটা বাসনা রেখে দিয়েছি"। এই বাক্য হইতেও আমরা বুঝিতে পারি তাঁহার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার মহালীলার আংশিক অভিনয় শেষ হইলেও পূর্ণ অভিনয় সম্মুখে। এই সকল কারণে তাঁহার লীলাকে আমরা গুপ্তলীলা বা অপ্রকাশ লীলা নাম দিতে পারি। তাঁহার অতীতলীলা প্রকটলীলা হইলে অনুপযুক্ত ও অপ্রস্তুত মানব হৃদয় উহার মাধুর্য্য ও মহিমা কখনই উপলব্ধি করিতে পারিত না। তাঁহার অতীত লীলা প্রকট হইলে উহা উষর ক্ষেত্রে বীজবপনের ন্যায়, "উলুবনে মুক্তা ছড়ানর মত" সম্পূর্ণ বিফল হইত। তিনি তাঁহার সত্যস্বরূপ বা বিশেষত্ব উপলব্ধি করাইতে আসেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন মানব মণ্ডলীতে সাম্যভাব ও উদারতা প্রচারের জন্য একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। তাঁহার এই সকল কার্য্য হইতে ও ভাব হইতে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে

কোন্ অংশ অভিনয় করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরা জানিতে পারি শুদ্ধ চৈতন্য, মহাপ্রেম অথবা পূর্ণতম আনন্দকে স্থূল জগতে আকর্ষণ করিবার সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যেমন অদ্বৈত মহাপ্রভু, শ্রীচৈতন্যকে স্থূল জগতে আনয়ন করিয়াছিলেন তেমনই বিশ্বের মহামোক্ষ-দাতৃ শক্তিকে এই স্থূল জগতে আকর্ষণ করা ও তদুপযোগী করিয়া জগতকে প্রস্তুত করাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র করণীয়। রামকৃষ্ণ-জীবনের সুবিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন এই যে মস্তক ও হৃদয়ে যে সম্বন্ধ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দে সেই সম্বন্ধ। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক তনয়। রামকৃষ্ণ ব্যতীত বিবেকানন্দ অথবা বিবেকানন্দ ব্যতীত রামকৃষ্ণের জীবনের আলোচনা অপূর্ণ প্রসঙ্গ।

রামকৃষ্ণের ভিতরে যাহা ভাব-রূপে বর্ত্তমান বিবেকানন্দের ভিতরে তাহা কার্য্যরূপে প্রকাশিত। আমরা বিবেকানন্দ কর্তৃক জীবনের যে অভিনয় আদর্শ দেখিতে পাই তাহার মূল প্রস্রবণ রামকৃষ্ণ। বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্য, জগতের মুক্তিকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও জীবের জন্য ঐ আদর্শ প্রচার করেন নাই, অথবা প্রচার করিলেও বিবেকানন্দের ন্যায় পরিস্ফুট ভাবে প্রচার করেন নাই। জগতের সকল জীবের মুক্তিতে আমার মুক্তি, সকলের মুক্তি প্রত্যেকের মুক্তি। ব্যক্তিগত মুক্তি অথবা ব্যক্তিগত ভাবে ভগবানের প্রেম লাভ অতি ক্ষুদ্র আদর্শ; এই সত্য ও এই ভাব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট করান। তাই বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন আপনার মঙ্গল, আপনার কল্যাণ বা আপনার মুক্তি আমরা সম্পূর্ণ-ভাবে বিস্মৃত হইয়া জগতের কল্যাণ ও জগতের মুক্তি আমাদের লক্ষ্য—ইহাই প্রত্যেকের আদর্শ হওয়া উচিত।

শঙ্কর প্রচারিত অদ্বৈত-বাদ ব্যক্তিগত মোক্ষকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, অদ্বৈতবাদিগণ জগতে সত্য প্রচার কার্য্যকে জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বরং উহাতে জগতের উপর আকর্ষণ আসিতে পারে বলিয়া উহা হইতে দূরে থাকিবারই উপদেশ দিয়াছেন; জগতে সত্য প্রচার জগতকে মায়া জ্ঞান করার

বিরোধী বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত-বাদের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম সত্য হইলেও জগত সত্য বিরোধী নহে। জগত ক্ষুদ্রতর সত্য। শঙ্কর প্রচারিত মায়াবাদ শঙ্কর পথাবলম্বী সন্ন্যাসিগণের হস্তে পতিত হইয়া জাগতিক কার্য্যের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের যে বিরোধ উৎপাদন করিয়াছিল, বিবেকানন্দ প্রচারিত অদ্বৈতবাদ সেই বিরোধ-খণ্ডন করিয়া জাগতিক কার্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এবং নিজের জীবনেও উহার দৃষ্টান্ত দিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ জীবনে বিশ্বের সহিত একত্ব অনুভূত হইয়াছিল। আর এই অনুভূতির অভিব্যক্তি বিবেকানন্দ প্রচারিত অভিনব বিশ্ব প্রেমোৎপাদক অদ্বৈতবাদ। রামকৃষ্ণ জীবনে যে ভাব বিশ্ব-মাতার প্রতি ভক্তিরূপে বর্ত্তমান বিকানন্দের ভিতর সেই ভাব বিশ্ব-মাতার বহু মূর্ত্তির বা বহু সন্তানের বিশেষতঃ অক্ষম দরিদ্র ও অন্ধ-রূপ বিশ্ব বা বিশ্ব সন্তানের পূজায় পর্য্যবসিত। রামকৃষ্ণের অভ্যন্তরে যে ভাব অমূর্ত্তরূপে বর্ত্তমান বিবেকানন্দে সেই ভাব মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে, এক চৈতন্য শক্তি যেন কার্য্যের সুবিধার জন্য এক দেহের পরিবর্ত্তে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ রূপ যুগল দেহের ভিতর দিয়া যুগপৎ কার্য্যকরী—হইয়াছে। রামকৃষ্ণের যে অবস্থা তাহা বেদান্তের লক্ষ্য, বেদান্তের প্রাণ, বেদান্তের উপাস্য। আর বিবেকানন্দ সেই অবস্থার প্রচারক, উপাসক, স্থূল মূর্ত্তি। রামকৃষ্ণ উপাস্য দেবতা, আর ঐ উপাসনার মন্ত্র বিবেকানন্দ ব্যতীত রামকৃষ্ণ জগতে অবতরণ অথবা চৈতন্য ধামে অবস্থিতি সম্ভব নয় বলিয়া বিবেচিত হয়। রামকৃষ্ণে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ-প্রেমের যেরূপ একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই, বিবেকানন্দে সেইরূপ অদ্বৈতবাদ-নিরূপিত সোঽহং জ্ঞানের সহিত ভক্ত-সুলভ সেবাধর্ম্মের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই।

প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রচারক রামকৃষ্ণ-বিবে-কানন্দ নিহিত শক্তি বর্ত্তমান লীলা ব্যাখ্যার নিমিত্ত পুনর্ব্বার জগতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বধর্ম্মের অন্তর্হিত সাম্প্রদায়িক ভাব দূরীভূত করিয়া রূপক সত্যের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া ও কুসংস্কার

বিজড়িত সত্য সমূহের প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়া জগতে মহা-প্রেমের বন্যা প্রবাহিত ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর মহামিলন সম্ভব করিবেন। কল্পান্তরে ভগবান যেমন বেদ উদ্ধার করেন তেমনই কুসংস্কাররূপ জলে নিমগ্ন, দুর্ব্যাখ্যা ও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকরূপ কর্দ্দমে বিজড়িত বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ-শাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন অথবা উদ্ধার করিবেন। অনুভূতির অভাবে তন্ত্র, পুরাণ স্মৃতি ও বেদ নিহিত সত্য সকল জীবন হীন হইয়াছে। বিশেষতঃ অনুভূতিহীন পণ্ডিতগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া ঐ জীবনহীন শাস্ত্রদেহ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভানুরশ্মির আভাব যেমন পচন ক্রিয়ার সহায়ক, তত্ত্ব জ্ঞানরূপ ভানুরশ্মির অভাবও তেমনি শাস্ত্র দেহ পচনের সহায়ক, শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্য বিস্মৃত হইয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্যে লক্ষ্য না রাখিয়া এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত শাস্ত্র নিহিত সত্যের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে না পারিয়া অনুভূতি হীন পণ্ডিতগণ বন্ধনমোচক শাস্ত্র সাহায্যে মুক্তি হওয়া দূরে থাকুক বরং উদ্দেশ্য বিহীন আচার ব্যাবহারাদি বাহ্য শৃঙ্খল দ্বারা নিজেরাও শৃঙ্খলিত হইয়াছেন। এবং সমাজকেও শৃঙ্খলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। দেখিতে পাই ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিগ্রহের সম্মুখে পুষ্প ও বিল্বপত্র নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু প্রত্যেক সাধকের ছয় মাসের চেষ্টার ফলে যে সকল প্রাথমিক অনুভূতি হইয়া থাকে সেই প্রাথমিক অনুভূতি পর্য্যন্তও লাভ করিতে সমর্থ হন না। শাস্ত্রের বাহ্য ক্রিয়াকলাপে একান্ত আসক্ত এবং অভ্যন্তরীণ সাধন পদ্ধতিতে উদাসীন শাস্ত্রজ্ঞগণের এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন জড়জগতে আসক্ত ব্যক্তি-গণের উদ্ধারের জন্য সকলে আবার কাতরভাবে এস আমরা প্রার্থনা করি যেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নিহিত শক্তি, বৈদিক পশু হননাদি ক্রিয়াকাণ্ডে বিধ্বস্ত মানবের উদ্ধারক শ্রীবুদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশক শ্রীশঙ্কর ও স্মৃতিশাস্ত্র শৃঙ্খলিত মানবের উদ্ধারক প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য নিহিত শক্তির সহিত সমবেত হইয়া বিশ্বমানবের মহামিলনের যুগে জগতে মহাউদ্ধার সংসাধিত করুন।

(ঘ) (বিবেকানন্দের পরিচয় "আধ্যাত্মিকভাবে")

আমরা অবগত আছি রামকৃষ্ণদেব সমাধিমগ্ন বিবেকানন্দকে জগতের কার্য্যের জন্য, জগতের উদ্ধারের জন্য এ স্থূল জগতে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে তিনি শুদ্ধ জ্ঞানের অবতার। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য জগতের যে স্তর হইতে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি তদপেক্ষা নিম্নতর স্তর হইতে অবতীর্ণ হন নাই। আজকাল কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অবতার বলিয়াই বর্ণনা করা হয়। অনেকেই বিবেকানন্দকে শঙ্করাচার্য্যের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন এবং এই বর্ণনা দ্বারা বিবেকানন্দের অ-শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু এ প্রচেষ্টা বৃথা। আমরা বিবেকানন্দকে শঙ্করাচার্য্যের অবতার বলিয়া মনে না করিলেও ইহা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করি যে শঙ্করাচার্য্যের আসন হইতে বিবেকানন্দের আসন কোন অংশে হীন নহে। এবং বিবেকানন্দের আসন শঙ্করের আসন অপেক্ষা উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, একথা বলিতে গেলে বহু শতাব্দীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং অগণ্য সেবকমণ্ডলীর দ্বারা সেবিত শঙ্করাচার্য্যের মহিমাহানীর আশঙ্কায় তাহা বলিতে সাহস করি না। বিবেকানন্দের প্রেমসিক্ত অদ্বৈতবাদের ন্যায় অদ্বৈতবাদ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রচারকের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই। যদি অদ্বৈতবাদকে মহানির্ব্বাণবাদ বা শূন্যবাদের সহিত অভিন্নরূপে স্বীকার করা যায় তবে বুদ্ধ প্রচারিত প্রেমসিক্ত মহানির্ব্বাণতত্ত্বের সহিত মাত্র বিবেকানন্দ প্রচারিত অদ্বৈতবাদ উপমিত হইতে পারে। আমরা বিচারকালে শঙ্করাচার্য্যে যে কঠোরভাব দেখিতে পাই, বিবেকানন্দে সে কঠোরতা দৃষ্ট হয় না। অথচ বিবেকানন্দ ও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিচার দ্বারা অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে শঙ্করাচার্য্য যে যুগে আসিয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দের আবির্ভাবের যুগ এই উভয়ের তুলনা করিলে উভয়কেই যুগোপযোগী প্রচারকরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। বিবেকানন্দের যুগ শঙ্করাচার্য্যের যুগ অপেক্ষাও হীন স্তরের। বিবেকানন্দের যুগে মানবগণ যে ভাবে জড়োপাসনায় আসক্ত তাহাতে ঐ সকল

মানুষকে চৈতন্যোপাসনায় নিযুক্তকরণ কার্য্য শঙ্করাচার্য্যের করণীয় কার্য্য অপেক্ষাও কঠিনতর কর্ম্ম। পাণ্ডিত্যের বা খ্যাতির সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ইউরোপীয় হিগেল, ক্যাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বালকবৎ হইলেও পাণ্ডিত্যহিসাবে জগতে অপরিসীম খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। একাধারে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পাণ্ডিত্যের সমাবেশ শঙ্করাচার্য্যে যেরূপ দেখিতে পাই এরূপ কদাচিৎ কোনও যুগে পৃথিবীর কোন দেশে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। হিন্দুর বেদ বেদান্তাদি অখিল শাস্ত্র শঙ্করাচার্য্যের কণ্ঠস্থ ছিল। হিন্দু-শাস্ত্রজ্ঞান হিসাবে অথবা পাণ্ডিত্য হিসাবে শঙ্করাচার্য্যের স্থান বিবেকানন্দের অনেক উপরে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সংস্কৃত ভাষায় ও দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য শঙ্করাচার্য্যের যুগোপযোগী আর শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের যুগপৎ ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য ও মাতৃভাষায় অধিকার বিবেকানন্দের যুগোপযোগী। এইজন্য সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়ের পাণ্ডিত্য তুলনা করা কঠিন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বিচার কৌশলাদি ও পাণ্ডিত্য হেতু শঙ্করের খ্যাতি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ছিল। আমরা বুদ্ধদেবের প্রতি বিবেকানন্দের যেরূপ আকর্ষণ দেখিতে পাই এবং উভয়ের ভিতরে যেরূপ ঐক্য দেখিতে পাই তাহাতে শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বুদ্ধের সহিতই বিবেকানন্দের অধিক সৌসাদৃশ্য আছে এরূপ বলা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

"জানিনা সেই ঈশ্বর কেমন? ঐ যে মুল্লা চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন তাহার অর্থ কি? তোমার প্রভু কি বধির? হায়, অতি ক্ষুদ্র কীটের চরণেও যে ঘুংগুর বাজে তাহাও তিনি শুনিতে পান্। মালাই ফিরাও, তিলকই লাগাও, লম্বা জটাই বাড়াও তোমার অন্তরে শাণিত খড়্গ;—এমন করিয়া ঈশ্বর মেলে না।"—কবীর।

অন্তর্দেবতা।

(স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ)

সত্য যেখানে মূর্ত্ত রয়েছে,—
আকুল বিভোর চিত্ত থান,
প্রেরণা তাঁহারি উদ্ভূত হয়,
জাগ্রত করে মোহিয়া প্রাণ।
নিত্য সেখানে দীপ্ত যখন,
ব্যথিত দলিত যে আছ যেথান,
শাশ্বত বাণী ডাকিছে তোদেরি,
খুলিয়া দুয়ার কর আহ্বান।
রিক্ত হস্তে আয় তোরা আয়,
ভৃত্য কি তোরা শঙ্কিত মন!
আপন জিনিষ লইবি আপনি,
তবে কেন এত বিচার জ্ঞান?
জ্ঞান ভক্তি, পুণ্য প্রেম,
প্রীতি শোভা ত্যাগ, অটুট বল,
তাঁহারি দেওয়া ফিরে নে'য়া তাঁর
সকলি তাঁর তাঁহারি সকল।
ভজন সাধন, শৌর্য্য বীর্য্য,
ধর্ম্ম কর্ম্ম, সিদ্ধি মহান্,
গরিমা তাঁর, বুদ্ধি ঋদ্ধি,—
অন্তরে চা' ব্যাকুল প্রাণ!
উদ্যত হও জাগ্রত হও,
বিশ্ব মানব শোনগো শোন!
উত্থিত হও, প্রাপ্তি তরে
পূর্ণ হও হে পাইয়া দান!

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো।
২৯শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয়—,

সেদিন মহীশূর থেকে জি, জি-র এক পত্র পেলাম। দুঃখের বিষয়, জি, জি, আমাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে, তা না হলে সে চিঠির মাথায় তার অন্তত কানাড়া ঠিকানাটা আর একটু পরিষ্কার করে লিখ্‌ত। তার পর চিকাগো ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আমাকে চিঠি পাঠান বড্ড ভুল। অবশ্য গোড়ায় আমারই ভুল হয়ে ছিল—আমারই আমাদের বন্ধুদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির কথা ভাবা উচিত ছিল—তাঁরা ত আমার চিঠির মাথায় একটা ঠিকানা দেখ্‌লেই যেখানে খুসি আমার নামে চিঠি পাঠাচ্ছেন। আমাদের মান্দ্রাজ বৃহস্পতিদের বোলো, তারা ত বেশ ভাল করেই জান্‌তো যে, তাদের চিঠি পৌছিবার পূর্ব্বেই হয়ত আমি সেখান থেকে ১০০০ মাইল দূরে চলে গেছি, কারণ, আমি ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। চিকাগোয় আমার একজন বন্ধু আছেন, তাঁর বাড়ী হচ্ছে আমার প্রধান আড্ডা। এখানে আমার কাযের প্রসারের আশা প্রায় শূন্য বল্লেই হয়। কারণ, যদিও উহার খুব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে উহার আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়েছে—

(১) ভারতের খবর আমি যা কিছু পাচ্ছি, তা মান্দ্রাজের চিঠি থেকে। তোমাদের পত্রে ক্রমাগত শুন্‌ছি, ভারতে আমাকে সকলে খুব সুখ্যাতি কর্‌ছে—কিন্তু সে ত ঘরাও কথা হয়ে যাচ্ছে—তুমি জান্‌ছো আর আমি জান্‌ছি, কারণ, আলাসিঙ্গার প্রেরিত একটা তিন বর্গ ইঞ্চি কাগজের টুক্‌রো ছাড়া, আমি একখানাও ভারতীয় খবরের কাগজে আমার

সম্বন্ধে কিছু বেরিয়েছে—তা দেখিনি। অন্যদিকে, ভারতের খ্রীষ্টিয়ানরা যা কিছু বল্‌ছে মিশনরিরা তা খুব যত্ন করে সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে প্রকাশ কর্‌ছে এং বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার বন্ধুরা যাতে আমায় ত্যাগ করেন, তার চেষ্টা কর্‌ছে। তাদের উদ্দেশ্য খুব ভালরকমই সিদ্ধ হয়েছে, কারণ, ভারত থেকে কেউ একটা কথাও আমার জন্য বল্‌ছে না। ভারতের হিন্দু পত্রগুলি আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা কর্‌তে পারে, কিন্তু তার একটা কথাও আমেরিকায় পৌঁছায় নি। তজ্জন্য এদেশের অনেকে মনে কর্‌ছে, আমি একটা জুয়াচোর। একে ত মিশনরিরা আমার পিছু লেগেছে—তার উপর এখানকার হিন্দুরা হিংসা করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—এক্ষেত্রে তোমার একটা কথাও জবাব দেবার নেই। এখন মনে হচ্ছে, কেবল মাদ্রাজের কতকগুলি ছোকরার পীড়াপীড়ির জোরে ধর্ম্মমহাসভায় যাওয়া আমার আহাম্মকি হয়েছিল, কারণ, তারা ত ছোকরা বই আর কিছুই নয়। অবশ্য আমি অনন্তকালের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু তারা ত গুটি কতক উৎসাহী যুবক ছাড়া আর কিছু নয়—কাযের ক্ষমতা তাদের যে একদম নেই। আমি কোন নিদর্শনপত্র নিয়ে আসিনি আর যখন কারও অর্থসাহায্যের আবশ্যক হয়, তার নিদর্শন পত্র থাকার দরকার, তা না হলে মিশনরি ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে আমি যে জুয়াচোর নই, তা কি করে প্রমাণ করব? আমি মনে করেছিলাম, গোটাকতক বাক্য ব্যয় করা ভারতের পক্ষে বিশেষ কঠিন কায হবে না। আমি মনে করেছিলাম, মাদ্রাজে ও কল্‌কেতায় কতক-গুলি ভদ্রলোক জড় করে এক একটা সভা করে আমাকে এবং আমেরিকাবাসিগণকে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার কর্‌বার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব পাস করিয়ে সেই প্রস্তাবটা দস্তরমত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অর্থাৎ সেই সেই সভার সেক্রেটারিকে দিয়ে আমেরিকায় একখানা ডাঃ ব্যারো-জের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে তথাকার বিভিন্ন কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করা,—ঐরূপ বোষ্টন, নিউইয়র্ক ও চিকাগোর বিভিন্ন কাগজে পাঠান বিশেষ কঠিন কায হবে না। এখন দেখ্‌ছি, ভারতের পক্ষে এই কাযটা বড়ই গুরুতর ও কঠিন—এক বছরের ভিতর ভারত থেকে কেউ আমার

জন্য একটা টুঁশব্দ পর্য্যন্ত কর্‌লে না—আর এখানে সকলেই আমার বিপক্ষে! তোমরা নিজেদের ঘরে বসে আমার সম্বন্ধে যা খুসি বল না কেন, এখানে তার কে কি জানে? দুমাসেরও উপর হল আলাসিঙ্গাকে আমি এই বিষয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সে আমার পত্রের জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। আমারি আশঙ্কা হয়, তার উৎসাহ ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সুতরাং তোমায় বল্‌ছি, আগে এই বিষয়টী বিবেচনা করে দেখো তার পর মান্দ্রাজীদের এই চিঠি দেখিও। এদিকে আমার গুরুভাইরা কেশব সেন সম্বন্ধে আহাম্মকের মত বিশেষ প্রমাণ না দিয়েই নানা কথা বল্‌ছে আর মান্দ্রাজীরা থিওজ-ফিষ্টদের সম্বন্ধে আমি যা কিছু লিখ্‌ছি, তাই তাদের বল্‌ছে—এতে শুধু শত্রুর সৃষ্টি করা হচ্ছে। হায়! যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাযের লোক আমার সহায়তা কর্‌বার জন্য পেতাম! কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—আমি এদেশে জুয়াচোর বলে গণ্য হলাম। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল, কোন নিদর্শনপত্র না নিয়ে ধর্ম্মমহাসভায় যাওয়া—আশা করে-ছিলাম, অনেক আস্‌বে। এখন দেখ্‌ছি, আমাকে একলা ধীরে ধীরে কায কর্‌তে হবে। মোটের উপর, আমেরিকানরা হিন্দুদের চেয়ে লাখোগুণ ভাল, আর আমি অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীনদের দেশ অপেক্ষা এখানে অনেক ভাল কায কর্‌তে পারি। যাইহক্, আমাকে কর্ম্ম করে আমার প্রারব্ধ ক্ষয় কর্‌তে হবে। আমার আর্থিক অবস্থার কথা যদি বল্‌তে হয়, তবে বলি, আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছলই আছে এবং সচ্ছলই থাক্‌বে। সমগ্র আমেরিকায় বিগত আদমসুমারিতে থিওজফিষ্টদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ৬২৫—তাদের সঙ্গে মিশ্‌লে আমার সাহায্য হওয়া দূরে থাক্, মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার কায চুরমার হয়ে যাবে। আলাসিঙ্গা বল্‌ছে, লণ্ডনে গিয়ে মিঃ ওল্ডের সঙ্গে দেখা কর্‌তে ইত্যাদি ইত্যাদি। ওকি বাজে আহাম্মকের মত বক্‌ছে! বালক—ওরা কি বল্‌ছে, তা নিজেরাই বোঝে না। আর এই মান্দ্রাজী খোকার দল নিজেদের ভিতর একটা বিষয়ও গোপন রাখ্‌তে পারে না!! সারা দিন বাজে বকা আর যেই কাযের সময় এল, অমনি আর কাকেও কোথাও দেখ্‌বার যো নেই!!! বোকারামেরা পঞ্চাশটা লোক জড় করে কয়েকটা সভা করে আমার সাহায্যের জন্য গোটাকতক

ফাঁকা কথা পাঠাতে পার্‌লে না—তারা আবার সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দেবে বলে লম্বা লম্বা কথা কয়!

আমি তোমাকে ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে লিখেছি। এখানে এক রকম বৈদ্যুতিক পাখা আছে—দাম বিশ ডলার—বড় সুন্দর চলে—উহার ব্যাটারিতে ১০০ ঘণ্টা কায হয়, তার পর যে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে নিলেই হল।

বিদায়, হিন্দুদের যথেষ্ট দেখা গেল। এখন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্—যা আসুক অবনত মস্তকে স্বীকার কর্‌ছি এবং আমার কর্ম্মকে প্রণাম কর্‌ছি—যাই হোক্ আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না, মান্দ্রাজীরা আমার জন্য যতটা করেছে, আমি ততটা পাবারও উপযুক্ত ছিলাম না, আর তাদের ক্ষমতায় যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশী তারা করেছে। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল—ক্ষণকালের জন্য ভুলে গেছলাম যে, আমরা হিন্দুরা এখনও মানুষ হইনি—ক্ষণ কালের জন্য আত্মনির্ভর হারিয়ে হিন্দুদের উপর নির্ভর করেছিলাম—তাইতেই এই কষ্ট পেলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি ভারত থেকে কিছু আসবে আশা করছিলাম—কিন্তু কিছুই এলো না। বিশেষতঃ বিগত দুইমাস প্রতি মুহূর্ত্তে আমার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার সীমা ছিল না—ভারত থেকে একখানা খবরের কাগজ পর্য্যন্ত এলো না!! আমার বন্ধুরা মাসের পর মাস অপেক্ষা কর্‌তে লাগলেন—কিছুই এলো না—একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত এলো না—কাজেই অনেকের উৎসাহ চলে গেল ও আমায় ত্যাগ কর্‌লে। কিন্তু ইহা আমার মানুষের উপর—পশুধর্ম্মী-দের উপর নির্ভরের শাস্তি স্বরূপ—কারণ আমার স্বদেশবাসীরা এখনও মানুষ হয় নি। তারা নিজেদের প্রশংসাবাদ শুনতে খুব প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাদের একটা কথা মাত্র কয়ে সাহায্য কর্‌বার যখন সময় আসে তখন তাদের আর টিকি দেখতে পাবার যো নেই। মন্দ্রাজী যুবকগণকে আমার অনন্তকালের জন্য ধন্যবাদ—প্রভু তাদের সদাসর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করুন। কোন ভাব প্রচার কর্‌বার পক্ষে আমেরিকাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র—তাই আমি শীঘ্র আমেরিকা

ত্যাগ করবার কল্পনা করছি না—কেন?—এখানে খেতে পরতে পাচ্ছি—অনেকে সহৃদয় ব্যবহার করছেন—আর দু দশটা ভাল কথা কয়েই এই সব পাচ্ছি! এমন উন্নতমনা জাতকে ছেড়ে পশু প্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ, মস্তিষ্কহীন অনন্ত যুগের কুসংস্কারে বদ্ধ, দয়াহীন, মমতাহীন হতভাগাদের দেশে কি কর্ত্তে যাব? অতএব আবার বলি বিদায়। এই পত্রখানি একটু বিবেচনা করে লোককে দেখাতে পার। মান্দ্রাজীরা এমন কি আলাসিঙ্গা পর্য্যন্ত যার উপর আমি এতটা আশা করেছিলাম—বড় সুবিবেচনার কাজ করেছে বলে মনে হয় না। ভাল কথা, তুমি মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত খান কতক চিকাগোয়ে পাঠাতে পার?—কলকেতায় অনেক আছে। আমার ৫৪১নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ (ষ্ট্রীট নহে) চিকাগো অথবা c/o টমাস কুক, চিকাগো, ঠিকানা যেন ভুলোনা—অন্য কোন ঠিকানা দিলে অনেক দেরি ও গোলমাল হবে—কারণ আমি এখন ক্রমাগত ঘুরছি আর চিকাগোই আমার প্রধান আড্ডা—কিন্তু এই বুদ্ধিটুকুও আমাদের মান্দ্রাজী বন্ধুদের মাথায় ঢোকে নি। অনুগ্রহপূর্ব্বক জি, জি, আলাসিঙ্গা সেক্রেটারি ও আর আর সকলকে আমার অনন্তকালের জন্য আশীর্ব্বাদ জানাবে—আমি সর্ব্বদা তাদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি তাদের উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নি—আমি নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি জীবনে এই একবার অপরের সাহায্যে নির্ভর করা রূপ ভয়ানক ভুল করেছি। আর তার শাস্তি ভোগও করেছি। এ আমারই দোষ, তাদের কিছু দোষ নাই। প্রভু মান্দ্রাজীদের আশীর্ব্বাদ করুন—তাদের হৃদয়টা বাঙ্গালীদের চেয়ে অনেক উন্নত। বাঙ্গালীদের কেবল বাক্য সার—তাদের হৃদয় নেই, তারা অসার। বিদায়, বিদায়, আমি এখন সমুদ্রবক্ষে আমার তরণী ভাসিয়েছি—যা হবার হোক। আমার কঠোর সমালোচনার জন্য আমাকে ক্ষমা কোরো। বাস্তবিক ত আমার কোন দাবি দাওয়া নাই। আমার যতটা পাবার অধিকার তোমরা তার চেয়ে অনন্তগুণ আমার জন্য কোরেছো। আমার যেরূপ কর্ম্ম, আমি তেমনি ফল পাব আর যা ঘটুক আমাকে চুপটী

করে মুখ বুজিয়ে সয়ে যেতে হবে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—আমার বোধ হয় আলাসিঙ্গার কলেজ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আমি তার কোন খবর পাই নি আর সে আমাকে তার বাড়ীর ঠিকানাও দেয় নি।

ইতি—বি

আমার আশঙ্কা হচ্ছে—বুঝি পুনর্মূ‌র্বিক হয়েছে।

বি

" বর্ষায় বাড়িয়া বনলতা,
উচ্চে উঠে দেবদারু বাহি' ;
'কত হ'ল বয়ঃক্রম তব ?'
জিজ্ঞাসে তরুর মুখ চাহি'।
তরু কহে 'বর্ষ দুই শত,—
মাস ছয় এদিক্ ওদিক্।'
লতা বলে 'এতে বৃদ্ধি এই !—
সপ্তাহে যা' হ'ল মোর ঠিক !'
তরু বলে 'বাঁচ আগে শীতের তুষারে,
আয়ু ও বুদ্ধির কথা হ'বে তার পরে।' "

—খুশ্‌হাল্।

স্বপ্নভঙ্গ।

(প্রতিবাদ)

(শ্রীঅজিতনাথ সরকার।)

গত বৈশাখ ও আষাঢ় মাসের 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র দত্ত বি, এ, 'স্বপ্নভঙ্গ' শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের কিছু বলিবার ও বুঝিবার আছে তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা। তিনি যে বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা অতি গুরুতর বিষয়, এক কথায় মীমাংসা হইবার নয়। সমাজ সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতেই বোধ হয় ঐরূপ মতদ্বৈধ চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মাচলে উঠিবার পথ অসংখ্য এবং প্রত্যেক পথই মহাজনদিগের দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন যাহার পক্ষে যাহা ভাল বলিয়া বোধহয় তাহার পক্ষে তাহাই অবলম্বনীয়, অন্যথা তাহাতে প্রাণের টান থাকিবে না এবং প্রাণের টান না থাকিলে তাহা বিফল প্রয়াসে পর্য্যবসিত হইবে। আরও এককথা—যদি কেহ ধর্ম্মভ্রমে অধর্ম্মের পথে চলিতে থাকে, তাহাতেই তাহার প্রাণের টান থাকে; কেউ কি তীব্র কশাঘাত দ্বারা তাহার সে পথ চলা বন্ধ করিতে পারে? কথনই না। যদি কাহাকেও সৎপথে আনিতে হয় মৃত্যু হইতে জীবনের দিকে চালাইতে হয়,—তবে পথপ্রদর্শককে অগ্রবর্ত্তী হইতে হইবে এবং তাহার সকল ক্রটী উপেক্ষা করিয়া স্নেহভরে ডাকিয়া আপন পথে টানিয়া লইতে হইবে। সেটান যেন তাহার গতিপথ পাষাণ স্তূপের ন্যায় রুদ্ধ না করে, পরন্তু তাহার গতির সহায় হয় এবং উহা আরও সহজ ও সরল করিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে অদৃশ্য প্রেম বন্ধনের স্বরূপ হয়।

হেমবাবু প্রথমেই লিখিয়াছেন:—"বাঙ্গলাদেশের আবহাওয়ায় এমনি একটা কি আছে যে, তাতে কেবল করুণ সুরটাই বেশী ক'রে বেজে উঠে"। এটা খুব সত্যকথা—বাঙ্গালী জাতি চিরদিনই ভাব

প্রবণ ভাবের উচ্ছ্বাসে সহজেই মাতিয়া উঠে। আর সেই জন্যই এখানে নিত্য নূতন ভক্ত ও কবির সৃষ্টি হইতেছে। কারণ ভাবের উচ্ছ্বাস না থাকিলে কাহারও ভিতর হইতে কবিতা বাহির হয় না। এবং কাহারও হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হইবার আগেও ভাবের উচ্ছ্বাস অর্থাৎ একটা কিছু পাইবার ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে। তাহা হইতেই ক্রমে সাধনার দ্বারা ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে যে একটা করুণ সুর বাজিয়া উঠিবে সেটা বোধহয় নিতান্ত স্বাভাবিক। করুণ সুর না বাজিয়া উঠিলে এখানে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কবিতারূপ নন্দনকাননের সৃষ্টি সম্ভব হইত না। আবার এদেশের আবহাওয়ায় করুণসুর না বাজিলে চৈতন্য দেবের ন্যায় প্রেমাবতার কিরূপে এই বঙ্গদেশকে পবিত্র প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিয়া আচণ্ডাল ভদ্রকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়া বক্ষে টানিয়া লইতেন তাহাও বুঝিলাম না। হেমবাবু এখানে 'করুণসুর' বাজার কথা যে ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন—তাহার সরলঅর্থ—বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ঐ সুর বাজা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। অতএব তাঁহার মতে তবে কি বাঙ্গলা দেশের জগদ্বিখ্যাত ভক্ত কবিকুলের উৎপত্তিও অন্যায় হইয়াছে? তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন :—"তা তুমি যতই যা বল ঐ করুণ সুরটার মত মারাত্মক জিনিষ আর একটা কোথাও দেখি নাই, বিশেষতঃ ধর্ম্মে কর্ম্মে"। তাঁহার মতে ধর্ম্মে কর্ম্মে করুণ সুর নিতান্ত অন্যায়, যেখানে বাজবে কেবল টন্‌টনে কঠোর সুর। ধর্ম্মে কর্ম্মে হৃদয়কে কোমল করিবার কিছুই আবশ্যক নাই, তাহা বজ্রের ন্যায় কঠিন হইবে তবে ভগবানের মন্দিরে প্রার্থনার অধিকার জন্মিবে। তাঁহাকে ডাকিতে হৃদয়ের ব্যাকুলতা, নয়নের অশ্রুরও কোন দরকার নাই; তেজোগর্ব্বিত সুরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে হইবে। এই কি? তারপর তিনি বলিতেছেন—"ঐ সুরের আতিশয্যেই যত ভাব প্রবণতা, যত উৎপেতে ভক্তির পথে ঝোঁক্"। ভক্তি আবার উৎপেতে কিরূপ হয় তাহা বুঝিতে আমরা একেবারেই অসমর্থ। শাস্ত্রে ভক্তির লক্ষণ অনেক প্রকারই আছে

বটে, কিন্তু তার মধ্যে 'উৎপেতে' ভক্তির লক্ষণ কখনও আমাদের নজরে পড়ে নাই। যে কোন রকম ভক্তি হউক না কেন করুণ সুর হইতেই তাহার উৎপত্তি। যে অতি নীচ শ্রেণীর ভক্ত, সে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি হইতে অসীম ব্যবধানের অন্তরালে আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যার হৃদয়ে করুণ সুর বাজে সে নিজের ভাবেই নিজে মত্ত থাকে কখনও কাহারও উপর বিশেষ উৎপাত করে বলিয়া ত মনে হয় না। বরং অনেক তেজস্বী কর্ম্মবীর অনেক সময় দেশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়া অনেককে জড়াইয়া সেই আগুণে ঝাঁপ দেয় এবং পুড়িয়া মরে। নিরীহ ভক্ত হয়ত অকূল সাগরে হাবুডুবু খায়, কিন্তু নিজেই—কাহাকেও সঙ্গে জড়ায় না। তারপর হেমবাবু কীর্ত্তন, হরিনাম ইত্যাদির উপর কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন,—"গাঁয়ে গাঁয়ে কীর্ত্তনের ধূম লেগেই আছে। উচ্চরোলে কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত লম্ফন, কুর্দ্দন, ক্রন্দন বা অশ্রুবর্ষণ, এরও অভাব নাই"। এটাও কি খুব খারাপ? হইতে পারে ইহার মধ্যে প্রকৃত ভক্তির লেশমাত্রও নাই, তার পরিবর্ত্তে আছে ভাবের একটা ক্ষণিক উন্মাদনা; কিন্তু তাহা হইলেও ধর্ম্মের বা ভক্তির কৃত্রিম অভিনয়ও ত অনেকটা ভাল! কারণ হুজুগে পড়িয়া সকলের সঙ্গে ভক্তির অভিনয় করিতে গিয়া অনেকের হৃদয়নিহিত ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বা স্বপ্নাতীত ঘটনা নহে। অতি হীন জীবঘাতী ব্যাধও ভক্তের বেশভূষা মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। লেখক অনেক স্থলেই স্বামিজীর দোহাই দিয়াছেন। উত্তম কথা আমরাও স্বামিজীর দোহাই দিয়াই বলিব, যে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা স্বামিজীর হৃদয়ের একমাত্র কামনা ছিল, জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল, তাহা তাঁহার হৃদয়ের কোন্ সুরের স্পন্দনে? কোন্ সুরের মূর্চ্ছনায় আত্মহারা হইয়া স্বামিজী দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন? করুণ—না কঠোর? তা' ছাড়া ঐ 'গাঁয়ে গাঁয়ে কীর্ত্তনের ধূম' (যদিও উহা হৃদয়হীনদিগের তাণ্ডব নৃত্য) হইতে কত দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হয় তাহা কি তিনি জানেন না? মানুষ যাহাতে একটু আনন্দ অনুভব করে সেই দিকেই

চলিয়া পড়ে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের চরম সফলতা একমাত্র প্রকৃত স্থায়ী আনন্দকে লাভ করার মধ্যে। অতএব যদি কেহ নিতান্ত নীতি-বিগর্হিত কাজ না করিয়া আত্মানন্দের ক্ষণিক আংশিক ভাবও অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? বরং এই ক্ষণিক আনন্দের উত্তেজনায় তাহারা অনেক মহৎ কাজও করিয়া ফেলিতে পারে; যদি পিছনে শক্তি যোগাইবার কেহ থাকে। তাহাতে ত কাহারও সর্ব্বনাশ হইবার কোন আশঙ্কা নাই? তারপর তিনি আবার বলিয়াছেন—"কিন্তু বেশ করে' খুঁজে দেখ মজা দেখ্‌বে, ঐ অশ্রু বর্ষণ হরিনামের সঙ্গে হচ্ছে সন্দেহ নাই; কিন্তু ওর পিছনে রয়েছে হয় ত দারিদ্র্য জ্বালা, কারও পুত্র-বিয়োগজনিত অন্তর্দাহ অথবা এমনি একটা কিছু তীব্র যন্ত্রণা"। এত অতি বড় খাঁটি কথা। তীব্র যন্ত্রণা পিছনে না থাকিলে ব্যাকুলতা আসিবে কোথা হইতে? অশ্রুই বা আসিবে কোথা হইতে? আবার তেজঃ গর্ব্বই বা আসিবে কোথা হইতে? শিখ মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল কিরূপে? পিছনে অত্যাচার জনিত তীব্র বেদনা ছিলনা কি? আবার এই করুণ সুরে আত্মহারা বাঙ্গালী জাতিই বা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল কিরূপে? পিছনে তীব্র যন্ত্রণা ছিলনা কি? বর্ত্তমানে আব্রহ্মহিমানী ভারত গগনে যে মাতৃমন্ত্রের মৃদু কোলাহলে ছাইয়া পড়িয়াছে—ইহা কিসের জন্য? পিছনে দারিদ্র্য জ্বালা, অথবা পুত্রশোকের করুণ মর্ম্মস্পর্শী কাতর ক্রন্দনের রোল এবং তজ্জনিত তীব্র বেদনা নাই কি? তীব্র বেদনা যখন হৃদয়ের অন্তস্তলে দারুণ আঘাত করে, তখনই মানুষের প্রাণে একটা তীব্র ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে; এবং কখন গণ্ড বহিয়া অশ্রু-বন্যা ছুটিতে থাকে, আবার কখন আত্মাভিমানের অদম্য প্রেরণায় হৃদয় মাতিয়া উঠে। যশঃ, মান, ধন, প্রাণ সব তুচ্ছ হইয়া যায়। তখন সে একেবারে বিপুল কর্ম্ম-সাগরে লাফাইয়া পড়ে; কাহারও কথা শুনে না, কাহারও বাধা মানে না, পিছনে ফিরিয়া তাকায় না। অতএব অশ্রুই হউক, করুণ সুরই হউক, অথবা আত্মাভিমানই হউক, হৃদয়ে জাগিবার সময় পিছনে একটা তীব্র বেদনা থাকা স্বাভাবিক। করুণ সুর কি বীর হৃদয়েরও ভূষণ নয়? দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজেণ্ডার

বন্দি শত্রুর তেজোগর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া যখন তাঁহাকে স্নেহভরে বক্ষে টানিয়া লইয়াছিল, তখন তাহার হৃদয়ে কোন্ সুর বাজিয়াছিল ?—করুণ—না কঠোর ? যদি বলি তিনি বীর ছিলেন তাই বীরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু মুগ্ধ হয় মানুষ কোন্ সুরে জানি না। এক্ষণে স্বামিজীর ভাষায় দরিদ্র-নারায়ণের সেবার কথাই যদি ধরা যায় ;—তবে দরিদ্র-নারায়ণের সেবারূপ মহা সাধনার শক্তি আমরা কোথা হইতে পাইব ? তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতে কে জাগাইয়া দিবে ? প্রথমতঃ হয়ত আমি তাহাদের দুঃখ কষ্টের দারুণ জ্বালা আপন হৃদয়ে অনুভব করিয়া প্রতিকারার্থে ব্যাকুল হইয়া উঠিব, কিম্বা লেখকের "হুজুগে ধর্ম্মে যোগ" দেওয়ার ন্যায় সেবাব্রত গ্রহণ করিব। কিন্তু যে ব্রতে আন্তরিকতা নাই সে ব্রত সুচারুরূপে সম্পন্নই বা হইবে কিরূপে ? কবি বলেন "চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদনা বুঝিতে পারে ? কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥" মানুষ যতদিন তীব্র বেদনায় জর্জ্জরিত না হয় ততদিন সে অপরের বেদনা বুঝিবে কিরূপে ? করুণ সুরই বা বাজিবে কিরূপে ? আবার বেদনার অনুভূতি যদি না থাকিল, করুণ সুর যদি না বাজিল, তবে দরিদ্র নারায়ণের সেবাব্রত গ্রহণ করা তাহার পক্ষে একটা সথ বা হুজুগ ছাড়া আর কি হইতে পারে ? তাই তীব্র বেদনা পিঁছনে লইয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইয়া যাওয়া—করুণ সুর বাজিয়া উঠা অথবা অশ্রুবর্ষণের প্রতি হেম বাবুর ন্যায় তীব্র কটাক্ষপাত করিতে আমরা অনিচ্ছুক। তিনি ওটাকে যত মারাত্মক বলিয়াছেন তত মারাত্মক মোটেই হইতে পারে না এই আমাদের ধারণা।

যদি মানুষের জীবনের চরম পরিণতি বা সফলতার জন্য ভক্তি বলিয়া কোন পথ থাকে, তবে তাহার সাধনা কিরূপে আরম্ভ হইবে ? প্রহ্লাদের ন্যায় অহৈতুকী ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত করিয়া কয়জন সংসারে জন্মগ্রহণ করে ? যদি ভক্তি বলিয়া কোন পথ থাকে, তাহার দ্বারা পূর্ণ মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবানকে পাইবার কোন

উপায় থাকে, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহার একটা হেতুও থাকিবে। মানুষের প্রাণ স্বভাবতঃ যশ, মান, ধন, বন্ধু প্রভৃতি আরও নানারূপ সুখোপকরণ পাইবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল; এবং উহাই যদি সাধারণ মনুষ্য জীবনের স্বভাবতঃই কামনার জিনিষ হইল তবে সেত তাহা পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেই! যদি সে তাহা না পায়, অথবা তাহার প্রাপ্ত ধন সহসা অন্তর্হিত হয়, তখন তাহার হৃদয় তাহা পুনঃ প্রাপ্তির আশায় দ্বিগুণতর ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। যোগ বা প্রাপ্তির দ্বারাই মানুষের হৃদয়ে আনন্দ জাগিয়া উঠে, আবার বিয়োগ বা বিচ্ছেদ দ্বারাই হৃদয়ে আকুলতা ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ মানুষ জন্মের পর হইতেই, কি যেন একটা হারান ধন পাইবার জন্য অল্প অল্প ব্যাকুলতা অনুভব করিতে থাকে, এই ব্যাকুলতাই মানুষের অতৃপ্তির একমাত্র কারণ। সে যাহা পায় কিছুতেই আশা মিটে না। তাই নিঃস্বম্বল পথের ভিখারী লক্ষপতি হইলেও তাহার পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, বরং তাহার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে।—কেন এরূপ হয়? কারণ তাহার হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে সুপ্ত মানব প্রকৃতি তাহার স্থূল দৃষ্টির ও অনুভূতির অন্তরালে যাহা চাহিতেছে তাহা পাইতেছে না তাই পার্থিব নশ্বর ধন প্রচুর পাইয়াও এত অতৃপ্তি এত আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাহার পর বিয়োগ বা বিচ্ছেদের জন্য যখন তাহার পাইবার আশা প্রায় বিলীন হইয়া যায়, তখনই সে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অসারতা অনুভব করিয়া আর একটা কি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন তাহার হৃদয়ে বিয়োগ জনিত করুণ সুরের সঙ্গে সুপ্ত মানব প্রকৃতির চির আকাঙ্ক্ষিত অদৃশ্য হারান ধনকে পাইবার ব্যাকুলতা মিশিয়া যায়, এবং সেই সম্মিলিত শক্তি প্রেরণা তাহাকে মরু প্রান্তস্থিত দারুণ পিপাসাকুল পথিকের ন্যায় চির স্নিগ্ধ ভক্তিবারি অন্বেষণে বেগে চালনা করিতে থাকে। ক্রমে সেই ব্যাকুলতাও প্রবল হইতে থাকে।

তাহার পর যখন এই হৈতুকী ব্যাকুলতা ক্রমে ভাগবদ্ভক্তির স্নিগ্ধ আরামপ্রদ মৃদুস্পর্শে নূতনত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই হারান ধনকে, তাহার

স্থূল দৃষ্টির অন্তরালস্থিত আজন্ম আকাঙ্ক্ষার ধনকে যখন প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলে তখনই তাহার জন্ম জন্মান্তরের অদম্য আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। অতএব তীব্র বেদনা পিছনে লইয়া যে অশ্রুবর্ষণ, তাহা আপাততঃ অশোভনীয় হইলেও একেবারে অলীক অথবা মানুষের আত্মোন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ একথা কেমন করিয়া বলিব ?

মানুষ যখন দৈব দুর্ব্বিপাকে অনন্যোপায় হইয়া পড়ে তখনই সে সকল উপায়ের কাণ্ডারী দয়াময় হরিকে প্রাণভরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে। তখন সে আর্ত্ত ভক্ত হয়, এবং কেবল স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করে, হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে। অবশ্য শতবার স্বীকার করি, সে যখন অশ্রুবর্ষণ করে তাহার পার্থিব ধনের বিয়োগজনিত দুঃখে, তখন এই বিচ্ছেদজনিত দুঃখই তাহার ভগবানকে ডাকার হেতু হয়। কিন্তু এই হেতু ক্রমশঃ "ডাক্‌ব বিনা আশায়, ডাক্‌ব বিনা আশায়, ডাক্‌ব মুখের হাসি দিয়ে ডাক্‌ব চোখের জলে" এই অহৈতুকী ডাকায় পরিণত হয় এবং শেষে তাহা অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া হৃদয় ভরপুর করিয়া দেয়, মানব জন্ম সার্থক করিয়া দেয়। অতএব যদি দরিদ্র-নারায়ণের সেবাব্রতে কখন সফলতা আসে তবে তীব্র বেদনায় জর্জ্জরিত করুণ সুরে আত্মহারা বাঙ্গালীর দ্বারাতেও আসা অসম্ভব নয়।

আবার লেখকের মতে নবযুগ 'বিশ্বাস' চায় না। তবে কি অবিশ্বাসের উপর সমাজ ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ? আমরা গোড়ামীর পক্ষপাতী নই আবার নবযুগের নবনব বিলাস স্রোতে ভাসিয়া যাইতেও প্রস্তুত নই। "চাই আমূল সংস্কার"। কিন্তু কত প্রতিভাশালী ঋষিগণের জীবনান্ত কালব্যাপী কঠোর সাধনার ফলে যে অলৌকিক আর্য্যকীর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হঠাৎ একদিনে অবিশ্বাস করিব কেমন করিয়া ? পূজনীয় অগ্রবর্ত্তী পুরোহিতেরা তা ত বলেন না ? লেখক বেদ্ বেদান্ত উপনিষদ্ সবই মানেন ; কিন্তু আমাদের দিক্ দিয়া নয় ; তবে তিনি কোন্ দিক্ দিয়া মানেন স্পষ্ট করিয়া বলিলেই ত সব গণ্ডগোল মিটিয়া যাইত, আমরাও সেই পথ অবলম্বন করিয়া অকূলে কূল পাইতাম। লেখক পথ দেখান নাই

সকল স্থলেই একটা ঝাল মিটাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? তিনি "ঠিক্ ঠিক্" ভাবে চলিতে বলিয়াছেন, কিন্তু "ঠিক্ ঠিক্" ভাবটী যে কোন্ ভাব তাহাই যদি বুঝিব তবে আর বাকী থাকিল কি? আধুনিক ভাবের ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস ইত্যাদিকেও তিনি ফ্যাসানের মধ্যে ফেলিয়াছেন, আর প্রাচীন ভাবের ত কথাই নাই। অতঃপর কোন্পথে মানুষ ধর্ম্মের দিকে যাইতে পারে, মানুষ মানুষ নামে খ্যাত হইতে পারে সেই সোজা পথটী দেখাইয়া দিলেই ত বেশ ভাল হইত? অনাবশ্যক বাক্যাড়াম্বরের কি দরকার ছিল? দেশের তীব্র সমালোচনা অবশ্য দরকার কিন্তু দেশকাল বুঝিয়া আদর্শ সম্মুখে ধরাই মঙ্গলজনক। অবশ্য তাঁর প্রবন্ধ দরকারী, রক্ষণীয় অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু যে সকল স্থলে আমরা বিষম সন্দেহের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াছিলাম তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। বারান্তরে আরও কিছু বলিবার আশা থাকিল। আমরা জিজ্ঞাসু অতএব ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

ভারতের আদর্শ

(স্বামী নির্ব্বাণানন্দ)

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"The national ideals of India are renunciation and service. Intensify her in those channals and the rest will take care of itself."

"ভারতীয় জাতীয় জীবনের সার্ব্বজনীন আদর্শ ত্যাগ এবং সেবা। এই দুইটী দিক দিয়া ভারতীয় জীবন প্রবাহকে পরিপুষ্ট করিয়া তোল, দেখিবে আর সবদিকই আপনি আপনি উন্নত হইবে।"

ত্যাগ এবং সেবা এ কথা দুটী বড় সামান্য নহে। ত্যাগ বলিলেই মনে হয়—ইন্দ্রিয় মনের সংযম এবং পরমার্থ লাভের সাধন। সেবা

কথাটাও ঐরূপে ধর্ম্ম সাধনার গতি নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। স্বামিজীর ভাবে সেবা বহির্ম্মুখীন মনকে অন্তর্ম্মুখীন করিবেই।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"॥

এই হইল স্বামিজীর সেবার ভাব, নারায়ণ জ্ঞানে জীব সেবা। মনুষ্যত্বে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা এবং দেবতার প্রকৃতি অনুযায়ী পূজার ব্যবস্থা; তবেই সেবা পরমার্থলাভের সহায়ক এবং আস্তে আস্তে মনকে প্রবৃত্তির মোহ হইতে তুলিয়া নিবৃত্তির দিকে লইয়া যাইবে। মোট কথা ত্যাগ এবং সেবা উভয়ই ধর্ম্মতত্ত্বের গতি নির্ণয় করিয়া দিতেছে। ধর্ম্মই ভারতীয় জাতীয় জীবনের আদর্শ এবং উহার পরিপুষ্টিতেই ভারতের উন্নতি। স্বামিজীর এ কথার সত্যতা কতদূর আমরা এখন বুঝিবার চেষ্টা করিব।

স্বামীজির এ কথায় স্বভাবতই একটা আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, কারণ ধর্ম্ম দুইচার জনেরই ব্যক্তিগত সাধনার লক্ষ্য হওয়া সম্ভব, সমাজ সমষ্টিতে ঐরূপ আচরণ আকাশ-কুসুমের ন্যায় কল্পনাতেই পর্য্যবসিত থাকিবে এবং এই ধর্ম্ম সহায়ে ঐহিকতার লাভ এবং দুঃখ দৈন্যের উপশম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। উত্তরে বলিতেছি ভারতের জাতীয় সংগঠন জগতের পক্ষে নূতন ব্যাপার নহে। ভারতের এ প্রাচীনত্ব জগতের একটা জানিবার বিষয়, বুঝিবার বিষয়। কেন ভারত শত শত বৎসর ধরিয়া বিজাতী, বিদেশীর পদদলিত পদলাঞ্ছিত হইয়া আজও জাতীয়ত্বের কীর্ত্তি জগতে ঘোষণা করিতেছে! ধর্ম্মই উহার কারণ নয় কি? ধর্ম্মেই ভারতের সমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মই ভারতীয় জীবনের আদর্শরূপে নিরূপিত, ঐতিহাসিক তত্ত্ববিৎ ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকেন।

হে নব্যভারত, তুমি আজ পাশ্চাত্য মোহে অন্ধ, পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা তোমার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে; এখন তোমার আর প্রাচীনত্ব ভাল লাগিতেছে না। আপাতমধুর পরিণামে বিষময় সম্পদ নেশায় তোমার চিত্ত আকর্ষিত। এরূপ অনুকরণে তোমার সমাজ

কতদূর উন্নত হইবে ইহা ভাবিবার বিষয়। অনুকরণ দ্বারা উন্নতিলাভের আশা বৃথা। ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত কাক কি ময়ূরত্ব লাভে সক্ষম হয়! প্রত্যেক জাতিরই একটা বিশেষত্ব আছে। এবং উহাই জাতির জীবনী-শক্তি। ঐ শক্তি আশ্রয়েই জাতি উন্নত হয়। ধর্ম্মই ভারতে জীবনী শক্তি। এই ধর্ম্মের উদ্বোধনেই ভারত উন্নত এবং অমরত্ব লাভ করিবে। সৃষ্টির প্রারম্ভেই ভারতে এ শক্তি উদীপ্ত; কাহারও অনুকরণে সিদ্ধ নহে।

এখন অনেকে হয়তো বলিতে পারেন যে নবাবী আমলের টাকা একালে আর চলিবে না। সময়োপযোগী ব্যবস্থাই বুদ্ধিমানের কায, এবং এই 'আধানিকতা'র দিনে প্রাচীনত্বের স্থান ইতিহাসে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নয়। সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনীর উৎপত্তি স্থানে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন যদিও সম্ভব হয় কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি পাশ্চাত্য অনুকরণে সংগঠিত হইবে—ইহা অসম্ভব। নব্য ভারত, তোমার এ ধারণা, তোমার এ বিশ্বাস তোমার এ কার্য্য প্রবণতা সমস্তই ভুল এবং বৃথা। ভারত কতবার এই-রূপে ঐহিক প্রতিপত্তি লাভে সচেষ্ট হইয়াছে কিন্তু দৈব নিয়মে উহা পুনঃ পুনঃ বিফল। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র শক্তির অবমাননা, বুদ্ধের মহানির্ব্বাণ প্রচার, শঙ্করের বেদান্ত প্রতিষ্ঠা এবং চৈতন্য রামানুজাদির প্রেম ভক্তির বন্যা ভারত সমাজ পুনঃপুনঃ ধর্ম্মপথে নিয়মিত। এই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সমাজ নেতাগণই ভারতের অবতার কল্প ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এই ব্রহ্মজ্ঞপুরুষই সনাতন সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার সংরক্ষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥

এই কথার স্বার্থকতা দেখাইতে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই আশ্বাসবাণীর বিফলতা কখনও ঘটে নাই, ঘটিবেও না। ধর্ম্ম সমন্বয়েই ভগবানের অবতারত্ব। ভগবানই যেখানে নেতা যাহার নিয়ন্তৃত্ব অব্যাহত রূপে কার্য্যক্ষম সেখানে অনুকরণ স্পৃহা বাতুলতা মাত্র। এইরূপ অনুকরণ প্রিয়তা মিচরি ফেলিয়া গুড় খাওয়া, সুধার পরিবর্ত্তে গরল পান করা।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং শিক্ষাদীক্ষায় অশান্তি দ্বন্দ্ব কোলাহল প্রভৃতি

পৈশাচিক লীলাভিনয়ের বীজ নিহিত। যেথানে সম্পদের আশা বলবতী স্বার্থপরতাও সেখানে চির বিদ্যমান। স্বার্থপরতাই সমস্ত অনর্থের কারণ। স্বার্থপরতা হইতে অনাচার অত্যাচার হিংসাদ্বেষাদির সৃষ্টি এবং অশান্তি গরল উদ্গীরিত হয়। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতারদিকে দৃকপাত্ করিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার শিক্ষাদীক্ষায় স্বার্থের লেশমাত্র নাই—ত্যাগের ভাব থাকায় আনন্দের প্রবল উৎস প্রবাহিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তারতম্য আলোক অন্ধকারের ন্যায় বিদ্যমান। আলো ছাড়িয়া অন্ধকারে যাই-বার সাধ বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ ছাড়া আর কি বলিব।

মানুষ যাহা চায় তাহাই কি পায়, না যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে পারে। ভারত কতবার বিষয়ের মোহে আদর্শকে হারাইয়াছে ভগবানও "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "সম্ভবামি যুগে যুগে" ভগবানের এই আশামূলক প্রতিজ্ঞাবাণী শুধু অতীতের জন্য নহে; তাহা যদি হইত তবে বুঝিতাম ভারতের জাতীয় জীবনের আদর্শ স্বামিজীর প্রদর্শিত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে কোন সুফল নাও ফলিতে পারে এবং সময়োপযোগী পাশ্চাত্য অনুকরণেই মঙ্গল হইবে কিন্তু তাহা ত নহে—সেই মহান্‌শক্তি যে শক্তির বিকাশ বারবার ভারতের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল যাহার নিয়ন্তৃত্বে ভারত চিরকাল পরিচালিত সেই পূর্ব্ব শক্তিসমূহের একত্র সমাবেশ আজও আবার ভারতের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তোমরা কি শোন নাই; সহস্র সহস্র সন্দেহ এবং ঘোর অবিশ্বাসের মধ্যেও ভগবান নিজেই আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ"। ঐ শোন স্বামীজির আশাপ্রদ ঘোষণাবাণী "সতত বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা বিভক্ত, সর্ব্বথা আচার-সঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ

হইয়াছেন। এই নবযুগধর্ম্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান। এবং এই নবযুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্ব্বক শ্রীযুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ! হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর।"

ভারতের সনাতন ধর্ম্ম এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। বেদ বেদান্তাদি সনাতন ধর্ম্ম জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আজ শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে প্রকাশিত।

পাশ্চাত্য মোহজালে বিজড়িত, সম্পদ সম্বর্দ্ধনায় লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারতের নিয়ন্তৃত্বপদ অধিকার করিতে আজ আবার অবতার-কল্প ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সনাতন সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্বামীজি প্রদর্শিত ঐ ধর্ম্মই সমাজ সংগঠনের পথরূপে নির্দ্দিষ্ট। ত্যাগ এবং সেবা এই দুটি পথ দিয়াই ভারতের ধর্ম্ম জীবন, জাতীয় জীবন পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। 'আধুনিকতা'রূপ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত, জগতের সমক্ষে ঘৃণিত, হিংসাদ্বেষ পরশ্রীকাতরতায় সমাচ্ছন্ন, এবং নিজ লক্ষ্যৈকনিরূপণে অসক্ত ভারতের অনুল্লঙ্ঘনীয়, সময়োপযোগী এবং শান্তি প্রদ উন্নতির এই পথ ভগবানেরই নির্দ্দিষ্ট—স্বামীজি স্থানান্তরে এবং ভাবান্তরে উহার সংযোজনা করিয়াছেন মাত্র। হে ভারতবাসি "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য," "ওঠ, জাগ," তোমার নিজ সাধন পথে দাঁড়াইয়া ত্যাগ ও সেবার দ্বারা পরমার্থ লাভ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ কর, দেশকে সমাজকে এই ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোল, তবেই আমাদের জীবন সফলতা লাভ করিবে, দেশের উন্নতি দ্রুতগতিতে হইতে থাকিবে এবং স্বজাতির আসন জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা দেখিয়াছি ধর্ম্ম সমন্বয়েই সমাজ সংগঠিত হইতে পারে এবং বর্ত্তমানে শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতে ধর্ম্ম সমন্বয় কিরূপে সম্ভাবিত এবং সমন্বয় যে হইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। শান্তিপূর্ণ জীবন সকলেরই অনুসরণীয়। শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ!

৺কেশব সেন।*

(স্বামী অদ্ভূতানন্দ)

কেশব সেন অত বড় লোক, যিনি রাণীর কাছে মান্য পেয়েছিলেন, —ঠাকুরের কাছে হাতজোড় ক'রে ব'সে থাকতেন। তাঁর ঠাকুরের কথার উপর বিশ্বাস কত! তিনি হিংসুক ছিলেন না। ঠাকুর তাঁকে শিবপূজা করতে বলায়—তিনি তা'ক'রেছিলেন। কেশববাবু তাঁর কথা খুব বিশ্বাস করতেন এবং জানতেন যে, ওঁর কথা মানলেই কল্যাণ হবে। একদিন ঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে চুপ ক'রে রইলেন। কেশববাবু বল্লেন, 'আর কিছু বলুন'। ঠাকুর বল্লেন, 'আর বল্লে তোমার দলটল থাকবেনা'। তখন তিনি বল্লেন 'তবে থাক'।

তিনি জানতেন আর কিছু বল্লেই—তাঁর মন বদলিয়ে যাবে, আর দল রাখতে পারবেন না।

ঠাকুর বলতেন—কেশববাবুর মান নেবার ইচ্ছা আছে। তিনি কেশব সেনকে একদিন বলেছিলেন—তুমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বল!

কেশববাবু বল্লেন—কি বলবো, আপনার কথা নিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ব'লে—নিজেও আনন্দ পাই, দশজনকে আনন্দ দিতে পারি।

যখন কেশববাবু বিডন ষ্ট্রীটে লেকচার দিতেন, বুড়োরা বলতো—ব্রাহ্ম কেশব এসেছে। তিনি ভগবানের সম্বন্ধে বলতে বলতে নিজেও কেঁদে ভাসতেন, অপরকেও কাঁদাতেন! তারপর বুড়োরা বলতো—কেশব যা বল্লে সব ঠিক ঠিক।

ঠাকুর একবার ব্রাহ্মসমাজে গিছলেন। কেশববাবু ভক্তগণ নিয়ে ব'সেছিলেন। ঠাকুর কথায় কথায় বল্লেন,—কেশবের ল্যাজ খসেছে। তা'তে অন্য ব্রাহ্মরা চ'টে গেলেন। কেশববাবু তাঁদের বল্লেন—'চুপ কর, এর মধ্যে অর্থ আছে'।

কেশববাবু নিজের বাড়ীতে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে পূজা ক'রেছিলেন।

---

* জনৈক ব্রহ্মচারীর ডাইরী হইতে।

তিনিই প্রথমে ঠাকুরের সম্বন্ধে কাগজে লিখ্‌তেন। তাই প'ড়ে ঠাকুরের সন্তানেরা ঠাকুরের কাছে যান্‌।

রামদত্ত ঠাকুরকে নিয়ে উৎসব করেন; কেশববাবু রামদত্তকে বলেছিলেন, "রাম, এ জিনিষ দৈবাৎ কখন হয়। গ্লাসের (glass case) মধ্যে রেখে দূর থেকে—নমস্কার কর্‌তে হয়। এ লাট্‌ করার জিনিষ নয়।"

ঠাকুর কেশববাবুকে ধ্যান করতে দেখে বলেছিলেন—'এর ফাতনা নড়ছে অর্থাৎ ঠিক ঠিক ধ্যান হ'চ্ছে।

বড় বড় লোক ক্রমশঃ সুখের পথে যাচ্ছে যেমন কেশব সেন; এ জন্মে অনেক উন্নতি কল্লো পরজন্মে আরও উন্নতি কর্‌বে।

তিনি ঠাকুরকে সভার মধ্যে লুচি খাইয়েছিলেন; যোগীন মহারাজ খবরের কাগজ হাতে ক'রে ঠাকুরের ঘরে এসে প্রণাম কল্লেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা কল্লেন—"কোথা থেকে আসছ?"

যোগীন মহারাজ বল্লেন—দক্ষিণেশ্বর হ'তে। আমি অমুকের ছেলে। ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের লোক বুঝ্‌তে পারত না। তিনি অবাক হ'য়ে বল্লেন—"এখানকার কথা কি ক'রে জান্‌লে? যোগীন মহারাজ বল্লেন—'কেশববাবু কাগজে আপনার সম্বন্ধে লিখেছেন।" তাই শুনে ঠাকুর কেশববাবুকে ডেকে এনে ধম্‌কিয়ে বল্লেন "আমি কি মান ভিখারী?—আমি কি 'ইদানীং সাধু'! যা করেছ করেছ আর লিখনা।

ঠাকুর মাঝে মাঝে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তেন—কেমন হচ্ছে! কেশববাবু বল্‌তেন "মহাশয় আপনার কৃপায় সমাজে লোক ধরে না।

কেশববাবু পয়সার জন্য ব্রাহ্ম হন নাই। হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম ছিল না, তাই তিনি ব্রাহ্ম হ'য়েছিলেন। ছোটকাল থেকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম কর্‌তেন। পরমহংসদেব স্বীকার কল্লেন—কেশববাবুর ঠিক ঠিক ধর্ম্ম। একটি লোক জগৎ মাতিয়ে দিল—কত বড় শক্তি। কেশববাবুর অনেক 'ফলোয়ার' হ'য়ে গেল। তাঁর সঙ্গ পেয়ে কত লোক বেঁচে গেল।

———

সৎ কথা।

১। Jesus Christ বলেছেন—"দোষী আত্মা ভগবানের কাছে যেতে পারেনা, নির্দ্দোষী আত্মা, পবিত্র আত্মা যেতে পারে।" তিনি তার কাছে প্রকাশ হন।

২। কর্ম্ম ফলে কেউ গুরু হয়, আবার কেউ শিষ্য হয়।

৩। পরস্পর পরস্পরকে দুঃখ দিচ্ছে, জানে না আবার তাকে বুড়ো হতে হবে। এসব মায়ার খেলা।

৪। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ও ভগবান রামচন্দ্রের জীবন যে জানে সে বাপ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করবেই। এঁরা জীবের শিক্ষার জন্য বাপকে পূজা করেছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি যত অবতার, তাঁদের হুকুম প্রতিপালন করেছেন। এরা বাপ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে জানেন। যে বলে আমি বাপ মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি না—সে পশু।

৫। যাঁরা ভগবানের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন ভগবান তাদের প্রতি বড়ই খুসী হন। তাদের আত্মা বড়ই সুখে থাকে। সংসারীরা তাকে ঘৃণা করেন কিন্তু ভগবান খুব আদর করেন যে 'আমার জন্য তুমি সব ত্যাগ করেছ।

৬। এ সংসারে লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করতে না পারলে তাকে বেকুব বলে। মহামূর্খ টাকা রোজগার করলে তাকে খুব বুদ্ধিমান বলে।

৭। তিনি বলতেন খাবার সংস্থান থাকলে, জোচ্চরি প্রবঞ্চনা না করে দুটো খাও আর দাও, তাঁর নাম কর। তা'তে আত্মা সুখে থাকে।

৮। মন গড়া ধর্ম্ম কি থাকে ? সেখানে যে দায় নেই।

৯। যেখানে ধর্ম্ম থাকে সেথায় কি হিংসা থাকে ?

১০। ত্যাগ না হলে তাকে বুঝবার যো নাই।

১১। যে ভগবানকে জানবার চেষ্টা কচ্ছে তার সঙ্গে আলাপ করলে শান্তি পাবে।

১২। যে ঠিক সন্ন্যাস লবে সে জীবকে অভয় দেবে, সে আর কাহারও ভালবাসা চায় না।

১৩। তাঁহাতে মন থাকলে সব ভয় কেটে যায়। তাঁর উপর মন থাকাই হলো প্রধান। তিনি যে কোথা থেকে বুদ্ধি জুটিয়ে দেন তা কি জীব বুঝিতে পারে। তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা করতে হয়। বাহিরে লোক দেখান না হয়। আন্তরিক প্রার্থনা হলে তিনি শোনেন।

১৪। দ্রৌপদী কি ব্রত করে লোকজন খাওয়াচ্ছিলেন; তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছিলেন সখা ঐ লোকটাকে খাওয়াও। দ্রৌপদী খুব আয়োজন করেছিলেন। তার পর সেই লোক খেতে বসা মাত্র শাঁখ ঘণ্টা বাজিতে লাগল। ঐ লোকটার খাওয়ার ঠিক নেই, পর পর খাচ্ছে না, কখনও এটা সেটা, তাই দেখে দ্রৌপদী মনে ভাবছেন যে লোকটা এমন যে খেতেও জানে না। মনে করিবামাত্র শাঁখ ঘণ্টা থেমে গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলিলেন যে তুমি কি ভাবছিলে বল দেখি; শাঁখ ঘন্টা থেমে গেল কেন? তখন দ্রৌপদী ঐ বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে বড়ই অন্যায় করেছ ওর কি খাওয়ার উপর মন আছে। আমার উপর মন আছে। দ্রৌপদীর মস্তশিক্ষা। অহঙ্কার যেন না হয়।

১৫। কর্ম্ম না থাকার জন্য গুণীর গুণ বুঝতে পারে না, কেবল দোষই নজর আসে।

১৬। যে সাধু ভগবান লাভ করেছেন সেই জানে ভগবান, ও বৈরাগ্য কি জিনিষ। সাধুর ভেষ থাকলেই হয় না ভগবান লাভ করাই প্রধান!

১৭। অসৎ কাজ করলে ভয় আসবে, দুঃখ পাবে। সৎকাজ করলে ভগবানের দিকে মন যায়, শান্তি পায়।

১৮। কর্ম্মের পথ ও মত কারুর মিল হয় না তবে উদ্দেশ্য সকলেরই এক হতে পারে। যে কর্ম্মের পথ মিল করতে চায় সে নির্ব্বোধ!

১৯। মান সম্ভ্রমের জন্য জীব কি না কচ্চে, খবরের কাগজে নাম দিচ্ছে। যে জানে এসব কিছু নয়, মিথ্যা, সব মায়ার খেলা সে ভাগ্যবান।

২০। ভগবানে মতিগতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকলে কি হয়? সে অসৎ কাজ করবে না; সে জানে উপরওয়ালা একজন আছেন। অসৎ কাজ কল্লেই ভুগতে হবে।

২১। কামিনী-কাঞ্চন এ দুটী ভয়ানক বন্ধনের কারণ ও সংশয় আনে। পার্থিব ভালবাসার কথা ছেড়ে দাও এদুটী ভগবানের পথে যেতে দেয় না, যেখানে থাকে—বিবাদ করায়। যে এদুটী ফেলে দিতে পারে সে জীবন্মুক্ত। এও মায়ার খেলা।

২২। গুরু শিষ্যের খুব গুণ থাকলেও শিষ্যের দোষ ধরেন; বাপও ছেলের গুণ থাকলে দোষ ধরেন।

২৩। ভাই ভাইএ মিল থাকার খুব দরকার। এক সঙ্গে থাকতে গেলেই বকাবকি হয়। মনে রাগ হওয়া খারাপ। তিনি বলতেন 'সতের রাগ, জলের দাগ'।

২৪। অসময়ের উপকারের মূল্য নেই।

২৫। গুরু কে? যিনি সংস্কার বিহীন পুরুষ, তাঁহাকে গুরু বলে মানতে হয়।

২৬। চোরিকে ভগবান ঘৃণা করেন।

২৭। দুঃখের সময় গুরুকে, ভগবানকে ঠাকুরকে মনে পড়ে।

২৮। যে গুরুর দোহাই দিয়া খাচ্ছ তার উপর আবার রাগ! এ আবার কি বেয়াদবী।

২৯। পাপাত্মারা সাধুকে বলে আমাদের পাপ আপনি ভুগুন।

৩০। অর্থ থাকবে অথচ সৎবুদ্ধি হবে, এ ভগবানের খুব কৃপা চাই।

৩১। মেয়ে জাত হয়ে অর্থ থেকেও অহংকার, অভিমান হয় না—খুব ভগবানের দয়া বৈ কি।

৩২। অসৎ লোকের জিনিষ খেতে নাই।

৩৩। পুণ্যবাণ্ লোককে দেখলে মন হরষিত হয়, আর পাপাত্মাকে দেখলে হৃৎকম্প হয়।

৩৪। সকলেই তাঁর সন্তান, তবে যে ভগবানকে ভক্তি করবে, শরণ লবে সেই সুসন্তান।

৩৫। গুরুর কৃপা না হলে সংশয় যায় না।

৩৬। তাঁর হুকুম কি কেউ মানে! মানলে সকলেরই কল্যাণ হত।

৩৭। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এক অনন্ত আর কি কেউ অনন্ত হয়।

৩৮। ভগবান কি তোমার বাঁধা যে তোমার নিয়মে চলবেন?

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।)

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শঙ্কা)—আচ্ছা, যাহারা অপরকে পরাজিত করিবার ইচ্ছা করে তাহাদের ত আত্মজ্ঞানও নাই কেননা পূজ্যপাদ আচার্য্য (সুরেশ্বর) স্বীকার করিতেছেন—

"রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু
কুতঃ শাদ্বলতা তস্য যস্যাগ্নিঃ কোটরেতরোঃ।"

(নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ৪।৬৭) *

চিত্ত, ব্যায়ামের জন্য (অনুশীলনাদির উদ্দেশ্যে) শব্দাদি যে সকল বিষয়ে (তর্কাদি শাস্ত্রে) প্রবেশ করে, সেই সকল বিষয়ের প্রতি আসক্তি, অজ্ঞানেরই লক্ষণ। যে বৃক্ষের কোটরে অগ্নি রহিয়াছে, তাহাতে হরিদ্বর্ণ কি প্রকারে সম্ভবে?

---

* জ্ঞানোত্তম কৃত টীকানুবাদ—যেহেতু সিদ্ধের এবং সাধকের, আসক্তি ও দ্বেষ বশতঃই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে, সেই হেতু প্রবৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়া যদি আসক্তি অনুমতি হয় তবে তাহা অজ্ঞানের লক্ষণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—এই বলিয়া উপসংহার করিতেছেন—'চিত্ত ব্যায়াম ভূমিষু—স্বাভাবিক সুখানুভব বশতঃ চিত্ত শব্দাদি যে সকল অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে যে "রাগ" আসক্তি, তাহা অজ্ঞানেরই চিহ্ন।

কেননা সেই আচার্য্যপাদ সুরেশ্বরই, (জ্ঞানীর আসক্তি প্রভৃতি থাকে একথা) এই স্থলে স্বীকার করিতেছেন—

তদুত্তরে বলি এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না কেন না আচার্য্যপাদ— নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি প্রণেতা সুরেশ্বরাচার্য্যের বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক হইতে, মুনিবর বিদ্যারণ্য এই প্রমাণটি, দুইটী বিভিন্ন শ্লোক হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ১৫৩৯ সংখ্যক শ্লোক "শাস্ত্রার্থস্য সমাপ্তত্বান্মুক্তিঃ স্যাৎ তাবতা মিতেঃ। রাগাদয়ঃ সন্তকামং ন তদ্ভাবোঽপরাধ্যতি"॥; উক্ত ব্রাহ্মণের ১৭৪৬ সংখ্যক শ্লোক—"উৎখাত দন্তোরগবদবিদ্যা কিং করিষ্যতি। বিদ্যমানাপি বিধ্বস্তভীব্রানর্থ পরম্পরা"॥ টিকাকার আনন্দগিরি প্রথম শ্লোকটি এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন :— তাহা হইলে মুক্তি কিপ্রকারে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন— 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে যে প্রজ্ঞা জন্মে তাহার নাম "মিতি"; তাঁহা হইতে মুক্তি হয়, কেননা "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", যিনি ব্রহ্ম জানেন তিনি ব্রহ্ম স্বরূপই হ'ন (মুণ্ডক ৩।২।৯)। এই শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ জানিবা মাত্রই মুক্তি হয়, ইহাই উপনিষদ্বিচারের চরম ফল, (তদপেক্ষাউৎকৃষ্ট অন্য কিছু ফল নাই)।

তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন যে বৃক্ষে অগ্নি রহিয়াছে তাহাতে হরিদ্বর্ণ সম্ভবেনা। সেইরূপ, যে স্থলে আসক্তি আছে সেস্থলে জ্ঞান নাই।

এস্থলে কেবল মন ও বুদ্ধির উল্লেখ হইলেও, চিত্ত ও তাহার বৃত্তি সমূহকেও বুঝিতে হইবে। শেষে—আত্মতত্ত্বে আত্মতত্ত্ব বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করা অসম্ভব, এই হেতু তাহাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাতে "স্থির সমাধানি বা বিশ্রান্ত হইয়া অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিশ্রামলাভ করিয়া "যেন"—যে কল্পনা নামক অহঙ্কার, দ্বৈত-কল্পনার মূল স্তম্ভ-স্বরূপ, তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সকল বস্তু তুমি ত্যাগ করিলে, তাহাকেও পরিত্যাগ কর। এই সকলের ত্যাগ বলিতে, সেই সেই বস্তুতে 'আমি' 'আমার' এইরূপ অভিমান ত্যাগই বুঝিতে হইবে। আর সেই অহঙ্কারেও শুদ্ধ চিন্মাত্ররূপ আত্মার যাহাতে 'আমি' বুদ্ধি নাই—সেই আত্মার উপলব্ধি দ্বারা মূলাজ্ঞানের উচ্ছেদ ঘটিলে, তাহা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে কল্পনান্তরের অপেক্ষা নাই। এই কারণে "অনবস্থা দোষ" ঘটে না অর্থাৎ তাহার বিনাসক কে? খুঁজিতে হয় না।

এই হেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্য ধারণা করিতে পারিলেই মুক্তি। ইহাই—ভাবার্থ। এস্থলে যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে সেইরূপ জ্ঞান হইবার পরেও যগুপি আসক্তি প্রভৃতি দেখা যায়, তাহা হইলে ত বুঝিতে হইবে তাঁহার জ্ঞান হয় নাই—তদুত্তরে বলিতেছেন যে সেইরূপ আসক্তি প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেই তাহাদিগকে যে জ্ঞানের বিরোধী বলিয়াই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে, কেননা জ্ঞান দ্বারা তাহাদের বীজ দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে ঐ সকল আসক্তি প্রভৃতির আভাস মাত্র। এই হেতু বলিতেছেন আসক্তি প্রভৃতি থাকে, থাকুক ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিতেছেন—'অবিদ্যা থাকিয়া গেলে সংসার রচনা করিবেই, এই হেতু যাহাতে তাহার বিধ্বংস ঘটে, তাহা ত করিতে হইবেই? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অবিদ্যা যে উৎকট অনর্থ রাজি প্রসব করে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাওয়াতে, উৎপাটিত দন্ত সর্পের ন্যায় অবিদ্যা (থাকিয়া গেলেও) কি করিতে পারে?

জীবন্মুক্তি-বিবেকের আনন্দাশ্রম সংগৃহীত তিনখানি প্রতিলিপিতে উক্ত শ্লোকের শেষার্দ্ধ ("উৎখাত……করিষ্যতি") নাই। ইহাতে মনে হয় অন্য কেহ স্বকীয় স্মৃতি হইতে পারে উহার সংযোজন করিয়া থাকিবেন।

রাগাদয়ঃ সন্তু কামং ন তদ্ভাবোঽপবাধ্যতি।

(বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক ১ম অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ ১৫৩৯ শ্লোক শেষার্দ্ধ।)

উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদবিদ্যা কিং করিষ্যতি॥

বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক ১ম অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ প্রথমার্দ্ধ। ১৭৪৬।

আসক্তি প্রভৃতি থাকে থাকুক। তাহারা থাকিলেই, দোষ ঘটায় না। যে সর্পের দন্ত উৎপাটিত হইয়াছে, সেই সর্পের ন্যায়, অবিদ্যা কি করিতে পারে? (অর্থাৎ কোনও হানি ঘটায় না)।

আর একথা বলিতে পার না যে আচার্য্য পাদের উক্তবাক্যদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ, কেন না স্থিতপ্রজ্ঞ ও কেবলজ্ঞানী এই দুই প্রকার (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) সম্বন্ধে উক্ত বাক্যদ্বয়ের (যথাক্রমে) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে (অর্থাৎ উক্ত দুইটি বচন যথাক্রমে উক্ত দুই প্রকার পুরুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে)।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, যদি 'জ্ঞানীতে আসক্তি প্রভৃতি থাকতে পারে' একথা স্বীকার করা হইল, তাহা হইলে ত সেই আসক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মা-ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া জন্মান্তর ঘটাইতে পারে ?

(সমাধান) না এরূপ হইতে পারে না। যে বীজ ভাজা হয় নাই, তাহারই যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারে সেইরূপ অবিদ্যা প্রযুক্ত যে আসক্তি প্রভৃতি জন্মে তাহারাই মুখ্য আসক্তি ইত্যাদি বলিয়া, তাহারাই পুনর্জ্জন্মের কারণ হইতে পারে। জ্ঞানীর কিন্তু যে আসক্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ভাজা বীজের ন্যায় আভাস মাত্র। এই অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে :—

উৎপদ্যমানা রাগাদ্যা বিবেক জ্ঞান বহ্নিনা।
তদা তদৈব দহ্যন্তে কুতস্তেষাং প্ররোহণম্॥ *

(বরাহোপনিষৎ ৩।২৪।২৫)

আসক্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হইবা মাত্রই, বিবেকরূপ জ্ঞানাগ্নি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে। তাহারা আবার অঙ্কুরোৎপাদন পূর্ব্বক নূতন শাখা পত্র ধারণ করিবে কি প্রকারে ?

(শঙ্কা)—আচ্ছা তাহা হইলে স্থিতপ্রজ্ঞেরও কেন সেই গুলি থাকুক না ?

"কেহ কি হয় অধোবদন
অকলঙ্ক দরিদ্রতায় ?
দৈন্য মোরা করি বরণ,
ভীরু যে জন গণি না তায়।"

রবার্ট বার্ণস।

---

* পাঠান্তর—'যদাতদৈব'। পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ধৃত অনেকগুলি শ্লোকই বরাহোপনিষদের একই স্থলে দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে সেই শ্লোকগুলি প্রসঙ্গ নিবদ্ধ কিন্তু উক্ত উপনিষদে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথবা কষ্টকল্পিত ভাবে তাহাদের সম্বন্ধে ঘটাইতে হয়। ইহাতে মনে হয় উক্ত উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টার হৃদয়ে জীবন্মুক্তি-বিবেকের সংস্কার থাকা অসম্ভব নহে।

সমালোচনা

রাজা-বাদশা।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ছেলেদের জন্য সরল ভাষায় ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গল্প 'রাজা-বাদশা' ঘটনাস্তূপে এবং তারিখের জঞ্জালে শিশু মস্তিষ্ক গুলাইয়া দেয় না। পরন্তু ইতিহাসের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য—অতীতের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানের উৎকর্ষসাধন—সিদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে শিশু-হৃদয়ে ঈশ্বরানুরাগ, সত্যপালন, দেশভক্তি, নারী-মাহাত্ম্য প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তির বিকাশ হইবে। হিন্দুর পুরাতন রক্ত তাজা করিতে হইলে প্রতি মাতাপিতার কর্ত্তব্য এই পুস্তকের সহিত নিজ সন্তানদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া।

পুণ্ডরীক।—ইংরাজিতে 'বুদ্ধ' ও 'নলদময়ন্তী' নাটক প্রণেতা শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু, বি, এ, ব্যারিষ্টার-অ্যাট-ল প্রণীত। ভিক্টর হিউগোর 'নত্র্ দাম দ পারী' নামক উপন্যাসের 'ফ্রলোর' চরিত্রাবলম্বনে ব্রহ্মচারী পুণ্ডরীকের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। জগতে অঘটনঘটনপটিয়সী দৈবী মায়ার প্রতাপ পুণ্ডরীক মুখেই বর্ণিত হয়েছে "আর আমি,—আমার অভিমান, আমি বিদ্বান, শুদ্ধাচারী, সংযমে আদর্শচরিত্র,—আমি শুধু তাকে দেখেছি, দূর থেকে দেখেছি মাত্র, আমি আজ দুর্নিবার বাসনাবশে উন্মাদ, আমার দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, অস্তিত্ব সব ঐ পথভিখারিণী ইরাণি বালিকার দৃষ্টি সঙ্ঘর্ষে বিদারিত, বিচূর্ণিত হয়েচে! ছি, ছি, ছি,...

"ভ্রম, ভৃঙ্গার! শুধু রমণি দর্শনে পুরুষের কখন চিত্তবিকার হয় না। কালের ক্রীড়াপুত্তলি পুরুষ, কালপূর্ণ হলে তার অন্তঃ শত্রুসমূহ আপনি জাগরিত, আপনি উন্মত্ত হয়ে উঠে। তখন আর তার বিপ্লুত বৃত্তিনিচয় সংযমের শাসন মানে না,—অস্থির হয়ে চারিদিকে আপন তৃপ্তির আধার অন্বেষণ করে। তখন, কোথা হতে তার বাঞ্ছিত প্রতিমা অপ্সরাবেশে আপনি এসে সম্মুখে উপস্থিত হয়, আর বৃত্তিপ্রপীড়িত

পুরুষ উন্মত্ত হয়ে তাকে আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে আহ্বান করে, তাকে হৃদয়ের লৌহদ্বার খুলে দিয়ে তথায় পূর্ণ আধিপত্য দান করে। আমি মূর্খ, তাই মনে করেছিলাম এ প্রাণ পাষাণ প্রাচিরে বেষ্টিত, কামিনী-লিপ্সা কখন এ হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ভগবান...ভগবান ...কেন তুমি মানব হৃদয়ে সংযমশক্তি এত ক্ষীণ করেছ?...কেন তুমি পশু প্রবৃত্তিকে এত প্রবল করেছ?...কেন তাকে মনুষ্য হৃদয়ে এত বেশী স্থান, এত বেশী অধিকার দান করেছ?...

"কবে তাকে দেখেছি? সে ঘটনা অতি সামান্য কিন্তু কি ভয়ানক পরিণাম! একদিন এই অধ্যয়ন কক্ষে, ঐ বাতায়নে বসে প্রকৃতির সান্ধ্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করছিলাম। সমস্ত বিশ্ব তখন রক্ত রবিকরে বিভাসিত, যেন প্রকৃতি সতি তার রক্তিম ললাটে সিঁন্দুরের ফোঁটা কেটে শশধরের প্রতিক্ষা করছে। সেই সময় হঠাৎ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হ'ল...সেরূপ দৃশ্য আর জীবনে কখন দেখি নাই। দেখ্‌লাম, ঐ ইরাণি বালিকা করতাল বাজায়ে নৃত্য করছে। মনে হ'ল যেন সে অলোক সুন্দরী নারী মরজগতের নয় ত্রিদিবের। তার সৌন্দর্য্যে, শরীর সৌষ্ঠবে, নিপুণ পাদবিক্ষেপে আমি চমৎকৃত হলাম, সম্মোহিত হলাম...চক্ষু আর সে দৃশ্য হ'তে ফিরতে চাহিল না। মনে হ'ল যেন ঐ মোহিনী নর্ত্তকী শত সংখ্যাতীত মূর্ত্তি ধারণ করে আমার অন্তরের অভ্যন্তরে নৃত্য করছে; হৃদয় অভিভূত হ'তে লাগ্‌ল ...অন্তরের শুদ্ধতা, সংযম যেন সমস্ত জড়ীভূত, নিদ্রাগত হয়ে আসতে লাগ্‌ল· দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাণে একটা ভীতির সঞ্চার হ'ল...মনে হ'ল যেন নিয়তি আমাকে গ্রাস কর্‌তে আসছে...ভাবলাম পালাই! কোথায় পালাব?...হর্ম্ম্যতলের মর্ম্মরসমূহ যেন আমাকে আকোটি গ্রথিত করেছে...আমি জড়পুত্তলির ন্যায় সেখানে বসে রহিলাম...শরীর তুষার শীতল, মস্তিষ্ক জ্বলন্ত অঙ্গার! তখনি দেবী মন্দির হ'তে সন্ধ্যা আরতির বন্দনা গীতি শ্রুত হ'ল, আর মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সেই মোহজাল ইন্দ্রজালের ন্যায় আমার কল্পনা-নয়ন হ'তে অপসারিত হ'ল· ছুটে মন্দিরে গেলাম, মা শিলাদেবীর পদে আত্মনিক্ষেপ করলাম, কিন্তু মনে

হ'ল অন্তর হ'তে কি যেন অন্তর্হিত হয়েছে, আর আসবে না, আর বসবে না…। অনশন, অধ্যয়ন শতগুণে বৃদ্ধি করলাম…সব পণ্ড… সব পণ্ড সব পণ্ড

"আর আলোকের বিকাশ হবে! আমি আজীবন ঐ আলোকের অনুসন্ধান করেছি…ঐ অন্বেষণে,—অনশনে, অধ্যয়নে, নিষ্ঠায়, কঠোরতায়, শুদ্ধাচারে, শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করেছি,…ব্যর্থ, সব ব্যর্থ…! দুর্নিবার বাসনার ধার কার সাধ্য রোধ করে?…ঐ দেখ, ভৃঙ্গার, এক মূর্খ পতঙ্গ, আমারি মত আলোক অন্বেষণে ধাবিত হয়েছে,…আবার দেখ, পথে এক উর্ণনাভ কি ভয়ানক জাল বিস্তার করে তারই জন্য অপেক্ষা করছে!…ঐ দেখ, পতঙ্গ ধৃত…উর্ণনাভ উর্দ্ধশ্বাসে তাকে গ্রাস করতে যাচ্ছে!…আমিও ঐ আলোক প্রয়াসী পতঙ্গের মত চিত্তবৃত্তির মহাজালে আবদ্ধ হ'য়ে পীড়িত নিষ্পেশীত হচ্চি।…আত্ম প্রতারিত শাস্ত্রজ্ঞান! তুমি অসহায়, শরণাপন্ন মানবকে কল্প কল্পান্তর হ'তে আলোক মরিচিকার পথ প্রদর্শন করছ…আর ক্ষুদ্র মানব পথে নিজ প্রবৃত্তির লৌহজালে বিজড়িত হয়ে অনন্তকাল শত নির্যাতন সহ্য করছে! শাস্ত্র, তুমি মিথ্যা…মিথ্যা দর্শন, বিজ্ঞান …মিথ্যা ইন্দ্রিয় দমন, চরিত্র-গঠন…মিথ্যা শুদ্ধাচার, সংসার বর্জ্জন… ভগবান, ভগবান তুমি…মিথ্যা…

"না, না, এ হৃদয়ে আর শান্তি নাই! উদ্দাম, অপ্রতিহত বেগে বাসনা স্রোত আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেচে, আর আমি কত বিক্ষুব্ধ, উত্তাল-তরঙ্গ শীরে ক্ষুদ্র তৃণের মত উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত হতে হতে চলেছি। প্রতিরোধের উপায় নাই,…যতই চেষ্টা করছি, আজীবনের রুদ্ধস্রোত আজ ততই উন্মত্ত হয়ে, উদ্বেলিত হয়ে, বালির বাঁধ বিদীর্ণ করে, উচ্ছলিত কলেবরে আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, সংযম সমস্ত বিপ্লাবিত, ব্যাপ্ত করছে।…কূল নাই, ভৃঙ্গার! কূল নাই, আমি অকূলে পতিত… আমি মহা নরকসমুদ্রে নিমজ্জিত!…

"ওই…ওই…নরক…নরক…লোলজিহ্বা নরকাগ্নি চারিদিকে হু হু জলছে! তার মধ্যে ইরাণি, তাণ্ডব নৃত্য করছে…আমায় ডাকছে,

আমায় টানছে, আমায় যেন কি অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ করেছে...আমি এ আকর্ষণ বিচ্ছিন্ন করতে পারব না,...এ আবাহন আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারব না...ঐ চলে যায়;...ইরাণি, যেওনা,...দাঁড়াও,...অপেক্ষা কর,...তোমার জন্য আমি ঐ জলন্ত নরক সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করব!"

ধন্য ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া! বাক্ মুখে তুমি সত্যই বলিয়াছ,—

"যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥"

তুমি ছোটকে বড় কর পশুকে দেবতা কর। আবার,—

"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেণ সংসার স্থিতি কারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোহানিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

তুমি অতি বড় পণ্ডিতকেও মোহাবর্ত্তে বলপূর্ব্বক নিপাতিত কর! হে রাম! ধন্য তেরি মায়া!

পদ খলিতের মনস্তত্ত্ব অতি চমৎকার পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাষা বিশুদ্ধ কিন্তু সাধারণের নিকট কিছু কঠিন। মুদ্রাঙ্কণে ভুল অত্যধিক বেশী। বাঁধাই, কাগজ ও অক্ষর ভাল। ক্রিয়াগুলি ঠিক ঠিক চলিত ভাষায় সর্ব্বদা রক্ষিত হয় নাই।

"স্বর্ণপাত্র ভাঙ্গিলেও তার সোনা বলি সমাদর;
ধন-নাশে জ্ঞানী জ্ঞানীই থাকেগো অক্ষয় গুণাকর;
মূর্খের যদি হয় ধন নাশ—কিবা সে মূল্য তার?
মাটির পাত্র ভাঙিলে মাত্র হয়ে পড়ে ধূলি সার।"

—পণ্ডিতা অবৈয়ার।

সংবাদ।

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে সকলেই আশা করি, কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের নাম শুনিয়াছেন। যাঁহারা এই আশ্রম হইতে ঔষধাদি লইয়া যান, তাঁহাদের সংখ্যা কয়েক বৎসর দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে—গত বৎসর রোগীর সংখ্যা বিংশ সহস্রের উপর হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমানে যেখান হইতে ঔষধ দেওয়া হয়, তাহাতে কোনরূপে কুলাইতেছে না। উহাতে দুইটী ছোট ছোট ঘরমাত্র আছে—রোগীদের দাঁড়াইবার স্থান মোটেই হয় না, তাহার উপর অস্ত্র চিকিৎসা করিবার এবং তাহার পর ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি বাঁধিয়া দিবার ঘর মোটেই নাই। এই কারণে এতদুদ্দেশ্যে একটী উপযুক্ত বাটী শীঘ্র নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে উহার জন্য যে প্ল্যান হইয়াছে, তাহাতে দশটী ঘর ও পাঁচটী বারান্দা থাকিবে (১) অস্ত্রচিকিৎসার ঘর (Operation room), (২) ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবার ঘর (Dressing room) (৩) অস্ত্রযন্ত্রাদি বাষ্পের দ্বারা শোধন করিবার ঘর (Sterilizing room). (৪) ডাক্তারের থাকিবার ঘর, (৫) পুরুষ রোগীদের বসিবার ঘর (৬) স্ত্রীরোগীদের বসিবার ঘর (৭) পুরুষ রোগীদিগকে ঔষধ দিবার ঘর (৮) স্ত্রীরোগীদিগকে ঔষধ দিবার ঘর (৯) ঔষধ রাখিবার ঘর (১০) শিশি, বোতল এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্র রাখিবার জন্য ঘর। সর্ব্বশুদ্ধ ১৭০০০৲ আন্দাজ খরচ হইবে। তন্মধ্যে অস্ত্রচিকিৎসার ঘর ব্যতীত অন্যান্য ঘরগুলিতে আন্দাজ ১৫০০৲ করিয়া পড়িবে, অস্ত্র-চিকিৎসার ঘরটীতে মার্ব্বেলের মেজে এবং কাঁচের ছাদ প্রভৃতির জন্য আন্দাজ ৩৫০০৲ টাকা পড়িবে। এই টাকার মধ্যে ৭০০০৲ টাকা ইতি-মধ্যেই সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং আর দশ সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় বাটীটী ভিত পর্য্যন্ত গাঁথা হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য উপস্থিত বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। আশ্রমাধ্যক্ষ মহাশয় সহৃদয় দেশবাসীর নিকট এতদুদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

ইহার জন্য যিনি যাহা কিছু দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। অনেকে পবিত্র তীর্থস্থানে তাঁহাদের প্রিয় আত্মীয় স্বজনের স্মৃতিচিহ্ণ স্থাপন করিতে উৎসুক। তাঁহারা এক একটী ঘরের জন্য ১৫০০৲ টাকা অথবা অস্ত্রচিকিৎসা গৃহের জন্য ৩৫০০৲ এককালীন দিয়া তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের নাম সম্বলিত ফলক স্থাপন করিয়া স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ণ স্থাপন করিতে পারেন।

এবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে বা অর্থ সাহায্য পাঠাইতে হইলে নিম্নলিখিত দুইটী ঠিকানায় পত্রাদি ব্যবহার করিতে পারেন;—

(১) স্বামী কল্যাণানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, কনথল পোঃ, (জেলা সাহারণপুর) U. P.

অথবা

(২) স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বেলুড় পোঃ (জেলা হাওড়া)

উজ্জয়িণী পূর্ণকুম্ভ মহামেলা।

(ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্য)

অতি সমারোহে মাসাধিক কালব্যাপী অবস্থিত থাকিয়া এই মহামেলা বিগত ২১শে মে তারিখে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সাধু ও গৃহস্থগণের মধ্যে যাঁহারা চতুর্থবার এই মেলা দেখিয়া আসিতেছেন তাঁহারা বলেন, এবারকার কুম্ভমেলায় অন্যান্য বারাপেক্ষা বিশেষ বিশেষত্ব ছিল। যাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭।৮ লক্ষ হইয়াছিল। ১৯শে মে পর্য্যন্ত স্থানীয় আখড়াতে সাধুর সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধ-লক্ষের কিছু কম ছিল। পরন্তু স্নানের শেষ দুইদিন সংখ্যা আরও অধিক হইয়াছিল। এই একমাস কাল উজ্জয়িণী নগর যাত্রীর কোলাহলে, সাধুগণের পবিত্র ভজন-গীতিতে মুখরিত হইয়াছিল। রাজপথে, শিপ্রা পুলিনে ও সৈকতভূমে

কি যেন এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে মন প্রাণ মাতিয়া উঠিত, তাহাও যিনি কখন এই মহামলা দর্শন করেন নাই তিনি বুঝিতে পারিবেন না। ধর্ম্মের নামে ভারতীয় মানব মনের যে পবিত্র উন্মত্ততা তাহা এই কুম্ভ মেলায় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

১৬ই মে তারিখে সন্ন্যাসিগণ এক মহতী সভা করিয়া শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্মোৎসব বহু সমারোহের সহিত সম্পাদন করেন। ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে মে প্রত্যহ সাধু মহা মণ্ডলীর অধিবেশন হইত। প্রায় ১০।১২ হাজার মনীষী এই সভা অলঙ্কৃত করিতেন। এই অধিবেশনে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্বামী হরিহর তীর্থ মহারাজ প্রথম দিনের, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মোহন্ত শ্রীজগন্নাথ দাসজী দ্বিতীয় দিনের ও উদাসী সম্প্রদায়ের সাধু শ্রীনারায়ণ মুনিজী তৃতীয় দিনের সভাপতি ছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণ মিলিত হইয়া প্রেমের সহিত যাহাতে লোক-কল্যাণকর কার্য্যে নিয়োজিত হন এ সভায় বিশেষ ভাবে তাহার আলোচনা হইয়াছিল। সাধু মহাবিদ্যালয় স্থাপন, ধর্ম্মোপদেশক সম্প্রদায় সৃষ্টিকরণ ও সমাচার পত্র প্রকাশনাদি প্রস্তাব বিশেষভাবে পরিগৃহীত হয়। ১৯শে মে সন্ত সভানামে আর এক বিরাট সভা হয়। ডাকোরের মোহন্ত শ্রীগোকুল দাসজী তাহার সভাপতি ছিলেন।

২০শে মে উজ্জয়িণী নগর যেন এক বিশাল জন সমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। শিপ্রা নদীর ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া দত্ত আখাড়া পর্য্যন্ত—কেবল মস্তকসারি ব্যতিত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এই দিন সন্ধ্যার সময় লক্ষাধিক যাত্রী আশ পাশ হইতে আসিয়া স্নানের জন্য শিপ্রাতীরে সমবেত হয়। উজ্জয়িণী গভর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে রাত্রি ২টা হইতে আরম্ভ করিয়া ২১শে মে প্রাতঃকাল ৫॥টা পর্য্যন্ত স্নান করিবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়।

২১শে মের প্রাতঃকালের দৃশ্য অবর্ণনীয়, নদীর উভয় তটে যে দিকে দৃষ্টিপড়ে সে দিকে মনুষ্য ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গ্রীষ্মের এই প্রাতঃকাল জনসমূহের সংঘর্ষণে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় নব জলধর আকাশে ছত্ররূপে বিরাজিত হওয়ায়

এবং পবনদেব সংক্ষুব্ধ জন সমূহকে সুশীতল সুমন্দ বায়ু বীজন করিতে থাকায় এই ভয়ঙ্কর অবস্থা অধিকক্ষণ থাকিতে পারে নাই।

গোঁসাই সম্প্রদায়ের চারিটি আখড়ার (যথা,—দত্ত, জুনা, নিরঞ্জনী ও নির্ব্বাণী) সাধুগণ বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে অতি ধুমধামের সহিত স্নান যাত্রা সম্পাদন করেন। সকলের আগে দত্ত আখড়ার ও পরে অন্য তিন আখড়ার সাধুগণ শোভা যাত্রায় শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন করিয়াছিলেন।

বস্ত্রধারী ও কৌপীনমাত্র সম্বল সাধুগণের মধ্যে নাগাগণের এক বৃহৎ সম্প্রদায় হস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন। যে সকল নাগাসাধু পদব্রজে যাইতেছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে সহস্রাধিক স্ত্রী অবধূত ছিল। এই স্ত্রী অবধূতের মধ্যে বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত ছিল। একজন প্রায় দুইফুট উচ্চ নাগা মহাত্মা অপর নাগা সাধুর স্কন্ধে আরূঢ় থাকিয়া সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছিলেন।

২২শে মে সন্ধ্যার সময় শ্রীমান্ মহারাজসিন্ধিয়া আলিজাহ বাহাদুর রাজবংশের প্রাচীন প্রথা অনুসারে মণ্ডলেশ্বর এবং সমুদয় আখড়ার মোহন্তগণকে স্বীয় রাজ অন্তঃপুর মধ্যে আহ্বান করেন এবং পশমী বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা তাঁহাদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন।

মেলা সমাপ্তির কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই এই বৃহৎ জনসঙ্ঘের মধ্যে কলেরার ভীষণ আক্রমণ চলিতেছিল। উজ্জয়িনী সেবা-সমিতি, মাধব কলেজ "বয়স্কাউট" এবং লস্কর, বড়নগর ও শাজাপুর সেবা-সমিতির সেবকগণ যাত্রিগণকে সর্ব্বপ্রকারের সহায়তা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের দুর্ভিক্ষ কার্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন গত জুন মাস হইতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত খুলনাবাসীদিগের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমরা সেখানকার সেবকদিগের নিকট হইতে অবগত হইলাম যে, শ্যামনগর, রতনপুর প্রভৃতি গ্রামের

অধিবাসীরা যে কেবলমাত্র অনশনক্লিষ্ট তাহা নয়, তথাকার অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ একেবারে নগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা চাউল লইতে আসে তাহারা কোন রকমে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া আইসে। অবশিষ্ট প্রায় সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় গৃহে অবস্থান করে। আজকাল লোকে শাক সিদ্ধ ওল সিদ্ধ বন্যফল কলাগাছের 'বাকলো'র রস, তুষ প্রভৃতি পশুর খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। এক একটি পরিবারে দুই একজন উপার্জ্জনক্ষম আর ৮।১০ জন করিয়া পোষ্য। এইরূপ বহু পরিবার অন্নাভাবে ও কার্য্যাভাবে মরিতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা দুর্ভিক্ষের বিবরণ সম্বন্ধে একটি আবেদন সংবাদ পত্রে দিয়াছি।

গত জুন মাস হইতে ৪।৫ খানি গ্রাম লইয়া আমাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তারপর ক্রমে ক্রমে প্রথম হইতে পঞ্চম সংখ্যক ইউনিয়নের ৫৭ খানি গ্রামে কার্য্য হইতেছে। নাকিপুরে কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সংক্ষেপে কার্য্য বিবরণ দেওয়া হইল।

৬ই জুলাই তারিখে ৩৪ খানি গ্রামে ৭২৮০ জনকে ৩৫ মন, ১৩ই তারিখে ৫৩ খানি গ্রামে ১০২৫ জনকে ৫১¾ মন, ২০ তারিখে ৫৭ খানি গ্রামে ১২৩৯ জনকে ৬২ মন, ২৭শে তারিখে ৫৭ খানি গ্রামে ১১৭৬ জনকে ৫৯ মণ, ৩রা আগষ্ট তারিখে ৫৭ খানি গ্রামে ১৩৫৫ জনকে ৬৮মণ ও ১০ই আগষ্ট তারিখে ৫৯ খানি গ্রামে ১৪২২ জনকে ৭১ মণ ২৪ সের চাউল দেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে প্রায় ছয়শত টাকা খরচ হইতেছে। আমাদের বোধ হয় সেবাকার্য্য অগ্রহায়ণ অবধি চলিবে। সম্প্রতি যেরূপ ভাবে কার্য্যের বিস্তৃতি হইতেছে তাহাতে আরও অধিক অর্থ ও বস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তাঁহারা এই দরিদ্র-নারায়ণ সেবাকার্য্যে অর্থ ও বস্ত্র সাহায্য করিয়া পীড়িতেদের রক্ষা করুণ!

নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত হইবে :—

১। উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া। ইতি—

স্বাঃ—সারদানন্দ।

কথাপ্রসঙ্গে।

যদি কোনও ধর্ম্ম বা সত্য আমরা জীবনে এবং সমাজে পরিণত করিতে পারি তবেই তাহার সার্থকতা। যদি কোনও ধর্ম্ম কেবল কথায়, পণ্ডিতজিদের গলাবাজিতেই থাকিয়া যায়, যাহার বাস্তবতা ব্যষ্টি এবং সমষ্টির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ব্যক্তি, সমাজ, জাতি এবং জগৎকে উন্নততর না করে, তবে তাহার থাকা না থাকার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিনা—Aliceএর Wonder Land কিম্বা আকাশকুসুমের অনুসন্ধানে ফল কি?

* * * * *

শাস্ত্র বলিতেছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—দৃষ্ট অদৃষ্ট সবই ব্রহ্ম, "তত্ত্বমসি" —জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভেদ। নানা যুক্তির দ্বারা শ্রীশঙ্কর প্রমুখ মহাত্মারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু উত্তম মস্তিষ্কেরা ব্যবহারিক সত্তার দোহাই দিয়া, নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য, উপর্যুক্ত মহান্ সত্য—ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতীয় জীবনে প্রকাশ বা উপলব্ধি না করিয়া—ছুঁৎমার্গাবলম্বনে এক ঘৃণিত অভিশপ্ত সমুদ্রবৎ পশুসমাজ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবহারে দেখা যায় সর্ব্বব্যাপী অনাদি অনন্ত সত্তা-জ্ঞান-আনন্দ কেবল উচ্চবর্ণের মধ্যেই নিহিত, ঘৃণিত বলিয়া তিনি যেন নীচবর্ণ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন সাধনার প্রথম অবস্থায় ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিতেই হইবে (অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তু যে নীচের মধ্যেও আছেন একথা ভুলিতে হইবে, নচেৎ ছুঁৎমার্গ অবলম্বন অসম্ভব) পরে হঠাৎ একদিন সত্যবস্তু প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বভূতে, প্রীতি ও সহানুভূতি আনিবে। কিন্তু আমরা বলি—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—যে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দ্বৈত, ভেদ ও ঘৃণার কল্পনা করে তাহার

ভেদ জ্ঞানই রহিয়া যায়, আর যে সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে সচ্চিদানন্দ আত্মার একত্ব কল্পনা করে তাহারই যথার্থ সমত্ব লাভ হয়।"

* * *

যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে বিভু আত্মার কল্পনা করেন, উচ্চ-নীচে শ্রদ্ধা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। তাঁহারা অসতের মধ্যেও সতের প্রকাশকে নির্দ্দেশ করিয়া পতিত ঘৃণিতদের জীবন সংগ্রামে উৎসাহিত করেন, আর ভেদদর্শীরা পক্ষান্তরে অসৎকে অসৎরূপেই চিরকাল বদ্ধ করিয়া রাখিতে চায় পাছে নিজেদের মহত্ত্ব নষ্ট হয়।

* * *

যেমন বিদ্যুৎকে কাজে লাগাইতে হইলে ধাতু-তন্ত্রীর প্রয়োজন, সেইরূপ মহৎ হৃদয় প্রসূত চিন্তাশক্তি মনুষ্য সমাজে প্রতিফলিত করিতে হইলে বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যই প্রধান সহায়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিগত সমস্যা সম্বন্ধে নব নব ভাবের দ্বারা আলোকিত করা। তাই বর্ত্তমান সাহিত্যের এক প্রধান উদ্দাম প্রচলিত নীচের প্রতি ঘৃণাপরতন্ত্রতা ত্যাগ করিয়া অসতের মধ্যেও যে মহত্ত্ব সম্ভব তাঁহা দেখাইয়া অসৎকে সৎপথে উৎসাহিত করা। পশু প্রায় ব্যক্তি সমাজে অভাব নাই কিন্তু এ কথাও মানিয়া লইতে হইবে যে উচ্চবর্ণকৃত ভীষণ অবস্থা চক্রে পড়িয়া মানুষ পশুবৎ হইয়া পড়ে—যেরূপ নানা প্রলোভনীয় অবস্থাচক্রের মধ্যে পতিত হইয়া অতি বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরাও মিথ্যা কথা বলেন কিম্বা স্বদেশীয়কে বিদেশ বিভূমে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন না। অতএব পাপ অবশ্য হেয় হইলেও পাপীর প্রতি সহানুভূতি দোষ নহে—বিশেষতঃ যাঁহারা অদ্বৈত বেদান্তের আলোচনা করেন।

* * *

খাদ না থাকিলে গঠন কার্য্য অসম্ভব। নিখুঁত সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা জগতে দুষ্প্রাপ্য। অসুন্দর অংশ পরিত্যাগ করিয়া কাল্পনিক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে কিন্তু মরণকে বিস্মৃতিরদ্বারা মুড়িয়া রাখিলেও সে যেমন আত্মপ্রকাশ করিবেই সেইরূপ জগতের অসুন্দর অংশ কোনও স্থলে গোপন থাকিবে না। বরং মরণকে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বীরের ন্যায় অতিক্রম করিবার পথ সকলকে দেখান উচিৎ।

সেইরূপ সমাজ ও তদঙ্গের কুৎসিৎ ও অসুন্দর অংশের নির্দ্দেশ করিয়া জনসাধারণকে তাঁহাদের অতিক্রম করিবার পথ দেখান উচিৎ। পাপ সর্ব্বথা হেয় তাই বলিয়া পাপী আমাদের বিদ্বেষ ভাজন হইবে কেন? আর তাহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশে আমাদের প্রতি মুগ্ধ হইয়া সে কিরূপে সৎপথে চলিবে? আমরা ত জানি সহানুভূতির দ্বারা বনের পশু পোষ মানে, হিংস্রক শান্ত হয়, বেশ্যা সৎপথাবলম্বী হয়, জগাই মাধাই ভক্ত হয়, গিরীশ ঘোষ মহত্ব লাভ করে।

* * *

মানব-চরিত্র ত্রিগুণাত্মক। তম গুণালম্বীকে হঠাৎ যদি তাহার সকল কদাচার ত্যাগ করিতে উপদেশ দেওয়া যায় তাহা হইলে অভ্যাস-ত্যাগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া হয় সে অস্বাভাবিক উপায়ে মৃত্যুকেই অবলম্বন করিবে আর না হয় সৎপথে প্রবর্ত্তন অসম্ভব জ্ঞানে ভগ্নাশ হইয়া চূড়ান্ত অসৎ হইয়া উঠিবে। বরং—মহত্ব যে তাহার মধ্যে তাজা অবস্থায় আছে, অবস্থাচক্রে পড়িয়া সে হীন কার্য্য করিতেছে—এইরূপ সহানুভূতি-পূর্ণ হৃদয়ে যদি আমরা তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেখাই, তবেই তার ভবিষ্যৎ উত্থান সম্ভব হইবে। নচেৎ তাহাকে ঘৃণা করিয়া তাহার নীচত্ব দেখাইয়া তাহাকে বড় করিতে পারি না—কারণ ঘৃণার ফল প্রতিহিংসা। আচার্য্য বলিতেছেন; "তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের অপেক্ষা ইউরোপীয়েরা বেদান্তকে অধিক পরিমাণে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিয়াছে। আমি নিউইয়র্কের সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া দেখিতাম বিভিন্ন দেশ হইতে লোক আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনার্থ আসিতেছে। তাহাদের দেখিলে বোধ হইত, যেন তাহারা মরমে মরিয়া আছে, পদদলিত, আশাহীন, এক পুঁটলি কাপড় কেবল তাহাদের সম্বল কাপড়গুলিও সব ছিন্নভিন্ন, ভয়ে লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে অক্ষম। একটা পুলিশের লোক দেখিলেই ভয় পাইয়া ফুটপাথের অন্যদিকে যাইবার চেষ্টা। এখন মজা দেখ, ছ'মাস বাদে সেই লোক-গুলিই আবার উত্তম বস্ত্র পরিহিত হইয়া সোজা হইয়া চলিতেছে সকলের দিকেই নির্ভীক দৃষ্টিতে চাহিতেছে। এরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কিসে করিল?

মনে কর, সে ব্যক্তি আরমেনিয়া অথবা অপর কোথা হইতে আসিতেছে সেখানে কেহ তাহাকে গ্রাহ্য করিত না—সকলেই পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত, সেখানে সকলেই তাহাকে বলিত 'তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাকবি গোলাম, একটু যদি নড়্তে চড়্তে চেষ্টা করিস্ ত তোকে পিষিয়া ফেলিব'। চারিদিকের সবই যেন তাহাকে বলিত, 'গোলাম, তুই গোলাম আছিস বা আছিস্, তাই থাক্। জন্মিছিলি যখন, তখন যে নৈরাশ্য অন্ধকারে জন্মিছিলি, সেই নৈরাশ্য অন্ধকারে সারাজীবন পড়িয়া থাক্'। সেখানকার হাওয়ায় যেন তাহাকে গুণ গুণ করিয়া বলিত তোর কোন আশা নাই—গোলাম হইয়া চিরজীবন নৈরাশ্য অন্ধকারে পড়িয়া থাক্। সেখানে বলবান্ ব্যক্তি পিষিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছিল। আর যখনই সে জাহাজ হইতে নামিয়া নিউইয়র্কের রাস্তায় চলিতে লাগিল, সে দেখিল, একজন উত্তম বস্ত্র পরিহিত ভদ্রলোক তাহার করমর্দ্দন করিল। সে যে চিরপরিহিত আর ভদ্রলোকটী যে উত্তম বস্ত্রধারী, তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। আর একটু অগ্রসর হইয়া সে এক ভোজনাগারে গিয়া দেখিল, ভদ্রলোকেরা টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন, সেই টেবিলেরই এক প্রান্তে তাহাকে বসিবার জন্য বলা হইল। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল—দেখিল এ এক নূতন জীবন; সে দেখিল এমন জায়গাও আছে, যেখানে আর পাঁচজন মানুষের ভিতর সেও একজন মানুষ। হয় ত সে ওয়াশিংটনে গিয়া যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া আসিল, হয় ত সে তথায় দেখিল,—দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামসমূহ হইতে মলিন বস্ত্র পরিহিত কৃষকেরা আসিয়া সকলেই প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে করমর্দ্দন করিতেছে। তখন তাহার মায়ার আবরণ খসিয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম—মায়াবশে এইরূপ দুর্ব্বল দাস্য ভাবাপন্ন হইয়াছিল। এখন সে আবার জাগিয়া উঠিয়া দেখিল,—মনুষ্যপূর্ণ জগতের মধ্যে সেও একজন মানুষ।" কিন্তু কৌতুক দেখ এই আমেরিকান জাতি এখন এত মহৎ কিন্তু তাহার উৎপত্তি—ইউরোপীয় নরসমাজের তথাকথিত আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত হইয়া।

* * * *

মহতের কর্ম্ম অসৎকে সৎপথ দেখান, অসুরকে দেবতা করা—মহত্ত্বের ইহাই একটী প্রবল লক্ষণ। ইহার অভাব যেখানে দৃষ্ট হয় সেখানে মহত্ত্ব পূর্ণতা লাভ করে নাই বুঝিতে হইবে। এক প্রকারের পণ্ডিত-মণ্ডলী আছেন যাঁহারা জ্ঞানরশ্মি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণ পেটিকার মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া ইতরকে অজ্ঞতার মধ্যে নিক্ষেপ করেন, অথচ ইতরেরই পরিশ্রমোপার্জ্জিত অন্নের দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছেন একথা তাঁহারা স্মরণ রাখেন না। ইহার ফল ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। নির্য্যাতিত, তথাকথিত হীন সম্প্রদায় যখন ধৈর্য্যের সীমানা অতিক্রম করিয়া অসুরের ন্যায় সত্বগুণীদের স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে তখন বহুকালের চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রসূত দেবসভ্যতা, পলকে প্রলয় করিয়া জগতের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে। উচ্চ ও নীচ উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষের ফল কি ভয়াবহ উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে বর্ত্তমানের একটি রুশিয় সঙ্গীতের অনুবাদ যাহা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছে, উদ্বোধন পাঠকদের নিকট ধৃত করিতে আমরা ইচ্ছুক,—

"দুনিয়া জুড়ে যে জ্বলেছে অনল
　　আঁচে তার মোরা মুষ্ড়ে গেছি।
গলা ছেড়ে কর চেঁচামেচি
　　"দমকল! দমকল!"
মুরিলোর সব ছবিগুলি
　　জ্বলিছে বাতাসে শিখা তুলি'।
কর্ণেই আয় রাসিনের পুঁথি তেল ঢেলে
আগুন লাগাই পথে ফেলে,
তবুও খানিক আলোকিত হবে পথের ধূলি।
'কটা' দলেদের সেপাই দেখিলে চালাবে গুলি।
র‍্যাফেলকে যদি কিম্বা পাও রাস্ত্রেলিকে,
কেউ তারা যেন হাতছাড়া হয়ে রয় না টিকে।
পুস্কিন আর তাঁরি মতো সেকেলে লেখা
ঝাড়ে মূলে ছেড়ে যাক্ আমাদের এই এলাকা।"

অজ্ঞাত-দেব-ভাব, আসুরিক মদে মত্ত রুশিয় গণশক্তির এই ত

স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অভিমত। অতঃপর তাহাদের দর্শনেতিহাস সম্বন্ধে অভিমত পাঠ করুন,—

"জার্ম্মাণী, তব ভাবরতনের যতেক পুঁজি
এই ধ্বংসের দাঁতের জাতায় দাওনা গুঁজি !
যেখানে যা আছে পুঁথিপত্তর
যত বাতুঘর সেই সকলি
বন্যাবেগের মুখে এনে দাও জলাঞ্জলি।
এসো ছোকরারা শণি দুরন্ত,
বেপরোয়া হয়ে খিঁচাও দন্ত
মরণেরে করে সাথী
কাণ্ট্-দর্শন মাড়াইয়া নাচো
তাণ্ডব তালে মাতি'।
বার করো তলোয়ার, রুশিয়া হুঁশিয়ার !!!
কেড়ে নেবার ছিনিয়ে নেবার
তৃষ্ণা তোমার কোথায় এবার ?
বার করে আন্ কোথা ক্ষীণ প্রাণ
টলষ্টয়ের দলে,
বোঝা বোঝা মতবাদ জড়ো করে
লুকায়েছে তার তলে,
ন্যাংচা পায়ে পারবে না ত হাঁটিতে,
হিড় হিড় করে দাড়ি ধরে
এনে আছড়ে ফেল মাটিতে।

* * *

রুশিয়ায় টলষ্টয়, টুরগেনিভ, ডষ্টয়ভেস্কি, ল্যাভরফ, বাকুনিনের মত সদাশয় ব্যক্তি জন্মান সত্ত্বেও এ ব্যাভিচার হইল কেন? জাতীয় ক্রমবিকাশ অর্থে যখন অতীতের রক্ষা এবং বর্ত্তমানের উন্নতি, তখন অতীতের সম্পূর্ণ ধ্বংশ করিতে রুশিয়া এত দৃঢ় সংকল্প কেন? কারণ অতীতের নিকট হইতে তাহারা কদাচ সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় নাই, তাই

আজ অতীতের সকল জিনিষই তাহাদের নিকট হেয় ও পরিত্যাজ্য। তাই আমরা বলিতে চাই যে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে পাপীকে ত্যাজ্য না করিয়া যাহাতে তাহারা মহতের সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, ও সাহায্য পায় সেই চেষ্টাই সমধিক কর্ত্তব্য, যেন উচ্চ ও নীচের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান আমরা সৃষ্টি না করি। পশু-প্রায় মানব সমাজের ব্যাধি স্বরূপ। ব্যাধির অন্তর প্রতিকার দ্বারা সমাজ পুষ্ট হয়, ব্যবচ্ছেদের দ্বারা শরীর যন্ত্র ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

দিব্য-দর্শন।

(শ্রীসাহাজি)

এই যে মাটির ধরণী,
এরে, কতই ঠেলেছি চরণে,
একি দেখি আজি, বন্ধু,
এই, আলোকে পুলকে স্বপনে,—
মাটিতে যা আছে, সজনি,
দেখি, তার বেশী নাই তপনে।
দেবালয়ে দারু মূর্ত্তি,
কভু, করিনি ব্রহ্ম ভাবনা,
পূজিনি পুতলি, বন্ধু,
তবু, জাগে আজি একি চেতনা,—
ব্রহ্মে, দারুতে অভেদ,
ওরে, প্রভেদ কোথায়, কহ না?
মৃণ্ময়ী বলি ভ্রমেও
কভু, নোয়াইনি মাথা যেখানে,
চিন্ময়ী, দেখি চাহিয়া,
সেথা, আলো করে আজি গোপনে,
নরের মাঝে নারায়ণ,
সখি, ঐই দেখি আজি ধেয়ানে।

গৌতম বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য।

(শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার)

১। জাতীয় জীবনের অতীত যুগের ইতিহাস যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই দুইটী বিশিষ্ট মূর্ত্তি মানসপটে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। ইহাদের বৈশিষ্ট এমনই পরিস্ফুট যে ইহাদের সমান ধর্ম্ম আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তিতে মানবজাতির ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গৌতমবুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য ভারতাকাশের দুইটী উজ্জ্বলতম নক্ষত্র—ভারতের সাধনা ও সিদ্ধির দুই মহান জ্যোতিঃস্তম্ভ। অতীত যুগের ইতিহাস আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—এই দুই মহামানব, মানব জাতির *পরম ও চরম লক্ষ্যের দীপ-শিখা মাথায় লইয়া*—জলধিতীরস্থিত আলোকস্তম্ভের ন্যায় সংসার সাগর যাত্রী ভবিষ্যমানবের মহাপ্রয়াণের পথ প্রদর্শনের জন্য। কল্যাণের পথে, জ্ঞানের পথে, ইঁহারা মানব-জাতিকে কতদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, মানব জাতির চিন্তা স্রোতকে ভাবের কোন্ তুঙ্গশিখরে উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহার সম্যক্ পরিচয় লইবার সময় এখনও বহুদূরে অবস্থিত।

২। গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থান উত্তর ভারতের উত্তর সীমান্তে—শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম সীমান্তে। একজনের জন্ম রাজপ্রাসাদে, রাজোচিত ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে—অপরের জন্ম চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে। বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহ, শক্তি ও স্বাধীনতার ক্রোড়ে একজন পালিত ও বর্দ্ধিত—অপরের পুষ্টি শাস্ত্রের সহস্র বিধিনিষেধের মধ্যে। বুদ্ধদেব ২৯ বৎসর বয়সে গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আচার্য্যদেব অভুক্ত বৈরাগী গার্হস্থ্যজীবনের ত্রিসীমার বহির্ভূত। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ ৩৫ বৎসর বয়সে, তিরোধান ৮০ বৎসর বয়সে—আচার্য্যদেবের ৩২ বৎসর বয়সে জীবনলীলার অবসান।

৩। জীবন প্রণালীর পার্থক্য আকাশ পাতালের মত। একজনের জীবনে গতির প্রারম্ভ স্বাধীন চিন্তায়, অপরের শাস্ত্রচর্চ্চায় ও শাস্ত্র বিচারে। কিন্তু উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ এক, ব্রতও এক। নিজের মুক্তি ও জগতের হিত। উভয়েই নিজনিজ সাধনার বলে ও তপস্যার প্রভাবে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের স্তূপীকৃত ভেদরাশি ঠেলিয়া ফেলিয়া মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও দেশ কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া উভয়েই বীরের মত প্রবেশ করিয়াছেন—অদ্বৈতের দেশে, লীলার দেশ অতিক্রম করিয়া নিত্যের দেশে, ইন্দ্রিয়ের অধিকার ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে, মৃতের রাজ্য ছাড়াইয়া অমৃতের পারাবারে—অমৃতের অসীমসাগরে অবগাহন করিয়া উভয়েই জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছেন, নামরূপ হারাইয়া ব্যষ্টি জীবনের গতি শেষ করিয়াছেন।

৪। কিন্তু কোন্ এক অলঙ্ঘ্য প্রকৃতির অনুশাসনে, উভয়েই ফিরিয়া আসিয়াছেন—শোকদুঃখময় বাস্তব জগতের মধ্যে। উভয়েরই মুক্ত আত্মা মুক্তির আনন্দ বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্মের বন্ধন গ্রহণ করিয়াছে। উভয়েরই আমরণ প্রযত্ন জগদ্ধিতায়, সর্ব্বমুক্তির জন্য সমষ্টি জীবনকে অগ্রসর করিয়া দিতে। বুদ্ধদেব ফিরিয়া আসিয়াছেন একখানি করুণা-স্নিগ্ধ হৃদয় লইয়া, বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন লইয়া; সঙ্কল্প—ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন—হিংসা ও ভেদক্লিষ্ট মানব সমাজকে অহিংসার ঐক্য মন্ত্রে দীক্ষিত করা অমৃতের দ্বার সকলের নিকট খুলিয়া ধরা। আচার্য্যদেব ফিরিয়াছেন একখানি ব্রহ্মময় অহং ও শানিত বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া। জীবনের প্রতিপরমাণু ব্রহ্মানুভূতির এক তারে বাঁধা; সঙ্কল্প—বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। অমোঘ যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ বলে ব্রহ্মানুভূতিকে বুদ্ধির স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানব চিত্তভূমির সহিত তাহার যোগ স্থাপন করিয়া দেওয়া।

৫। শিক্ষা ও সঙ্কল্পের পার্থক্য উভয়ের কর্ম্মজীবনে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। বুদ্ধদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের বিকাশ—হৃদয়বত্তায়, ভাবের গভীরতায় ও বিশাল কর্ম্মপ্রেরণায়; আচার্য্যদেবের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট—

সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্ম মন্থনে ও বুদ্ধির প্রখরতায়। বুদ্ধদেব স্বাধীন চিন্তার পুরোহিত—আচার্য্যদেব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চিন্তাপ্রণালীর প্রতিনিধি। একের চরম প্রমাণ আত্ম-প্রত্যয়—অপরের আত্ম-প্রত্যয় শাস্ত্র নির্দ্দেশ ও জাতি প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত,—চরম প্রমাণ শাস্ত্র। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব এক অভিনব ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন এবং এক নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছেন—আচার্য্যদেব বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, বৈদিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। বুদ্ধদেব জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া জনসাধারণের ভাষায় জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রচার করিয়াছেন —আচার্য্যদেব বিদ্বৎসমাজের কাছে দর্শনের ভাষায়, বিজ্ঞানের আকারে প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের বীরবাণী স্নিগ্ধ মধুর করুণরসাত্মক, সংসারী মানবের সুখদুঃখের সহানুভূতি ব্যঞ্জনা দ্বারা সিক্ত, দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় তাহা পতিত জনেরও জীবন পবিত্র করিয়া দেয়—আচার্য্যদেবের বাণী তরল বহ্নির মত তেজোময়ী—তাঁহার নিশ্বাসের প্রকম্পনে মায়ার সংসার ভস্মীভূত হইয়া উড়িয়া যায়। বুদ্ধদেব প্রেম ও নীতির জগতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন—আচার্য্যদেবের প্রভাব তত্ত্ব ও বুদ্ধির জগতে।

৬। তত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে বুদ্ধদেবের প্রচার সাধনার দিক হইতে—আচার্য্যদেবের প্রচার সিদ্ধির দিক্ হইতে। বুদ্ধদেবের লক্ষ্য ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম ও কর্ম্ম সমন্বিত সাধনাময় জীবন গঠন—আচার্য্যপাদের লক্ষ্য তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা, একটা সমন্বয় ভূমি আবিষ্কার করা। চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধদেব মৌন রক্ষা করিয়াছেন—চরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই আচার্য্যের প্রধান কীর্ত্তি। একজন সেখানে নির্ব্বাক—সেইখান হইতেই অপরের বাণীর উদ্ভব। বুদ্ধদেব বিশ্বকে তুলিয়া ধরিয়াছেন বিশ্বাতীতের দিকে—আচার্য্যদেব বিশ্বাতীতকে টানিয়া আনিয়াছেন বিশ্বের কাছে। এক জনের গভীর মৌন বিশ্বাতীতকে দূরে রাখিয়াছিল—অপরের মুখর বাণী তাহাকে নিকটতম করিয়া ধরিয়াছে।

মর্ত্ত ছুটীয়াছে স্বর্গের দিকে—স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছে মর্ত্তের দিকে। সাধনা ও সিদ্ধি, নীতি ও তত্ত্ব, কর্ম্ম ও জ্ঞান মানব জীবনে ধরা দিয়াছে।

মনে হয় উভয়ে উভয়ের পরিপোষক ও পরিপূরক। যেন একই আত্মার দ্বিবিধ বিকাশ।

৭। জাতীয় জীবনের ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—শঙ্করাচার্য্য বুদ্ধদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী, কেননা শঙ্করাচার্য্যই বৌদ্ধগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টি ও প্রচারের প্রকৃত ইতিহাসের দিক হইতে দেখিলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে উভয়েই যুগোপযোগী কর্ম্ম প্রণালীর উদ্ভাবন দ্বারা ভারতের সনাতন জীবনাদর্শেরই সংরক্ষণ ও প্রচার করিয়াছেন। উভয়েই একই লক্ষ্যের বাহক ও প্রচারক। বুদ্ধদেবকে শাস্ত্রসীমানার বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রচার করিতে হইয়াছে—আচার্য্যদেবকে শাস্ত্রেরই প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রের পক্ষই সমর্থন করিতে হইয়াছে। বৈদিক সমাজের বাহিরে দাঁড়াইয়াও বুদ্ধদেব এই স্বরূপগত সত্যের প্রভাবেই পরবর্ত্তী কালে অবতার বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ জাতীয় জীবনের উপাস্য আদর্শের প্রতীকরূপে পরিণত হইয়াছে।

৮। মানব জাতি এই দুই মহাপুরুষকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রণিধান যোগ্য। বিশাল কর্ম্মপ্রেরণা ও বিশ্বপ্রেমের প্রভাবে গৌতমবুদ্ধের আত্মা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি যে নূতন আধ্যাত্মিক তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পৃথিবীর প্রতি কোণে তাহার ধাক্কা লাগিয়াছিল। সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইলেও আজিও অর্দ্ধ পৃথিবী তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীতে তাঁহার প্রতি মানব জাতির শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের তথা বৌদ্ধধর্ম্মের যাঁহারা চির বিদ্বেষী তাঁহারাও বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বের কাছে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যাঁহারা নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী বা বৈজ্ঞানিক, তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বুদ্ধদেবের আদর্শ মূর্ত্তি বিশ্বমানব চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৯। আচার্য্যের আত্মা শাস্ত্রের অর্গলবদ্ধ মন্দিরে ধ্যানমগ্ন। শাস্ত্র-

জীবনের সঙ্গে তাঁহার জীবন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকায়, তাঁহার প্রখর প্রতিভা শাস্ত্রের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই। মানব সাধনার যে তুঙ্গ শিখর হইতে তাঁহার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, বর্ত্তমান পৃথিবীর চিত্তভূমি তাহার বহু নিম্নে অবস্থিত। ভারতের বাহিরে ক্বচিৎ কোনও পণ্ডিত এক-আধটু আলোচনা করিলেও, আচার্য্যের দর্শন তাঁহাদের কাছে প্রহেলিকামাত্র। আচার্য্যের চিত্ত-মন্দিরে প্রবেশের যে দুর্গম পথ, তাহা চলিবার উপযুক্ত জ্ঞান ও নির্ভীকতা তাঁহাদের নাই।

১০। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে এই দুই মহাপুরুষ কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ আদর্শ ভারতবর্ষে একবার প্রকট হইয়াছিল, জাতীয় জীবনে, রাষ্ট্রে ও সমাজে সম্যক পরিগৃহীত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ভারতের তাহাই শ্রেষ্ঠসম্পদ, গৌরবের অবদান। সম্রাট অশোকের পরই সে গৌরব রবি অস্তমিত হইয়াছে। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া জাতি-স্মৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতমাতা তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানের এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছেন। সম্প্রদায় প্লাবিত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অনস্তিত্ব বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু তাহার কারণও রহিয়াছে। বুদ্ধদেব স্বাধীন চিন্তা ও আত্মপ্রত্যয়কে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, জাতিপ্রত্যয় বা শাস্ত্রপ্রমাণকে স্বীকার করেন নাই। আত্মপ্রত্যয়কে সম্মুখে ধরিয়া জাতীয় জীবন-ধারার সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে পারেন নাই—জাতির জীবন-ধারার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। জাতির অতীত জীবনের সঙ্গে সমন্বয় না রাখায় জাতির ভবিষ্যৎ জীবনে স্থান পাইতে পারেন নাই। তাঁহার আবির্ভাবের পর ভারতবর্ষে একটা ভাবের বন্যা, জ্ঞান ও কর্ম্মের উচ্ছ্বাস আসিয়াছিল বটে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয় তাহার সফলতার মূল কারণ। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সফলতা বিদ্রোহী রাজপুত্রের অথবা বিজাতীয় রাজার রাজনৈতিক সফলতার মত ক্ষণিকা কিন্তু বুদ্ধদেবের অবতারীকৃত আদর্শ-মূর্ত্তি জাতি-চৈতন্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ও থাকিবে।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলুপ্তি ইহাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে জাতীয় জীবন ধারার সঙ্গে যে সব প্রতিষ্ঠানের যোগ নাই অথবা যে সকল প্রতিষ্ঠান জাতীয় জীবনের স্বরূপের অঙ্গীভূত হইতে পারে নাই, তাহাদের বিলয় অবশ্যম্ভাবী।

১১। শঙ্করাচার্য্য বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কারক ও প্রতিনিধি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির যুগে, যখন অপধর্ম্মসমূহ প্রবল হইয়া ধর্ম্মবিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল, আচার্য্যদেব অলোকসামান্য প্রতিভাবলে সেই বিপ্লবের গতিরোধ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপধর্ম্মের বিনাশ, বৈদিক মোক্ষমার্গের উদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের অদ্ভুত কীর্ত্তি। বৈদিক সমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, এবং ভারতবর্ষের সমগ্র হিন্দু সমাজ-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে এইভাবে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি যে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা, ভারতের সকল সম্প্রদায়ে তাহা সম্যক আদৃত হয় নাই। তিনি সর্ব্বত্র বিজয়ী বীরের সম্মান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যে শক্তির সাহায্যে এই বিজয় লাভ অদ্বৈতবাদরূপ সেই শক্তি সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় নাই। হিন্দুসমাজ তাঁহার জীবনের কর্ম্মভাগকে, বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশরূপ কর্ম্মের ধ্বংসাত্মক ভাগকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানভাগকে, জ্ঞানের গঠন ভাগকে সেই ভাবে গ্রহণ করে নাই। তাঁহার 'জগদ্‌গুরু' উপাধির সার্থকতা রক্ষিত হয় নাই। অধিকাংশ শাস্ত্রীয় সম্প্রদায় তাঁহাকে সম্যকরূপে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে। অনেকেই তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং সততই নিরাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সন্দেহের মধ্যেই এমন একটা গভীর সত্য নিহিত ছিল যাহা ভারতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যদের মধ্যে ভাবের ঐক্য দেখাইয়াছে।

১২। বুদ্ধদেব শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের জীবন শাস্ত্র-সর্ব্বস্ব। যে প্রদীপ্ত প্রতিভা ও গভীর সত্য দর্শন একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া জগতে জ্ঞানবীরের প্রাপ্য সম্মান অর্জ্জন করিতে পারিত, সেই ব্যক্তিত্বের মহিমা শাস্ত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। বুদ্ধদেব জাতি-

প্রত্যয়কে বরণ না করিয়া বিশ্বকে বরণ করিয়াছিলেন। প্রেম ও নীতির জগতে যে মহনীয় রসমূর্ত্তি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, মানবজাতির অন্তররাজ্যে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্যদেব স্বাতন্ত্র্য উপেক্ষা করিয়া বিশ্বকে না চাহিয়া জাতিপ্রত্যয়কে, বৈদিক সমাজকে বরণ করিয়াছিলেন। জ্ঞান-জগতে তিনি যে অপূর্ব্ব বীরমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া বিশ্ব-মানবের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

১৩। বর্ত্তমান ভারতের ভাবজগতে বুদ্ধ-আত্মার প্রেরণার প্রভাব নিতান্তই কম নয়। বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট মূর্ত্তি বৈষ্ণবরসমূর্ত্তিতে বিলীন হইয়া বহুকাল হইল জাতিচৈতন্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু তাঁহার প্রেম, কর্ম্ম ও জ্ঞানময় জীবনের পরিশুদ্ধ আদর্শ মূর্ত্তি প্রেমিক কর্ম্মযোগীর বেশে জাতিচৈতন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটা স্পষ্ট প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে।

আচার্য্যদেবের প্রেরণার প্রভাব সবেমাত্র অনুভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে উদাত্ত সুর ও তেজোময়ী বাণী জাতি-হৃদয়ে তুল্য প্রতিধ্বনি না পাইয়া মন্দির প্রাঙ্গনে শাস্ত্র ও বিদ্যার কঠিন কারাগারে আবদ্ধ ছিল, আজ তাহার মুক্তির দিন আগতপ্রায়। যে অদ্বৈত-ব্রহ্ম-বৈদিক-ঋষির সমাধিমগ্ন চিত্তে চকিতে প্রতিভাত হইয়া ছিল, বুদ্ধির স্তরে যাহার প্রতিষ্ঠা—আচার্য্যদেবের জীবন ব্রত, বর্ত্তমান ভারতের ভাব-জগতে তাহা যেন স্বতঃস্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। ধ্যানলব্ধ শাস্ত্র দৃষ্টি সহজ জ্ঞানের মধ্যে ধরা দিতেছে, আত্মিক জ্ঞান বুদ্ধির স্তরে নামিয়া আসিতেছে। ব্যবহারিক জগতে তাহার কার্য্যকারিতার, সম্ভাব্যতার পরিচয় পাইয়া ভাবুক কর্ম্মীর হৃদয় এই আকস্মিক জ্ঞানপ্লাবনে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান ভারতের আদর্শকে যাঁহারা মূর্ত্তি দান করিয়াছেন, তাঁহারা গৌতম বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য এই দুই যুগাবতারের আপাতঃ দৃষ্টিতে বিরোধী সাধনাকে একাধারে কেন্দ্রীভূত করিয়া তুলিয়াছেন। এই মহাসমন্বয়লব্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ইহা ভাবিতে পারা যায় যে, যে আত্মা বুদ্ধরূপে শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়াছিলেন, চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে

মৌন অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই আত্মাই পূর্ব্ব যুগের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আচার্য্যের বেশে শাস্ত্র ও শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে জীবনের যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাল ও কালগত বৈচিত্র্য বিলোপ করিয়া আজ ভাবিতে পারা যায় গৌতমবুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েই ভারতের সনাতন আদর্শের বিধারক, সংরক্ষক ও প্রচারক।

১৪। বিজাতীয় শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বর্ত্তমান ভারতের চিত্তভূমি এতটা নামিয়া গিয়াছে যে নির্ব্বাণ ও মোক্ষের নামে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—নির্গুণ ব্রহ্মবাদের নামে তাঁহাদের আত্মা শিহরিয়া উঠে, বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য্যের নামে অনেক শিক্ষিত লোক এজন্য খড়্গহস্ত। তাহাদের ক্ষুদ্র হস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়্গাগুলি স্বহস্তেই নিবদ্ধ থাকিবে। হিমাচলের বক্ষে বামনের পদাঘাতের মত তাহাদের প্রযত্ন কৌতুকেরই যোগ্যরস সৃষ্টি করিবে। যাঁহারা সনাতন আদর্শের বিধারক ও প্রচারক মানবজাতির অন্তর্জগতে তাঁহারা স্বমহিমায় নিত্য বিরাজমান। মানবসমাজ তাঁহাদের জীবন-স্মৃতির পূজা করিতে বাধ্য।

স্বামিপাদ শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্মরণম্।*

(শ্রীকালিপদ তর্কাচার্য্য)

(সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ)

যদা ধর্ম্মো গ্লানিং বহতি বহুধা দুর্গতিবশাৎ
অধর্ম্মা বর্দ্ধন্তে জগতি জনতুঃখায় মহতে।
তদা দীপ্তপ্রেমা কিমপি বপুরাধায় ভগবান্,
বিনেতুং দৌর্গত্যং চরতি সুচিরং ক্ষৌণিবলয়ে॥
স্বদৈশেকপ্রীত্যা বিমলতমনীত্যা প্রথিতয়া
কয়াচিদ্ বিখ্যাতো জগতি বহুমানং খলু ভজন্।

* বিবেকানন্দ সোসাইটীর শ্রীবিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভায় পঠিত।

যত্র কঃ সৌভাগ্যাদজনি ধরণৌ ভারতনৃণাম্
বিবেকানন্দোঽসৌ জয়তি যতিবৃত্তান্তবিবুধঃ ॥
বিদিত্বা বেদান্তং বিবিধবিধিশাস্ত্রং সুমনসাং
তপঃ স্মারং স্মারং মুনিনিয়মসারং পরিচরন্।
চরন্ দেশে দেশে নিরদিশদহো তত্ত্বমতুলম্
বিবেকানন্দোঽসৌ জয়তি যতিবৃত্তান্তবিবুধঃ ॥
যদীয়ো বেদান্ত প্রথম নবসিদ্ধান্তমহিমা
হিমার্ত্তানাং দীপ্তো রবিরিব দদে শান্তিমসমাম্।
য একঃ প্রোদ্দীপ্ত প্রতিভয়জড়ং ধর্ম্মমতনোৎ,
বিবেকানন্দোঽসৌ জয়তি যতিবৃত্তান্তবিবুধঃ ॥
পবিত্রে চারিত্র্যে নিরবধি বিনীতেন বিধিনা
সুবিজ্ঞাতো লোকে বিবিধবিধিমার্গানুপদিশন্।
মহামোহধ্বান্তং সপদি লয়মানীয় মহসা
বিবেকানন্দোঽসৌ জয়তি যতিবৃত্তান্তবিবুধঃ ॥
গুণনামাধারঃ শুভচরিতসারো যতিবরঃ
প্রসারং ধর্ম্মাণাং বিদধদপি পারে জলনিধেঃ।
নিধিং শাস্ত্রাম্ভোধেরনুগুণগুণং যঃ সমতনোৎ,
বিবেকানন্দোঽসৌ জয়তি যতিবৃত্তান্তবিবুধঃ ॥
বহূনাং শিষ্যাণাং গুরুরমরধামাতিথিরভূৎ
সমুদ্দেশ্যং লোকে সুচিরমুপদেষ্টুং ব্যবসিতঃ।
তমাদর্শীকৃত্য প্রচরতি সতী শিষ্যসমিতিঃ
ততো জীয়াদেষা সকলশুভসম্পাদনপরা ॥
জীয়াৎ স্বামিবরস্য ভূমিবলয়ে ধর্ম্মোপদেশাবলী,
জীয়াদ্ গৌরবদীপ্ততত্ত্ববিভবঃ প্রাচীনশাস্ত্রাশ্রয়ঃ।
জীয়াৎ স্বামিবিনীতশিষ্যসমিতিঃ সর্ব্বোচ্চভাবপ্রিয়া,
জীয়াদ্ ভারতভূতলং সুবিপুলং জন্মাবনী স্বামিনঃ ॥

বিশ্বজনীনতা।

(শ্রীসুব্রহ্মণ্য মিত্র বি, এ।)

"মহাশয়, আপনার অপূর্ব্ব বাণী আজ সমগ্র আথিনীয় রাজ্য তোলপাড় করিতেছে, আপনি কোন্ দেশের লোক, কোথায় আপনার বসতি—আমার জানিবার জন্য বড় ঔৎসুক্য হইয়াছে, কৃপা করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তরদানে বাধিত করিবেন কি ?"

অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির ব্যগ্রতা দেখিয়া উপদেশরত মনীষী, মহাত্মা সক্রেটীস একটু থমকিয়া গেলেন—তাঁহাকে একটু অপ্রতিভ হইতে দেখা গেল! কিন্তু কি করিবেন,—প্রশ্নকর্ত্তার সমগ্র মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া একটা প্রবল ব্যাকুলতার এবং পরম হৃদ্যতার ভাব পরিস্ফুট দেখিয়া, মহাত্মাকে উত্তর দিতে হইয়াছিল। শান্তভাবে সহাস্যবদনে সক্রেটিস বলিলেন—"আমার কোন্ দেশে বাস জানিতে ইচ্ছুক হয়েছেন ?—তা মহাশয়, আমি এই বিশ্বেরই একজন বাসিন্দা"।

পাশ্চাত্যজগতে ইহাই হইল চিরবিশ্রুত বিশ্বজনীন ভাবের কুলজী—প্রথম সূচনা—পণ্ডিতদিগের মুখে শুনিতে পাই। তাই পূর্ব্বোক্ত উক্তিটা প্রতীচীর ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে সযত্নে লিখিত রহিয়াছে। বাস্তবিকই ইহা মহতেরই উপযুক্ত মহনীয় উক্তি!

সক্রেটিসের সুরে সুর মিলাইয়া আজ অনেকেই বিশ্বজনীনতার জয়-গান গাহিতেছেন—বিশ্বজনীনতার লীলাস্থল এক নবরাজ্যের কল্পনায় তাঁদের প্রাণ আজ মাতোয়ারা—ভরপুর—আমরা বলি, উহা বাস্তবে পরিণত হইলে বাস্তবিকই মানবের সমূহ-কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী, পৃথিবীতে মৈত্রী-করুণা-সাম্যের নূতন মধুচক্র রচিবার তোমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হউক! বর্ত্তমানের চাঞ্চল্য-রেষারেষির যবনিকাপতনের অবসানে আমাদের সবাকার চিরকাঙ্ক্ষিত বিশ্বেতিহাসের সেই শুভ-সুন্দর পরিণতি সন্দর্শনে আমরা মানবজন্ম সফল করিবার জন্য সকলেই বিশেষ ব্যগ্র—

নয়ন-মন ভরিয়া বিভিন্ন জাতিরূপ বহুসন্তানপরিবৃতা বিশ্বজননীর সেই অপরূপ শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইব—তাই মনে হয়। প্রতি জাতীয়-ইতিহাসের ভাগ্যনিয়ন্তা শ্রীভগবানের অস্ফুট আহ্বানবাণী যেন আজ সকল জাতির নেতাদিগকে ঐ উদ্দেশ্যে ডাক দিতেছে—'সর্ব্ব জাতীয় সঙ্ঘের' (League of Nations) ইহাই হইল প্রধান সমস্যা।

সেই জন্যই ব্যষ্টিভাবে, সমষ্টিভাবে এই বিশ্বজনীনতার বিষয় ভাবিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে—আমাদিগের বক্তব্য কি ?

সার্ব্বজনীনভাবে পৌছিয়া সকল জাতির মানুষকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে যখন প্রকৃতই আমরা সক্ষম হইয়া উঠিব সেটী আমাদের জীবনে বাস্তবিকই একটী শুভদিবস বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। উহা যে একটী শ্লাঘনীয় আদর্শ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমাদের নাই। জীবনব্যাপী সাধনার উহাই শ্রেষ্ঠ সাফল্য। কিন্তু একটী কথা আছে। প্রথমকার এবং মাঝখানের ধাপগুলি না ছুঁইয়া একেবারে মাটিতে দাঁড়াইয়া করামলকবৎ চন্দ্রমা পাইবার ন্যায় অত্যুচ্চ শিখরে পৌছাইবার প্রয়াস অনেক সময়ে সুলভ চপলতার পরিচায়কমাত্র হইয়া থাকে, চাই কি প্রায়শঃ বাতুলতার লক্ষণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—একথা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। বিশ্বজনীন হইতে গেলে তার জন্য শিশুকাল হইতেই একটা বিশেষ পৃথক সাধনা, ভূয়োভূয় প্রয়াস ও পরিশ্রমের আবশ্যক। সে শিক্ষা-দীক্ষা চপল বিশ্বজনীনদিগের মধ্যে অনেকেরই নাই। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি জাতীয়ভাব-রূপ মধ্যমসোপান না মাড়াইয়া একেবারে সার্ব্বজনীন হইতে পারেন তিনি আমাদিগের নমস্য—তবে সাধারণের পক্ষে উহা সব সময়ে সম্ভব হইতে পারে না—ঐরূপ ব্যক্তি "লাখে না মিলয়ে এক"—কারণ অতিমানবের (ইহাই ইঁহাদের উপযুক্ত আখ্যা) সংখ্যা পৃথিবীর ইতিহাসে বাস্তবিকই অল্প।

আমাদিগের মনে হয় জাতীয়ভাবরূপ সোপান অবলম্বনেই আমরা আমাদের আদর্শ সার্ব্বজনীন জীবন লাভে ধন্য হইতে পারি। জাতীয়তাই আমাদের বিশ্বপ্রেমরূপ মহাসাগরসঙ্গমে লইয়া যাইবার তরণী—আদর্শ—লক্ষ্য কিন্তু সেই। ঐ কারণেই আমরা যখন দেখি কোন চপল যুবক 'ভুঁইফোঁড়ের'

ন্যায় কিয়োটো হইতে চিলী পর্য্যন্ত বাত্যাহতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর সকলকে বিশ্বজনীনতার উপদেশ দিয়া অনুক্ষণ বলিতেছে—"স্বদেশ বলিয়া আবার কিছু আছে নাকি,—ওরে সঙ্কীর্ণমনা ?"—তখন আমরা বেশ বুঝি যে ইহা সাধনসাপেক্ষ—মনের উদারতা-জ্ঞাপক উক্তি নহে। ঐরূপ যুবক আমাদের সকলের হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। অস্মদ্দেশে আজিকার দিনে যে বিশ্বজনীনতার নব-হিল্লোল উঠিয়াছে তাহাতে যুবকজনের চপলতাই বেশী দেখিতে পাই।

পাশ্চাত্য ইতিহাসের আরও দু একটী দৃষ্টান্ত ইঁহাদের মধ্যে অনেককে গর্ব্বভরে আবৃত্তি করিতে দেখা যায়। যখন বহিঃশত্রু আসিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা হরণে উদ্যত, যখন জার্ম্মাণির রাষ্ট্র, সমাজ—সকল ক্ষেত্রেই এক বিরাট আন্দোলন, চাঞ্চল্য ও ভাঙ্গণের ভীষণ রব উঠিয়া সকল প্রাণে আতঙ্ক আনিল—সেই সময়ে স্বদেশ স্বজাতির সকল কল্যাণ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে হিগেলের ন্যায় মনীষী দার্শনিকের, গ্যেটের ন্যায় কল্পনাপ্রিয় নাট্যাচার্য্যের এবং লেসিঙের ন্যায় উচ্চদরের কবির পক্ষেই বিশ্বজনীনভাবে ভরপূর হইয়া আত্মচিন্তায় রত থাকা শোভা পায় এবং উচ্চকণ্ঠে প্রচার করা চলে যে স্বাদেশিকতা একটা "বীরোচিত দুর্ব্বলতা" (Heroic weakness)। কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই সার্ব্বজনীনতা সত্য সত্যই জীবনে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে সাধারণের উহা পথ নহে—মার্কিন ঐতিহাসিক মায়ার্সের এ মত সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। সার্ব্বজনীনতার আবরণে অনেকেই এক নূতন প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমাদিগের মনে হয়, ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে আমরা প্রত্যেকেই বিধাতার কোন এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই এক বিশেষ পরিবারে, এক বিশেষ সমাজে ও এক বিশেষ জাতির মধ্যে জন্ম লইয়াছি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাই পরিবার-গত, সমাজ ও জাতিগত কতকগুলি সংস্কার ও পরম্পরাগত জনশ্রুতির উত্তরাধিকারী হইয়াছি। আর ইহাও দেখিতে পাইব যে আমাদের পূর্ব্বকালের

জাতীয়-ইতিহাস সর্ব্বদা উন্নতির একটা বিশিষ্ট পথের ইঙ্গিত করিতেছে—একমাত্র জাতীয়ভাবে ভাবিত হইলেই আমরা অতীতের উপদেশ ও বাণী সঠিক প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিব। আর তা ছাড়া ইহা যেন প্রকৃতির নিয়ম বলিয়াই বোধ হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে আপনার পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর সকল সমস্যা-সমাধানে আত্মনিয়োগ করুক্। সে নিয়মের ব্যতিক্রম অতি-মানবদিগের জীবনে দেখা গেলেও সাধারণপক্ষে প্রযোজ্য নহে। প্রকৃত আত্মজ্ঞানীদের কথাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তাঁদের পক্ষে স্বাদেশিকতা ও বিশ্বজনীনতা এ দুটীর কোনটিরই কিছু মূল্য নাই। সেই জন্য মনে হয়, সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে যাঁরা ঠিক ঠিক জাতীয় মন্ত্রের বীর-সাধক তাঁদেরই বিশ্বজনীন হওয়া সাজে।

প্রশ্ন হইতে পারে জাতীয়ভাবটী কি? জাতীয় ভাবের প্রকৃত দ্যোতনা কোথায়? এক্ষেত্রেও পূর্ব্বকথিত অনুরূপ বা ততোধিক সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অপর কোন জাতির ক্রোড়ে আপন জাতীর সকল বৈশিষ্ট্য ও পৃথক্ সত্তা বিসর্জ্জন দিয়া যাঁরা বিশ্বজনীনতার বড়াই করেন তাঁহাদের সে কার্য্য কোনরূপেই প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আবার, আমরা অপর জাতির সহিত মিশিব না, অপরের সদ্গুণ শিখিব না, অপরোদ্ভাবিত উপায়-প্রণালী গ্রহণ করিব না,—মনের এইরূপ ভাবও অত্যন্ত দূষণীয়। ভারতভূমিতে আজি এই যে প্রাচ্য-প্রতীচীর মিলন হইয়াছে ইহাতে উভয়কেই, বাঁচিতে হইলে আদান-প্রদান করিতে হইবে। আর তা ছাড়া অতীত-ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিয়া বলিব—ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণভাব চিরকালই উন্নতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রাচীন ও আধুনিক সকল সভ্যতাই এই আদান-প্রদান নীতি পালনে পুষ্ট ও উন্নত হইয়া আসিয়াছে। আবার রাষ্ট্রজীবনে এই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা অকল্যাণের উৎস হইয়া এক ভীষণ রাক্ষস-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—ইউরোপের ইতিহাস (যেখানে রাষ্ট্র জীবনের মূলসূত্র) তাহার সাক্ষ্য। ইহারই বশবর্ত্তী হইয়া একজাতি আপন ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিস্তারকল্পে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগের

প্রতি অন্যায়ভাবে পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী কুরুক্ষেত্রের অবসানে উদার জাতীয়ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ জাতীয়তার প্রকৃত প্রাণের-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বলিতেছেন—"Live and let live—let that be our motto."। আমরা বলি, 'বাঢ়ম্'!

শেষ কথা, আজিকার সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আমাদিগের সকলক্ষেত্রে সকল ভুলভ্রান্তিই দেখিতেছি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার পরিণাম। ঐ সকলের নিরাকরণের একমাত্র উপায়—উদার যুক্তিবাদ ও বিশ্বজনীনভাবের প্রসার। তাই বলি, কবির প্রার্থনা পূর্ণ হউক,—

"ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে
দেখ তা'রে সর্ব্বদৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া;
জীবনের ধূলি ধুয়ে
দেখ তা'রে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে
ভাগ করি' খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তা'রে।
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ
ক্ষুদ্র পূণ্য, ক্ষুদ্র পাপ
সংসারের পারে।"

অসীম-সসীম।

(শ্রী—)

আজন্ম ছুটেছে জীব,
উর্দ্ধশ্বাস বিঘূর্ণিত,
অণুপুঞ্জ দেহ বহ্নি কার অন্বেষণে?

চতুর্দ্দিকে যাহা পায়,
মুহূর্ত্তমাত্র স্বাদি তায়,
ত্যজি,—ভাবে অতি ক্ষুদ্র অভাব পূরণে !
পুনঃ গতি হেন ধারা,
জনমি জনমি সারা,
হ'লনা, হবেনা, দুঃখে চিন্তে মতিমান্।
প্রবৃত্তি, বাসনা, আশা,
বহু সম্ভোগ পিয়াসা,
দুর্জ্জয়, অতৃপ্ত ! তবু দিয়েছে সন্ধান :—
আমি আদি, আমি অন্ত,
আমি মধ্যে হই শান্ত,
মহান্ আশ্রয়ে এক রয়েছি কণিকা ;
অনন্ত, চেতন—অন্তঃ,
বহিঃ—জড়, স্থূল ভ্রান্ত,
অসীম-সসীম দ্বন্দ্ব জীব প্রহেলিকা।
ধর্ম্ম, শ্রী, সৌন্দর্য্য তত,
অসীম বিকাশে যত,
সসীমের সীমা লঙ্ঘি পায় পূর্ণ প্রাণ।
হেথা হ'তে বহে ধারা,
"প্রেম" নাম দেয় তা'রা,
অসীম সসীমে প্রেম, সাজে আলিঙ্গন !
দ্বন্দ্বহীন ব্যবধান,
করেছে যে আস্বাদন,
প্রেমরূপ যথা তথা আপন বিকাশ,
ধন্য মানি হেন জীব,
অনন্য হয়েছে শিব,
জগৎ হৃদয়ে নিত্য স্থাপিত আবাস।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী।

[১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল, ২৯শে জুন ও ১১ই জুলাইএ স্বামিজীর লিখিত ইংরাজী পত্রগুলির কোন অংশ বাদ না দিয়া সমগ্র অনুবাদ প্রকাশ করা গেল। কোন কোন সংস্করণে এইগুলির মধ্যে উপদেশপূর্ণ অংশগুলি মাত্র বাছিয়া বাছিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাদের সমগ্র পত্র প্রকাশের কারণ,—যথার্থ তথ্যপূর্ণ জীবনচরিত রচনার পক্ষে কোন ব্যক্তির লিখিত পত্র যেরূপ সাহায্যকারী, আর কিছুই তদ্রূপ নহে। বিশেষতঃ, উহা দ্বারা সেই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ের চিন্তা ও কল্পনারাশির সহিত একটা সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটে। তবে ইহাতে যে তাঁহাকে অনেক স্থলে ভুল বুঝিবার আশঙ্কা নাই, তাহাও নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত পত্রগুলির এক-আধখানি মাত্র তাড়াতাড়ি করিয়া পড়িলে মনে হইতে পারে, স্বামীজি ভারতে তাঁহার শিষ্যদের বলিয়া কহিয়া সভাসমিতি করাইয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া গালাগালি করিতেছেন। কিন্তু ঐ তিনখানি পত্র একত্র—বিশেষতঃ শেষ পত্রখানি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে সে ভ্রম দূর হইবে—বুঝা যাইবে যে, ভারতীয় শিষ্যগণ এমনকি সমগ্র ভারতবাসী পাশ্চাত্যদেশের ধরণ ধারণ অবগত না থাকায় স্বামীজি তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন মাত্র। সমগ্র ভারত তখন তাঁহার প্রশংসায় মুখরিত, কিন্তু ঐ প্রশংসা কেবল ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াই পর্য্যাপ্ত—পাশ্চাত্য-দেশে যথায় স্বামিজীর কার্য্য চলিতেছে, তথায় উহার কিছুই পঁহুছিতেছে না, এদিকে বিরোধিগণ প্রণালীবদ্ধভাবে তাঁহার নিন্দাবাদ পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিতেছে। এক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সভাসমিতি করিয়া ভারত-বাসীর যথার্থ মনোভাব পাশ্চাত্যদেশে দস্তুরমত প্রণালীতে প্রচারিত না হইলে কার্য্যপ্রসারের বিঘ্ন হইতেছে—সেই কারণেই স্বামিজীর ঐরূপ লেখা; আর পত্র প্রেরণের গোলযোগ বশতঃ স্বামিজীর নিকট ভারতীয়

সংবাদ যথাসময়ে না পৌঁছায় শিষ্যগণের, এমন কি, সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি সাময়িক অনুযোগ, অভিমান ও দুঃখ প্রকাশ।]

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

নিউ ইয়র্ক,
৯ই এপ্রেল, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমার শেষ পত্রখানি কয়েকদিন আগে পেয়েছি। দেখ, আমাকে এখানে এত বেশী ব্যস্ত থাক্‌তে হয় আর প্রত্যহ এতগুলো চিঠি লিখ্‌তে হয় যে, তুমি আমার কাছ থেকে সদাসর্ব্বদা পত্র পাবার আশা কর্‌তে পার না। যা হোক, এখানে যা কিছু হচ্ছে, যাতে তুমি মোটামুটি জান্‌তে পার, তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করে থাকি। আমি ধর্ম্মমহাসভাসম্বন্ধীয় একখানি বই তোমায় পাঠাবার জন্য চিকাগোয় লিখ্‌ব। ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চিত আমার দুটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা পেয়েছ।

সেক্রেটারী সাহেব আমায় লিখ্‌ছেন, আমার ভারতে ফিরে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—কারণ, ভারতই আমার কার্য্যক্ষেত্র। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে এমন একটী প্রকাণ্ড মশাল জ্বাল্‌তে হবে, যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে। অতএব ব্যস্ত হয়ো না ঈশ্বরেচ্ছায় সবই সময়ে হবে। আমি আমেরিকার অনেক বড় বড় সহরে বক্তৃতা করেছি এবং উহাতে যে টাকা পেয়েছি, তাতে এখানকার ভয়ানক খরচ বহন করেও ফের্‌বার ভাড়া যথেষ্ট থাক্‌বে। আমার এখানে অনেকগুলি ভাল ভাল বন্ধু হয়েছে—তার মধ্যে কতকগুলির সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। অবশ্য গোঁড়া পাদরিরা আমার বিপক্ষে আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গাল মন্দ নিন্দাবাদ কর্‌তে আরম্ভ করেছেন আর ম—বাবু তাঁদের সাহায্য কর্‌ছেন। তিনি নিশ্চত, হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের বলেছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চোর ও বদ্‌মাস, আবার কলকাতায় গিয়ে তথাকার লোকদের বল্‌ছেন, আমি আমেরিকাতে গিয়ে ঘোর পাপকার্য্যসমূহে বিশেষতঃ ব্যভিচারে লিপ্ত

হয়ে মহা কদাচারীর জীবন যাপন করছি!!! প্রভু তাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন। ভ্রাতৃগণ, কোন ভাল কাযই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষ পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য্য হয়। আমি তোমার ভগিনীপতির * লিখিত পুস্তিকাগুলি এবং তোমার পাগ্‌লা বন্ধুর আর একখানি পত্র পেয়েছি। যুগসম্বন্ধে প্রবন্ধটী বড় সুন্দর—উহাতে যুগের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই ত ঠিক ব্যাখ্যা —তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসেছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর।

একটা জিনিষ করা আবশ্যক—যদি তোমরা পার চেষ্টা করলে ভাল হয়। তোমরা মান্দ্রাজে একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করতে পার? রামনাদের রাজা বা ঐরূপ একজন বড় লোক কাকেও সভাপতি করে ঐ সভায় একটা প্রস্তাব করিয়ে নিতে পার যে, আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছ (অবশ্য যদি তোমরা সত্যই ঐরূপ হয়ে থাক)। তার পর সেই প্রস্তাবটী চিকাগো হেরাল্ড, ইণ্টারওস্যান, নিউইয়র্ক সান এবং ডিট্রয়েট (মিচিগ্যান) থেকে প্রকাশিত কমার্সিয়াল এড্‌ভার্টাইজার কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে। চিকাগো—ইলিনইস কাউন্টিতে অবস্থিত—নিউ-ইয়র্কসানের আর বিশেষ ঠিকানার আবশ্যক নাই। কয়েককপি ধর্ম্মমহা সভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে চিকাগোয় পাঠাবে—আমি তাঁর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গেছি, রাস্তাটার নাম ইণ্ডিয়ানা-এভিনিউ। এক কপি ডিট্রয়েটের মিসেস যে, যে, ব্যাগির নামে পাঠাবে—তাঁর ঠিকানা ওয়াশিংটন-এভিনিউ। এই সভাটা যত বড় হয় করবার চেষ্টা করবে। যত বড় বড় লোককে পার ধরে নিয়ে এসে এই সভায় যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করবে—তাদের ধর্ম্মের জন্য, তাদের দেশের জন্য তাদের এতে যোগ দেওয়া উচিত। মহীশূরের মহারাজও তাঁর দাওয়ানের নিকট

* অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য।

হতে সভা ও উহার উদ্দেশ্যের সমর্থন করে চিঠি নেবার চেষ্টা কর—খেতড়ি মহারাজের নিকট থেকেও ঐরূপ চিঠি নেবার চেষ্টা কর—মোটের উপর সভাটা যত প্রকাণ্ড হয় ও উহাতে যত বেশী লোক হয়, তার চেষ্টা কর।

উঠ বৎসগণ—এই কাযে লেগে যাও। যদি তোমরা এটা করতে পার, তবে ভবিষ্যতে আমরা অনেক কায করতে পারব নিশ্চিত।

প্রস্তাবটী এমন ধরণের হবে যে, মান্দ্রাজের হিন্দুসমাজ যাঁরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা আমার এখানকার কার্য্যে সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি সম্ভব হয় এইটীর জন্য চেষ্টা করো—এত আর বেশী কায নয়। সব জায়গা থেকে যতদূর পার আমাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ পত্রও যোগাড় কর, ঐগুলি ছাপাও আর যত শীঘ্র পার মার্কিণ সংবাদ পত্রসমূহে পাঠাও। বৎসগণ, ইহাতে অনেকদূর কায হবে। এখানকার ব্রা—সমাজের লোকেরা যা তা বলছে—যত শীঘ্র হয়, তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হউক। উঠ, উঠ বৎসগণ, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ কোরবো। আমার পত্রগুলি প্রকাশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যতদিন না আমি ভারতে ফিরছি ততদিন এইগুলির যতটা অংশ প্রকাশ করা উচিত, ততটা আমাদের বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করা যেতে পারে। একবার কায করতে আরম্ভ করলে খুব হুজুগ মেচে যাবে, কিন্তু আমি কায না করে বাঙ্গালীর মত কেবল লম্বা লম্বা কথা কইতে চাই না।

ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধ হয় কলকেতার গিরীশ ঘোষ আর এম, মিত্র আমার গুরুদেবের ভক্তদের দিয়ে কলকেতার ঐরূপ সভার আহ্বান করাতে পারে। যদি পারে ত খুব ভালই হয়। কলকেতায় উহারা পারে ত সভা করে ঐ একই রকম প্রস্তাব করিয়ে নিতে বলবে। কলকেতায় হাজার হাজার লোক আছে যারা আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। * *

আর বিশেষ কিছু লিখবার নাই। আমাদের সকল বন্ধুগণকে

আমার সাদর সম্ভাষণাদি জানাবে—আমি সতত তাঁদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

পুঃ—সাবধান—পত্র লিখ্‌বার সময় আমার নামের আগে 'His Holiness' লিখো না—এখানে উহা অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার শুনায়।
ইতি বি।

শ্রীবিবেকানন্দ স্তোত্রম্।*

(শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য বি, এ।)

(সংস্কৃত কলেজ)

জীবসেবাব্রতং যস্তলক্ষ্যামাসীন্মহীতলে
জ্ঞানমাত্মগতং যোবৈ তেনমার্গেন সংগতঃ।
কর্ম্মিণে জ্ঞানিনেচৈব ভক্তায় স্বামিনে পুন
বিবেকানন্দরূপায় ভূয়োভূয়োনমাম্যহম্॥

১। যৎ সেবাব্রতমামনন্তিমুনয়ো বুদ্ধোজিনঃশঙ্করঃ
শ্রীরামঃ কমনীয়কাম্যকবনে বৃন্দাবনে মাধবো।
জাহ্নব্যাঃ সুতটেষু গৌরগহনে গৌরাঙ্গদেবোযথা
তৎ সেবা-ব্রতমন্ত্র সাধকবরঃ স্বামী পুনর্ঘোষতে॥

২। দেবানাগাশ্চযক্ষা খগভূজগগণাশ্চাপ্ সরোবংশভূতাঃ
গন্ধর্ব্বা রাক্ষসা যে সকল-ভূবনজাশ্চাসুরাবৃক্ষজাতাঃ।
শত্রুর্মিত্রঞ্চযেবা নিখিলনরকজা যাতনাস্থাশ্চজীবা
আব্রহ্ম স্তম্বরূপং জগদিদমখিলঃ তৃপ্যতাং তৃপ্যতাং ভোঃ॥

---

* বিবেকানন্দ সোসাইটীর শ্রীবিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভায় পঠিত।

৩। চণ্ডালোব্রাহ্মণোবা গুরুকৃত বয়সা লাঘবঃ পণ্ডিতোবা
মূর্খোদীনোধনাঢ্যঃ সকলগুণগণৈরন্বিতোনির্গুণোবা।
সর্ব্বে নারায়ণাস্তে বয়মপিচতথাবুয়মপ্যত্রভূতা
আত্মানারায়ণোয়ং প্রচরতি বহুশঃ সেব্যতামাত্মরূপঃ॥

৪। দ্বারেভিক্ষুর্ব্বুভুক্ষুঃ কথয়তিকরুণং "মুষ্টিমেয়ং কদন্নং"
ক্ষুদ্রোমার্জ্জারকোমে বিলপতি নিতরাং "দেহিমে মৎস্য খণ্ডং।"
তেসর্ব্বে ভূতজাতাঃ সমমপি জগতাং সেবিতাশ্চেদ্ভবেয়ু
র্নূনং সৈবাত্মসেবা ভবতি চ সকলা নান্যতঃ সেবনান্মে॥

৫। এবং পুত্রাশ্চদারাঃ সকল পরিজনাঃ বান্ধবাশ্চার্থরাশিঃ
সর্ব্বং যদ্বাস্মদীয়ং ভবতিচভুবনে তত্তু নারায়ণার্থং।
বাক্যংকায়োমনোমে ভবতি ভগবতা চালিতংহৃদ্গতেন
দীনোঽহং ভগবন্ তবৈব নিয়তং দাসোঽস্মি দাসাধমঃ॥

৬। দাসোঽহং ভবতো গৃহাণ কৃপয়া মৎকর্ম্মলব্ধং ফলম্
এবং কর্ম্মফলং সমর্প্য ভগবন্নারায়ণোদ্দেশতঃ।
মুক্তঃ কর্ম্মফলাদ্বিশুদ্ধহৃদয়োযোগে মনোদীয়তাং
মুক্তিং বন্ধনতোলভস্ব নিয়তাং 'কস্ত্বং' পুনশ্চিন্ত্যতাম্॥

৭। নাহং কায়োঽস্থমজ্জঃ কফমলসহিতঃ পঞ্চভূতাত্মকোবা
নাহং ছেদ্যো নদাহ্যোন চ মরণবশোনাপিজাতঃ কদাচিৎ।
নাহং কর্ত্তা ন ভক্তোন চ সুখমপিবা দুঃখলেশো মদীয়ঃ
'সোঽহং' যঃ ষষ্ঠচক্রে বিলসতি নিয়তং 'সচ্চিদানন্দরূপঃ'॥

৮। ইত্যেতত্তত্ত্বজাতং নবতরভুবনে প্রাচ্যপাশ্চাত্যভাগে
যোঽয়ং নব্যাবতারো গুরুকুলতিলকো ঘোষয়ামাস নাদৈঃ।
যেনায়ং ধর্ম্মরাজ্যে সকলজনগুরুর্ভারতোঽস্যাং ধরণ্যা
মিত্যেতৎ সাধিতং বৈ সুনিপুনবচসা পূজিতঃ সর্ব্বথাঽসৌ॥

হে মুক্ত! লোকস্থিতসিদ্ধসাধো!
ভক্তাধমোঽহং ন চ কর্ম্মলিপ্সা।
জ্ঞানামৃতং কিং নহিতৎ প্রজানে
নিরাশ্রয়োঽহং শরণং প্রযাচে॥

বিবেকানন্দ ও ধর্ম্ম।

(ব্রহ্মচারী অখণ্ড চৈতন্য)

মানুষ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে যাইলে কেবলমাত্র ধর্ম্মচর্চ্চা বা মতবাদে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, সে চায় যথার্থ মানুষ—যাহার জীবনে শাস্ত্রোক্ত উপদেশসমূহ প্রতিফলিত—সে চায় জীবন্ত মূর্ত্ত শাস্ত্র। কেবলমাত্র পুঁথিগত উপদেশাবলীতে তাহার মনেও শান্তির উদয় হয় না, সে চায় উপদেশের মূর্ত্তরূপ দেখিতে। বেদ বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র ত' বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি মানুষ কেন ধর্ম্মের জন্য ধাবিত হইতেছে না, কেন সে বৃথা জাগতিক সুখে আপনাকে নিমগ্ন করিতেছে, কেন সে ঘোর নাস্তিক হইতেছে, তাহার কারণ, সে যথার্থ মানুষ দেখিতে পাইতেছে না। সেই জন্য শ্রীভগবান সময়ে সময়ে নরবিগ্রহ ধারণ করিয়া স্বীয় জীবনে শাস্ত্রের তত্ত্ব সমূহ অনুষ্ঠান করিয়া জগদ্বাসীর সন্দেহ জাল ভঞ্জন পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য শান্তির রাজ্য স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হন। অথবা কখনও কখনও তিনি স্বয়ং নরবিগ্রহ ধারণ না করিয়াও আধিকারী পুরুষ সহায়ে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। উদাহরণস্বরূপে আমরা নানক, নাগার্জ্জুন, আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে পারি। এইরূপ মহাত্মাদিগের জীবনেতিহাসই জগদিতিহাসরূপে পরিগণিত করা যাইতে পারে, ইঁহারাই ভাব রাজ্যের রাজা। যুগোপযোগী নূতন নূতন ভাবসহায়ে জগতের ভাবরাজ্যে ইঁহারাই পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন ও সমগ্র মানবমণ্ডলী সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া থাকে। দার্শনিক Carlyle সেই জন্য বলিয়াছেন The History of the Greatmen is the History of the World. আমরা যে মহাত্মা সম্বন্ধে অদ্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি তিনিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া যে

আধ্যাত্মিকতার সৌধ নির্ম্মাণ করিল—যাহা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও মুসলমানগণের পাশববলে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হয় নাই বরং অত্যুচ্চ হিমালয়ের ন্যায় স্বীয় মহিমায় অচল অটলরূপে বিরাজ করিতেছিল, ইদানীং তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ নিবিড় তমসায় আবৃত হওয়ায় ভারতবাসীর নয়ন বহির্ভূত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কেহ মনে করিল বুঝি বা হিন্দুর চিরসম্বল ধর্ম্মও এবার আর কাল প্রভাবে বিদ্যমান রহিল না, কেহ বুঝিল এতদিনের কুসংস্কারের সমষ্টি, পুরোহিত কুলের অত্যাচার প্রভৃতির হস্ত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইব, কেহ কেহ আবার নিজেদের বিশেষ বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া ভোগরূপ যক্ষকে বরণ করিয়া লইল। যেমন মায়া স্বীয় আবরণী শক্তি দ্বারা—সত্যং জ্ঞানমনন্তং—ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া বিক্ষেপ শক্তি সহায়ে তাহাকে জগদ্রূপে প্রতিভাসিত করে ও মানুষের হৃদয়ে বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হইলে তাহার বিভীষিকা অন্তর্হিত হয়; সেইরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতা এই অপূর্ব্ব সনাতন ধর্ম্মকে আবৃত করিয়া উহা আমাদের নিকট একটি কুসংস্কারের সমষ্টি মিথ্যা মাত্র ও ভোগই একমাত্র সারবস্তু বলিয়া প্রতিপাদন করিলে, মূর্ত্ত-বিবেক-বৈরাগ্য বিবেকানন্দের আবির্ভাবে তাহার মোহজাল ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সঙ্ঘর্ষণের সন্ধিস্থলে যদি স্বামিজীর ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে কালের অতল রসাতলে মগ্ন হইতে হইত। স্বমিজী বলিতেছেন—

"Though many a stately column on which it rested, many a beautiful arch and many a marvellous corner have been washed away by the innundations that deluged the land for centuries—the centre is all sound, the Keystone is unimpaired, the spiritual foundation upon which the marvellous monument of glory to God and charity to all beings has been reared, stands unshaken, strong as ever."

আজ কাল স্বামী বিবেকানন্দের জীবন চরিত অনেকেই পাঠ করিয়া

থাকেন ও তৎসম্বন্ধে কিছু না কিছু সকলেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করিয়া তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশসমূহ হইতে যে ভাব পাইয়াছি তাহারই আলোচনা করিব। স্বামিজীই বাস্তবিক পক্ষে জগতে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়বাণী বিঘোষিত করেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার পুরুষবৃন্দ একটি বা দুইটি ভাব স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করিয়া মানবমণ্ডলীকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ সমন্বয়ের বাণী সম্বন্ধে একটু আধটু বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা যেন অবান্তর বলিয়া বোধ হয়—যেন মতবাদ বা Theoritical মাত্র কিন্তু Practical নহে। উদাহরণ স্বরূপে আমরা দেখিতে পাই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় "যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্......ইত্যাদি বলিলেও নিজ জীবনে সমস্ত ধর্ম্ম যে পরিমাণে সেই অনন্ত ভগবানে লইয়া যায়, এরূপ ভাবের সাধনা করিয়াছেন কিনা তাহার কোন বিবরণ আমরা পাই না; অধিকন্তু গীতায় যে স্থলে আমরা এই শ্লোকটি দেখিতে পাই সেখানে তিনি কর্ম্ম সম্বন্ধেই বিশেষভাবে বলিতেছেন, সমন্বয়বাদ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বা পরে কোন কথাই উল্লেখ নাই। যদিও ভগবান গীতাতে জ্ঞানেই মুক্তি এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময় কর্ম্ম-সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বলায় আমরা গীতায় নিষ্কামকর্ম্মই ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করিতে পারি। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে নিষ্কাম কর্ম্মই গীতার মত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ যে গ্রন্থের যাহা প্রতিপাদ্য তাহা সেই গ্রন্থের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে আলোচিত দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ উপক্রম, উপসংহার, অর্থবাদ নিয়মের দ্বারাই কর্ম্মকে গীতার মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। আমরা দেখি যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রায় প্রথমেই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি"। পরেও তিনি কর্ম্মের কথা বলিতেছেন,

যথা—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়, সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে"। ইতি ২ অধ্যায়—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং……(৩য় অধ্যায়)

ত ত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ (৪র্থ অধ্যায়)

যোগিণঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সঙ্গংতক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে (৫ম অধ্যায়)

নহি দেহভৃতাশক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।

যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ (১৮শ অধ্যায়)

আমরা গীতার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন। সুতরাং যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে …..ইত্যাদি শ্লোকটি গীতার প্রধান আলোচ্য বিষয় নহে। আবার আমরা দেখিতে পাই যে Example is better than precept তাই শ্রীভগবান নিজেই কুরুক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভক্তকে উপদেশ করিয়াছিলেন, কারণ উপদেষ্টা যদি নিজ জীবনে উপদেশগুলি প্রতিফলিত করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার উপদেশের কোন মূল্যই থাকে না। যাহা হউক এই অদ্ভুত সমন্বয় বাণী যে কেবল এই যুগের জন্যই রক্ষিত ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

যেমন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীগৌরাঙ্গদেবে মূর্ত্তরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচীন ঋষির তেজঃপূর্ণ মন্ত্র "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সসুপর্ণোগরুত্মান্" "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" এবং গীতার অস্ফুট সমন্বয়বাণী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দে মূর্ত্তরূপ ধারণ করে।

সমন্বয়বাদ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে উত্থিত হইয়াছিল বটে কিন্তু পরিণামে দেখা যায় ইহা বিশেষ সফলকাম হয় নাই, কারণ ইহা কোন কার্য্যকরী প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। আমরা দেখিতে পাই মধ্যযুগে ইউরোপে Eclectics বলিয়া একদল দার্শনিকের প্রাদুর্ভাব হয় তাঁহারা সব মতের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া নিজমত গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জগতে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার

করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহারা সকল মতের মূল সূত্রটির সন্ধান পান নাই। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মমতই সত্য একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু উহাদের সামঞ্জস্য সাধনের এমন কোন কার্য্যকর উপায় দেখাইয়া দেন নাই যাহার দ্বারা তাহারা এই সমন্বয়ের মধ্যেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। সেই উপায়ই প্রকৃত কার্য্যকর যাহা ব্যক্তিগত ধর্ম্মমতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট না করিয়াও অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু এ যাবৎ যে সকল উপায়ে ধর্ম্মজগতে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মমত সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে গুটিকতক মত বিশেষের মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং সেই হেতু অপর কতকগুলি পরস্পর বিবদমান ঈর্ষাপরায়ণ নূতন দলেরই সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত এইরূপ তথাকথিত সমন্বয়বাদীদিগের পার্থক্য এইখানে।—তাঁহারা প্রত্যেক ধর্ম্মের ভাল ভাল উপদেশ সমূহ সংগ্রহ করিয়া একটি সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে গিয়াছিলেন, আর স্বামিজী কোন ধর্ম্মের ব্যক্তিত্ব নষ্ট না করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের সাহায্যেই যে ভগবান্ লাভ হয়, প্রত্যেক ধর্ম্মই যে সত্য, কোন ধর্ম্মের কিছুমাত্র বাদ দিবার প্রয়োজন নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

সাধারণতঃ প্রশ্ন হইতে পারে যে, সমস্ত ধর্ম্মই যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলিই বা কি করিয়া সমভাবে সত্য হইবে? খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ কি সমভাবে সত্য? খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সহিত জৈন ধর্ম্মের বিশেষ বিরোধ রহিয়াছে, আবার শূন্যবাদী বৌদ্ধের সহিত দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকের মিল নাই, এক্ষেত্রে কি প্রকারে সমস্তধর্ম্মমত গুলিকে সত্য বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে স্বামিজী বলিতেছেন "মনে করুণ এক ব্যক্তি সূর্য্যের দিকে গমন করিতেছে এবং যেমন অগ্রসর হইতেছে অমনি বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্য্যের এক একটি ফটোগ্রাফ লইতেছে। যখন সে ফিরিয়া আসিবে তখন তাহার নিকট সূর্য্যের অনেকগুলি ফটোগ্রাফ থাকিবে। যদি সে সেগুলি আমাদের সম্মুখে রাখে, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে তাহার কোন

ছ'খানিই ঠিক একরকমের নহে, কিন্তু একথা কে অস্বীকার করিবে যে এগুলি একই সূর্য্যের ফটোগ্রাফ, শুধু ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত⋯ ⋯ এইরূপে আমরা একই সত্যকে আমাদের জন্ম, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দেখিতেছি। আমরা সত্যকেই দেখিতেছি ; তবে এই সমুদয় অবস্থার মধ্য দিয়া সেই সত্যের যতটা দর্শন হওয়া সম্ভব ততটাই পাইতেছি। তাহাকে আমরা নিজনিজ হৃদয়ের দ্বারা রঞ্জিত করিতেছি, আমাদের নিজনিজ বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতেছি এবং নিজনিজ মন দ্বারা ধারণা করিতেছি......এই হেতুই মানুষে মানুষে প্রভেদ এমন কি কখন কখন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে, তথাপি সকলেই সেই সার্ব্বজনীন সত্যের অন্তর্ভুক্ত।"

এখন পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ কি সমভাবে সত্য? এই তিন বাদের প্রত্যেকের ফল মোক্ষ। এখন এতত্রয়ের মোক্ষে কোনরূপ তারতম্য আছে কি না? আমরা পূর্ব্বে মোক্ষ শব্দটির অর্থ কি সে বিষয়ে আলোচনা করিলে উত্তর বেশ বুঝা যাইবে। মোক্ষ শব্দের অর্থ আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি। আচার্য্য গৌতম, মোক্ষ শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন ; তবে তাঁহার মতে মুক্তাবস্থাটা জড়াবস্থার ন্যায়—মুক্ত ব্যক্তির কোনরূপ চৈতন্য থাকে না। তিনি প্রস্তর কাষ্ঠাদির ন্যায় অবস্থান করেন—এই মাত্র ভেদ। তিনি বলেন "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানের নাশে দোষের নাশ, দোষের নাশে প্রবৃত্তির নাশ, প্রবৃত্তির নাশে জন্মের নাশ ও জন্ম নাশ হইলে দুঃখের নিবৃত্তি। সাংখ্যকার কপিল মোক্ষকে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি কহিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী মোক্ষশব্দের এরূপ অর্থ করেন "তদৈক্য প্রমেয়গতাজ্ঞান নিবৃত্তিঃ স্বস্বরূপানন্দপ্রাপ্তিশ্চ"। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয়গত অজ্ঞান নিবৃত্তি এবং তাহার ফলস্বরূপ আনন্দ প্রাপ্তি। শ্রুতি ইহার পোষকতা করিতেছেন, "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি", "তত্র কঃ মোহঃ, কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।" আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষ—কি দ্বৈতবাদী কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কি অদ্বৈতবাদী

সকলেই স্বীকার করেন। দ্বৈতবাদী যে কোন একটি ভাব সহায়ে তাঁহার প্রেমাস্পদকে লাভ করেন, কিন্তু তাঁহার সহিত এক হইয়া যান না। তিনি বলেন 'আমি চিনি হ'তে ভাল বাসি না চিনি খেতে ভাল বাসি।' তিনি আনন্দঘন মূর্ত্তি দেখিয়া বিভোর হইয়া ভগবদানন্দ উপভোগ করিতে চান। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মুক্তি সামীপ্য মুক্তি। যেমন কোন নিবিড় পত্র শোভিত বৃক্ষে একটি ক্ষুদ্র পাখী উড়িয়া বসিলে তাহাকে আর দেখা যায় না, কিন্তু পাখীটির সহিত বৃক্ষের স্বাতন্ত্র্য থাকে তেমনি জীব সগুণব্রহ্মে লীন হইলেও তাঁহার সহিত এইরূপ ভাবের একটা পার্থক্য থাকে। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয় না। এদিকে অদ্বৈতবাদীর মতে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়। যেমন 'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিছ্‌লো, সমুদ্রে যাই যাওয়া অমনি গলে গেল, তখন আর পুতুল ও সমুদ্রে কিছু ভেদ রইল না, সব একাকার হ'য়ে গেল।' আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয় ইহাদের মোক্ষফলের কিছু প্রভেদ আছে, কিন্তু একটু প্রণিধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই। যদি দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর মুক্তিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে চরম মুক্তাবস্থা বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলেই বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ, দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মতে মুক্তাবস্থাতেও উপাস্য উপাসক ভেদ বর্ত্তমান থাকে এবং ভেদ কল্পনাই মায়ার অন্তর্ভুক্ত, অতএব ঐরূপ মুক্তাবস্থায় জীব মায়ার রাজ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পায় না। হইতে পারে তাহার পার্থিব বোধের সুখদুঃখ অল্পাধিক উপশম হইয়াছে, কিন্তু উপাস্যের অন্তর্ধান জনিত বিরহ যন্ত্রনা তাহার চিত্তকে ক্ষোভিত করিয়া থাকে। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে তাহার আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইল না। অদ্বৈতবাদীর মুক্ত অবস্থায় সে স্বরূপে অবস্থান করে, মায়ার মোহিনী প্রহেলিকা তাহার কাছে বিলীন হইয়া যায়, সে নিঃশংসয় হইয়া এক অপার নিরবচ্ছিন্ন, সমরস আনন্দানুভবে বিভোর হইয়া যায়। তখন সে এক অখণ্ড সদ্‌বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুর সত্বা বোধ করে না, সমস্ত ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয়, সে জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অতিক্রম করে। শ্রুতি বলিতেছেন "মৃত্যোঃ

স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—ভেদ দৃষ্টিই জন্মজন্মান্তরের হেতু। অতএব দ্বৈতবাদীর যখন উপাস্য উপাসক ভেদ থাকে তখন সে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য যে দ্বৈতবাদী কি চিরকালই উপাস্য ও উপাসকরূপ ভেদ লইয়া থাকিবে? তাহার কি কখনও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান হইবে না? যদি ইহা নিশ্চয় হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে দ্বৈতবাদীর মোক্ষ অদ্বৈতবাদীর মোক্ষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমরা দেখিতেছি যে দ্বৈতবাদীও একত্বজ্ঞান উপলব্ধি করে। সে যখন নিজ প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" দেখে তখন তাহার সহিত অদ্বৈতবাদীর "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহার কোন পার্থক্য থাকে না। যেমন জ্ঞানী বিচার সহায়ে 'নেতি নেতি' মার্গে এক অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করে, তেমনই ভক্ত উপাসনা করিতে করিতে "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" দেখে, তাহার ইষ্টই তাহাকে ঐরূপ জ্ঞান দান করেন।—তাহা হইলে দেখা গেল যে দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, একত্বানুভূতির পক্ষে সোপান স্বরূপ। স্বামিজীও ঠিক তাহাই বলিতেছেন :—

"In these three systems we find the gradual working up of the human mind towards higher and higher ideals till everything is merged in that wonderful unity which is reached in that Advaita system."

ধর্ম্মের ভিতর তিনটি সোপান দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম দ্বৈতবাদ, তার পর মানব যখন অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হয়—তখন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, এবং সর্ব্বশেষে একত্বানুভূতি লাভ হয়।—সুতরাং এই বাদ সকল পরস্পর বিরোধী নহে, পরন্তু সহায়ক।

এইরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি শ্রুতি বা বেদ। বেদেই আমরা কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান প্রভৃতির বিষয় সূত্রাকারে পাইয়া থাকি, পরে এই সূত্রগুলিই পুরাণ প্রভৃতিতে বিশেষ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ প্রশ্ন হইতে পারে, বেদকেই বা কেন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইল, কোরাণ বা বাইবেলকে কেন গ্রহণ করা হইল না? তদুত্তরে বলা যায়—বেদই

সত্যসমূহের সমষ্টি মাত্র, ইহা অপৌরুষেয়। অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ কোন না কোন ব্যক্তি বিশেষের সহিত জড়িত বা ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক রচিত, কেবল মাত্র বেদই কোন ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা রচিত নহে। বৈদিক ঋষিগণ বেদমন্ত্র সকলের দ্রষ্টা—রচয়িতা নহেন এমন কি স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্তও উহার রচয়িতা নহেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে বেদ যেরূপ ছিল পরবর্ত্তী কল্পে তিনি সেইগুলিকে নিশ্বাসের ন্যায় প্রকটিত করিয়াছেন, অধিকন্তু বেদেই আমরা সার্ব্বজনীন ভাবের কথা পাইয়া থাকি। কি দ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, কি জ্ঞানী, কি ভক্ত, কি যোগী, সকলেই আপন আপন মতের সহায়ক ভাব বেদ হইতে পাইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই বেদকে একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। এমন কি বৌদ্ধ ও জৈনদিগের নীতিবাদও আমরা উপনিষদে প্রাপ্ত হই। স্বামিজী বলিতেছেন :--

"I think it is Vedanta and Vedanta alone that can become the universal religion of man and no other is fitted for that role. Excepting our own, almost all the great religions of the world are inevitably connected with the life or lives of the one or more of their founders......If one blow is dealt with the historicity of that life, as has been the case in modern times with the lives of almost all the so-called founders of religion, ...the whole building tumbles down—broken absolutely never to regain its lost status. Everyone of the great religions of the world excepting our own is built upon historical characters, but ours rests upon principles."

এখন কি উপায়ে এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মলাভ করা যায় তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিত আলোচনা করিব। সংসারে আমরা নানারূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট মানুষ দেখিয়া থাকি। কাহারও প্রকৃতি কর্ম্মপ্রধান, কাহারও বা ভক্তিপ্রধান, কাহারও আবার বিচারশীল। কর্ম্মপ্রবণ মানুষ গভীর চিন্তা করিতে পারে না অথবা বিশ্বের সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়ে না। সে চায় কায, সে চায় tangible কিছু যাহা 'হাতে নাতে' করা যায়। প্রেমিক ভক্ত বিশ্ব-সৌন্দর্য্য দেখিয়া সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর তাহার প্রেমাস্পদকে ভাবিতে থাকে। সে তাহার প্রেমাস্পদ ভগবানকে লাভ

করিবার জন্য পুষ্প, চন্দন, সুরম্য হর্ম্ম্য, পূজা, উৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করে। তাহার নিকট ভগবান্ সত্যবস্তু—তাঁহাকে ধরা-ছোঁয়া যায়—তাঁহার সহিত কথা বলা যায় এবং তাঁহার বাণী শোনা যায়। আবার বিচারশীল মানব সামান্য জাগতিক বস্তুতে পরিতুষ্ট নহে, সে তাহার তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বুদ্ধি সাহায্যে জগতের অনিত্যতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া "যো বৈ ভূমা তৎসুখং" সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম-লাভের জন্য উৎসুক হয়। সে ভক্ত ও ভগবানের ভেদ না রাখিয়া স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ হইতে চায়। জ্ঞানীই ভগবানের বিদ্রোহী সন্তান (?)। আমরা ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বৈদিক ঋষিগণ জ্ঞানকেই মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদিও বেদে কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় তথাপি তাহারা ঋষিদের মনের উপর বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। পরে আমরা দেখি যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সময় জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগের সামঞ্জস্যের চেষ্টা হয়, কিন্তু তাহা বিশেষ ফলবতী হয় নাই।

তারপর লোকে ধর্ম্মের নামে নানা প্রকার দৈহিক ও মানসিক কঠোরতাপূর্ণ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও গৃহস্থগণ প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় সুখ লালসায় প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ শ্রীবুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া অষ্টাঙ্গিক বা মধ্যম মার্গ প্রচার করিলেন। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের সহিত উপনিষদুক্ত জ্ঞানমার্গের বিশেষ পার্থক্য নাই। তখনকার লোককে ধর্ম্মলাভ করিতে হইলেই এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ গ্রহণ করিতে হইত। বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। তৎপর ভগবান্ শঙ্কর জ্ঞানমার্গ প্রচার—নানা প্রকার স্তোত্র রচনা ও কর্ম্ম জ্ঞানের পক্ষে "আরাৎ প্রয়োজক" অর্থাৎ Remote cause বলায় ভক্ত ও কর্ম্মীর ধর্ম্মলাভের পথ সুগম হইয়াছিল। আবার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমধর্ম্ম প্রচার করাতে জ্ঞানী ও কর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি তন্নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইল, তাহাদের মোক্ষলাভের কোন উপায় রহিল না। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে তাহাদের স্ব স্ব প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, নচেৎ অসম্ভব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এইরূপ একদেশী ভাব প্রচারিত হওয়ায়, সমগ্র

মানবমণ্ডলীর ধর্ম্মলাভের পথ সুগম না হওয়াতে শ্রীভগবান্ পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া বিবেকানন্দ প্রমুখ আচার্য্য সহায়ে সমন্বয়বাণী জগতে প্রচার করিলেন।

স্বামিজী বলিতেছেন "এই চারিটি দিকেই সামঞ্জস্যের সহিত বিকাশ লাভ করা মদুক্ত ধর্ম্মের আদর্শ এবং ভারতবর্ষে আমরা যাহাকে যোগ বলি তাহা দ্বারাই এই আদর্শ ধর্ম্ম লাভ করা যায়। কর্ম্মীর নিকট ইহা মানবের সহিত মানবজাতির যোগ, যোগীর নিকট জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ, ভক্তের নিকট নিজের সহিত প্রেমময় ভগবানের যোগ ও জ্ঞানীর নিকট বহুত্বের মধ্যে একত্বানুভূতিরূপ যোগ। যিনি কর্ম্মের মধ্য দিয়া যোগ সাধন করেন তিনি কর্ম্মযোগী—যিনি ভগবানের মধ্যদিয়া যোগ সাধন করেন তিনি ভক্তিযোগী—যিনি ধর্ম্মরহস্যানুসন্ধানের মধ্যদিয়া যোগ সাধন করেন তিনি রাজযোগী এবং যিনি জ্ঞান বিচারের মধ্যদিয়া যোগ সাধন করেন তিনি জ্ঞানযোগী।" আবার দেববাণীতে (Inspird Talks) বলিতেছেন "প্রাচীন কালের লোকের ভাব ছিল অপর সকল ভাবকে নষ্ট ক'রে একটা ভাবকে প্রবল কর। আধুনিক ভাব হচ্ছে সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি করা। আর একটা তৃতীয় পন্থা হচ্ছে মনের বিকাশ কর ও তা'কে সংযত কর—তারপর যেখানে ইচ্ছা তা'কে প্রকাশ কর তা'তে ফল খুব শীঘ্র হবে। এইটি হচ্ছে যথার্থ আত্মোন্নতি করবার উপায়। একাগ্রতা শিক্ষা কর—আর যেদিকে ইচ্ছা তাকে প্রয়োগ কর; এরূপ করলে তোমার কিছুই খোয়াতে হবে না।" এই সার্ব্বভৌমিক সমন্বয়বাদের সহিত 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত'রূপ মতটীর বিশেষ সম্বন্ধ। কর্ম্মজীবনে বেদান্তটি ইহার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা সমন্বয়বাদের সহিত অবয়ব অবয়বীর ন্যায় সম্বন্ধে জড়িত। বেদান্তের মতটি আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে কিরূপ ভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা এই 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত' বক্তৃতায় দেখান হইয়াছে। বেদান্ত বলিতে আমরা উপনিষদকেই ধরি; কারণ, ইহাই বেদের সংহিতা বা ব্রাহ্মণের অন্তর্ভাগ তজ্জন্য ইহাকে বেদান্ত বলা

হয়।—কিন্তু এখানে বেদান্ত শব্দে উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদটী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অদ্বৈতবাদ অথবা জ্ঞানযোগ কর্ম্মজীবনের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে কি ভাবে অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে ও ভক্তিযোগের সহিত ইহাদের কোনরূপ সাপত্ন্য সম্বন্ধ নাই স্বামিজী তাহাই এই বক্তৃতায় দেখাইতেছেন।

পূর্ব্বে ঋষিরা বেদান্ত অরণ্যে পাঠ করিতেন বলিয়া ইহার নাম আরণ্যক হইয়াছে। ঋষিরা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ইহারই চর্চ্চা করিতেন, সেই অবধি ইহা মুষ্টিমেয় ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ঋষিরা আবার মহাকর্ম্মী অতুল সাম্রাজ্যের অধিকারী নানাপ্রকার ভোগবিলাসের মধ্যে বর্ত্তমান রাজন্যকুলের নিকট হইতেই এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। এই কথা আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাপ্ত হই। এইরূপে উপনিষদ্ ক্ষত্রিয়দিগের হস্তচ্যুত হইলে তাহা ঋষিদিগেরই একমাত্র সম্বল হইয়া উঠিল। তাঁহারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন লইয়াই জীবন কাটাইতেন—সংসারের পঙ্কিল আবহাওয়ায় আসিতে ইচ্ছা করিতেন না; তৎজন্য এইরূপ সারগর্ভ অমূল্যরত্ন একপ্রকার লোকচক্ষুর অন্তরালেই বর্ত্তমান ছিল। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন "ঋষিরা ভয়তরাসে!"

এইরূপে বহুশত বৎসর অতীত হইলে ভগবান্ শঙ্কর সেই উপনিষদ্ গুলিকে সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে প্রচার করিলেন, কিন্তু এই সাধারণ মনুষ্য বলিতে আমরা যেন শূদ্র ও অন্ত্যজদের না ধরি; কারণ তিনি এই গুলিকে শুদ্ধ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন, কেবলমাত্র সন্ন্যাসীদের হস্তে যাহা ছিল তাহাকে তিনি গৃহস্থের মধ্যেও প্রচার করিলেন। এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই উপনিষদ্ নিবদ্ধ উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্য সমূহ নিরন্তর কর্ম্মশীল সাম্রাজ্যের অধিনায়ক রাজাগণের মস্তিষ্ক প্রসূত। তাঁহারা যদি অত্যধিক কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও সেই উপনিষদুক্ত সত্যসমূহ জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারেন, তবে কেন আমরা দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। সেই অতুল সাম্রাজ্যের অধিপতি

অপেক্ষা কে অধিক কর্ম্মী? বেদান্তের উচ্চ উচ্চ তত্ত্বসমূহ সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদের অন্তরে সঞ্জীবনী শক্তি জাগ্রত করাই স্বামিজীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মানুষ এতদিন নিজকে দীন হীন ভাবিয়া একেবারে নির্জ্জীব বলহীন হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে বেদান্তের ওজঃপূর্ণ গভীর বাণী শুনাইলে তাহাদের মধ্যে সুপ্ত সিংহ জাগরিত হইবে। এইজন্য স্বামিজী বেদান্ত আলোচনা ও তাহার প্রচারের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। রঙ্গাচার্য্যকে তিনি বলিতেছেন "Give a rub to the Calcutta people" আবার অন্যত্র বলিতেছেন, "যদি বেদ শালগ্রাম শিলার ন্যায় ঘরে ঘরে পূজা হয় তবে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।"

এখন আমাদিগের পূর্ব্ব ক্রম অনুসরণ করা হউক। কর্ম্মের মধ্যে কি ভাবে বেদান্তের তত্ত্বসমূহ কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা আমরা তাঁহার বক্তৃতা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারি। বেদান্তের মূল সিদ্ধান্তটি এই যে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম উপাধিভেদে বহুজীবরূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন। জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোনরূপ পার্থক্য নাই। জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম, যেমন এক মহাকাশ বিভিন্ন বস্তু, ঘট মঠ প্রভৃতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন আকাশ—ঘটাকাশ, মঠাকাশ রূপে প্রতিয়মান আবার ঘট মঠ প্রভৃতির বিনাশ হইলেই সেই ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ ও মঠাবচ্ছিন্ন আকাশ এক মহা আকাশে বিলীন হয়। সেইরূপ এক অখণ্ড সত্ত্বা বিভিন্ন উপাধি ভেদে জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে এবং উপাধি নাশেই সেই এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। জীব ও ব্রহ্মে বাস্তবিক যে ভেদ নাই, বেদান্ত তাহার "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয়। অতএব জীব যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই হইল, তাহা হইলে সে অনন্ত শক্তিমান্ ইহাও স্থির হইল। বেদান্তের এই মহান্ সত্যগুলি যদি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে মানুষ তাহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সমূহও সুশৃঙ্খলার সহিত করিতে সক্ষম হইবে, বাধা বিপত্তি ও নৈরাশ্যের ছবি তাহার সম্মুখ হইতে দূরে অপসারিত হইবে। জীবনের যে যে স্তরে যাহারা বর্ত্তমান তাহারা যদি নিজে ভাবে যে আমি ব্রহ্মস্বরূপ আমার মধ্যে অনন্ত-

শক্তি বর্ত্তমান তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই আপন আপন স্তরে উন্নতি লাভ করিবে।—উকিল যদি ভাবে, সে ব্রহ্মস্বরূপ অনন্তশক্তিশালী সে খুব ভাল উকিল হইবে, জেলে যদি ভাবে আমি অনন্তশক্তিশালী, সে ভাল মাছ ধরিতে পারিবে, আবার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী যদি ভাবেন আমি ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিবেন। "যাদৃশীর্ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। স্বামিজী বলিতেছেন—

"These conceptions of Vedanta must come out, must remain not only in the forest, not only in the cave but they must come out to the bar and the bench, in the pulpit and in the cottage of the poor man, with the fisherman that are catching fish and with the students that are studyiug......... If the fisherman thinks that he is a spirit he will be a better fisherman. If the student thinks he is a spirit he will be a better student."

একদিকে যেমন দেখিলাম কর্ম্মজীবনে বেদান্ত ঐহিক জীবন যাপনে, আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে, অপরদিকে দেখিব যে তাহারা পারত্রিক ব্যাপারেও তদ্রূপ অনুকূল, এমন কি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের ভাব আনয়ন করে। নিষ্কামভাবে, কর্ম্মকরাই কর্ম্ম-যোগের মূল সূত্র। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ এই সম্বন্ধেই উপদেশ করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। মানুষ কিছুনা কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতে পারে না, সেইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মাণি" আবার বলিতেছেন "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

কাজ করিয়া যাও, সিদ্ধি ও অসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিও না! সিদ্ধি হউক তাহাতেও আনন্দিত হইবার প্রয়োজন নাই, অসিদ্ধি হইলে নিরাশ হইও না, উভয় বিষয়ে তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই "শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্"—বিমল আনন্দলাভ করিতে পারিবে। এদিকে ভক্তিযোগে বলা হইয়াছে—'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন। নাম ও নামী অভেদ, যেই নাম—সেই ভগবান্,

সেই ভগবানেরই এই জগৎসংসার—এরূপ জানিয়া সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করিবে। এবং ভক্ত ও ভগবানকে—কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবকে এক জানিয়া বৈষ্ণব ও ভক্তসমুদয়ের পূজা বন্দনা ও সেবা করিবে। আবার জ্ঞানী বলিতেছেন—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জীব ব্রহ্মৈব নাপর, ইত্যাদি প্রত্যেক পদার্থ প্রাণী, জীব প্রভৃতি যাহা আমরা দেখিতেছি সমস্তই ব্রহ্ম, কেবল উপাধি ভেদে বিভিন্ন দেখাইতেছে।' কর্ম্মজীবনে বেদান্ত আমাদিগকে শিখাইতেছে যে, মানুষকেই শিবজ্ঞানে সেবা কর 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'। বেদান্ত বলিলেই যেন লোকের মনে স্বতঃই নদনদী, পর্ব্বত, ভীষণ অরণ্য বা তপোবন প্রভৃতির ছবি, ও বেদান্তজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহাকে এই সংসার নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হইবে, এবং ভক্তি ভালবাসারূপ কোমল মনোবৃত্তিগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে ইত্যাদি ভাবসমূহ উদয় হয়। কিন্তু স্বামিজী এই সেবাধর্ম্ম প্রচার করায়—ভক্তিযোগের সহিত জ্ঞানযোগের অপূর্ব্ব সম্মিলন হইল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি জীব শিব, এই কথা জ্ঞানী বলিতেছেন; আবার ভক্ত বলিতেছেন জীবে দয়া কর। স্বামিজী বলিলেন —জীবকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা কর, তোমার সাধ্য কি যে তুমি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে, সে যে শিবস্বরূপ, তুমি তাহার সেবা করিয়া ধন্য হও। জ্ঞানী চরম অবস্থায় দেখেন যে জীবজগৎ সবই ব্রহ্ম এবং শাস্ত্রে বলে যে সাধকের পক্ষে সিদ্ধাবস্থার আরোপই সাধনা। অতএব জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করিতে করিতে পরিণামে সাধক কেননা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন! আবার ভক্তও 'সেবাধর্ম্ম' হইতে বিশেষ আলোক পাইবেন। সর্ব্বভূতে নিজ ইষ্ট দর্শন পরাভক্তির লক্ষণ; জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করিয়া সর্ব্বভূতে ইষ্ট দর্শন করিয়া ভক্তসাধক পরাভক্তি লাভে যে সমর্থ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অপর দিকে কর্ম্মযোগীও বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। মানুষ কর্ম্ম না করিয়া একদণ্ডও থাকিতে পারে না। এই জীবসেবারূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে সে পরিণামে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে। গীতা বলিতেছেন, "আরুরুক্ষো র্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।"

এখানে আমাদিগের মনে রাখা উচিত যে সেবাধর্ম্ম স্বামিজীর স্বকপোল কল্পিত নহে। "যত মত তত পথ" রূপ Universal Religion বা সমন্বয়বাণী প্রচার করায় মানুষ ধর্ম্মরাজ্যে নূতন আলোক পাইতেছে তাহা যেমন তিনি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ "সেবাধর্ম্ম"ও তিনি তাঁহারই নিকট প্রাপ্ত হন। পরমহংসদেবই একদিন অর্দ্ধবাহ্য দশায় বলিতেছিলেন 'জীবে দয়া! জীবে দয়া! দূর শ্যালা! তুই কীটাণুকীট জীবকে তুই দয়া করবার কে?— না না জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।' এই মূল সূত্রটীই স্বামিজীর দ্বারা পরিণামে 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত'রূপ ভাষ্যে পরিণত হইয়াছে।

এই কর্ম্মজীবনে বেদান্ত বা সেবাধর্ম্ম ঠিক ঠিক ভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইলে মানবকে সর্ব্বতোভাবে নিজ স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। একমাত্র ত্যাগরূপ ভিত্তির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত,—ত্যাগই সকল ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। উপনিষদ্ বলিতেছেন "ত্যাগেনৈক অমৃতত্বমানশুঃ।" আজকাল ত্যাগের কথা বলিলেই লোকের মনে গৈরিকবসন, দণ্ড কমণ্ডলু, প্রভৃতির চিত্র উদিত হয়—যেন মনে হয় দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ না করিলে আর ত্যাগী হওয়া যায় না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সকল আশ্রমে ত্যাগী হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান যুগে 'নাগ মহাশয়, মহাত্মা গান্ধি, লোকমান্য তিলক প্রভৃতি মনীষীগণ সংসার আশ্রমে থাকিয়াও ত্যাগের কিরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন! শাস্ত্রে আমরা ধর্ম্মব্যাধ, রাজর্ষি জনক, উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উপাখ্যান হইতে জ্ঞাত হই যে তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন যে তাহার কিয়দংশও ইদানীং তথাকথিত ত্যাগীদের মধ্যে লক্ষিত হয় না। ত্যাগেই মানুষকে দেবতা করে। সেইজন্য স্বামিজী বলিতেছেন "Renunciation and service be your motto." ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতেছেন "ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না তোমার বিবাহ—তোমার ধন—তোমার জীবন—ইন্দ্রিয় সুখ নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।"

সৎকথা।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

(জনৈক ব্রহ্মচারীর ডায়রী হইতে)

১। যার দ্বারা উপকার হয় যদি তাকে উপকৃত ব্যক্তি মানে তবে ত নিজেরই কল্যাণ। ভগবানের ঘরে বাঁচোয়া না মানলে সেই ভুগবে।

২। সৎ হইলে অনেক লোক অন্ন পায়।

৩। ভাই ভাইএ মিল হয় না, আবার ধর্ম্ম করবে কি ?

৪। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলছেন দয়া আমার কোথায় ? যেথানে যার দ্বারা কর্ম্ম করিয়ে লই।

৫। অসৎ সঙ্গ করলে অসৎ বুদ্ধি আস্‌বে। যেমন সঙ্গ কর, তেমনি ফল পাবে।

৬। যে তাঁর জন্য দুঃখ করে সে ফল পায়।

৭। বাসনাতে লোক মরে, দুঃখ পায়। ক্রমাগত বাসনা উঠে।

৮। জান আর না জান তাঁর গুণ যাবে কোথা ! আনন্দময় তিনি, জগতের কর্ত্তা, ত্রিলোকনাথ তিনি মানুষরূপ ধারণ করেছেন। ওঁরা শক্তিমান পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গোয়ালার ঘরে লালিত, দেখিয়ে দিলেন আমি যেথানে জন্ম লই, সেথানে কোন দোষ নেই। হে জীব ! দোষ ধরিও না।

৯। সৎ লোক সৎ লোককে উপকার করে। এর নাম সাধু সঙ্গ।

১০। উপরে ভক্তি, ভিতরে কপট দেখলে ভগবান বুঝতে পারেন, দেখতে পান।

১১। দান করলে দানের ফল পাওয়া যায়।

১২। তপস্যা করলে ভগবান পাওয়া যায়।

১৩। সৎ লোকের কথাই সার।

১৪। যার অন্ন খেয়ে অনিষ্ট কর, তার ভোগ ভুগতে হবে।

১৫। যে নিজেও দুঃখ ভোগ করে, অপরকেও দুঃখ ভোগ করায় সেই সয়তান।

১৬। সৎ বুদ্ধি হলে সকলেই আদর করে।

১৭। আজ কাল যে সময় পড়েছে, কা'র উপর নির্ভর করা কঠিন।

১৮। সৎ কাজ যত হয় ততই সুখের বিষয়। সৎ কাজ করতে প্রথমে কষ্ট হয়, ভবিষ্যতে আরাম হয়। আর অসৎ কাজ করতে প্রথমে আনন্দ হয়, ভবিষ্যতে দুঃখ হয়।

১৯। গুরু কৃপা করে বুঝিয়ে দিলে বুঝা যায়। যার যার অদৃষ্টে যা কর্ম্ম আছে তা হবেই।

২০। নিজে অনুভূতি করা, আর বই পড়া বহু তফাৎ।

২১। সাধু, রাজা, নদী, অগ্নি এঁদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হয়। কোন্ সময় কখন কি যে মেজাজ হয় তা বলা যায় না।

২২। কার ইচ্ছা যে দুঃখ ভোগ করি, বুড়ো হই ?

২৩। এ জগতে কারুর সুখ নেই। যার অর্থ আছে তার দুঃখ, যার অর্থ নেই তারও দুঃখ। ভগবান বলছেন, হে জীব! আমায় ভুলিও না।

২৪। যে যার সংস্কার লয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

২৫। ভগবানকে লয়ে পড়ে থাক। কারুর হিংসা করিও না, হিংসাতেই যত গোলযোগ, হিংসুকেরাই দুঃখ পায়।

২৬। ভগবানের সুখে ক'জন সুখী ?

২৭। যার সংসারে কিছু নেই- সে আর ভগবান ছাড়া কাহাকে ডাকবে, যার সব থাকতে ভগবানকে ডাকে তারই বাহাদুরী।

২৮। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দ্বারা কর্ম্ম করিয়ে নিচ্ছেন, খুব কাছে আছেন অথচ জানতে দিচ্ছেন না যে তিনি ভগবান! হে অর্জ্জুন! কর্ম্ম কর আর আমার দোহাই দেও, তা হলে আমাকে বুঝতে পারবে।

২৯। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্ম্ম করতে হয়। আকাঙ্ক্ষা করে কর্ম্ম করলে সিদ্ধাই হয়। ভগবান সিদ্ধাইকে ঘৃণা করেন। সিদ্ধাই এত ঘৃণিত যে সে জায়গা অপবিত্র হয়।

৩০। ভগবানের নাম হয় না বলেই ত জগতে এত কষ্ট।

৩১। সঙ্গ করলে কি স্বভাব যায়? কথায় আছে কাকের সঙ্গে এক হাঁসের খুব বন্ধুত্ব ছিল। কাক হাঁসকে, হাঁস কাককে নিমন্ত্রণ করেছিল। হাঁস কাককে ভাল জিনিষ খাওয়াইল, কাক হাঁসকে বিষ্ঠা খাওয়াইল। এর অর্থ এই যে কাকেরও হাঁসের সঙ্গ করে স্বভাব যায় নাই।

৩২। বিপদের সময় যে সাহায্য করে সেই বন্ধু।

৩৩। সংসারে জনে জনে কর্ত্তা হইলে চলে না, একজন সংসারে কর্ত্তা হলে সে সংসার ভালরূপ চলে। তেমনি ধর্ম্ম জগতে ভগবানকে কর্ত্তা করে কায করলে ভালরূপ ফল পাওয়া যায়।

৩৪। ভগবান বলছেন, যে তাঁকে জেনেছে তার সঙ্গ কর।

৩৫। কলিতে যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা কিছু নেই। কলিতে ভগবান সে শক্তি দেন নাই। কেবল হরিনাম ছাড়া অন্য গতি নেই। জীব হরিনাম করবে না, ভগবানকে কি করে বুঝবে? এই জন্যই ত দুর্দ্দশা; চৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্য শাস্ত্র বাক্য—সে কি মিথ্যা? হরিনাম করলে ভবরোগ দূর হয়। অবতারদের বাক্য না মেনেই জীবের এ দুর্দ্দশা।

৩৬। শাক্ত হউক বৈষ্ণব হউক, শৈব হউক শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন গতি নাই।

৩৭। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, দুপুর মধ্য রাত্রি—এই চা'র সময় মধ্যে যে সময় ইচ্ছা সে সময় নিয়মিতরূপে ধ্যান জপ করা উচিৎ। তা হলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়।

৩৮। লিখা পড়া করা খুব দরকার। তা'হলে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়।

৩৯। সন্দেহ দূর হ'তেই হবে। সন্দেহ না গেলে কিছুই হবে না। সর্ব্বদা ভগবানের নাম ক'রলে সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়।

৪০। ভগবানকে ঠিক ঠিক ডাকলে দেবলোক-পিতৃলোক প্রকাশ হন।

৪১। জীবকে ঠকালে তার কি কোন কালে গতি আছে?

৪২। তিনিই সংশয় করান আবার তিনিই তাহা দূর করান।

৪৩। চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান্ বল, বিষ্ণুর অবতার বল—লিখা পড়ায়

খুব পণ্ডিত—তিনিই ভিক্ষে করে খেয়েছেন তা জীবের কা কথা! তিনি মেয়েদের ব্যাপারে খুব কড়া ছিলেন। যে সাধু হবে সে ঐ সব ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন দেখবে।

৪৪। ভগবান চাইই, এই জগতের কর্ত্তাকে যদি না পেলাম তবে জন্ম বৃথা।

৪৫। প্রহ্লাদের পবিত্র অহেতুক বৈরাগ্য। কারুর হেতুতে বৈরাগ্য হয় তাও ভাল। যে কোন কারণে ভগবানকে ডাকতে পাল্লেই হলো ভাল।

৪৬। ভাগবৎ শুনে যদি হুকুম প্রতিপালন করে ত জীবের কল্যাণ হবে।

৪৭। ভগবান সত্য, জগৎ মিথ্যা। এক সময় না এক সময় জগৎ নাশ হবে, ভগবান কখনও নাশ হন না।

৪৮। মন যত উচ্চ হবে তত দুঃখ দূর হবে, সুখী হবে?

৪৯। যার দ্বারা সৎ কায হয় তাকে কি ভোগাতে পারে?

৫০। য়ার ভগবানের অভাব হয় সেই ভগবানকে ডাকে। এই সংসার সুখ নিয়েই ব্যস্ত। যতটুকু হয় ততটুকুই ভাল।

৫১। কলিতে জীবন ধারণ করে একটু মাছ-মাংস খেলে কি হয়? পবিত্র জীবনের কোন দোষ নেই। মাছ, মাংস খেয়ে তবু ভগবানকে ডাকৃছে, ভগবান ভগবান কচ্ছে, আর তোমরা মাছ-মাংস না খেয়ে বজ্জাতি কচ্ছো! হে জীব! পবিত্র হও, পবিত্র হলে ভগবান দয়া করেন।

৫২। ভক্ত নানা রকমের আছে।

৫৩। ভগবান বলছেন যতটুক পার জীবকে রক্ষা কর। জীবকে নষ্ট করিও না জীবকে রক্ষা করতে করতে আমাকে বুঝতে পারবে যে আমি কি জিনিষ!

৫৪। গৃহস্থই হোক আর সাধুই হোক ভগবান কর্ম্মহীনকে খুব ঘৃণা করেন।

৫৫। সুখে কি কেউ চাকুরী করে? দুঃখ থেকে চাকুরী করে।

৫৬। ভগবানের এমনি মায়া যে কোথায়ও মেঘ নাই হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি এল।

৫৭। সৎ কাজ যে করে সে সৎ লোক বৈ কি! বিশেষ টাকার মায়া ছাড়া বড়ই কঠিন।

৫৮। যার অর্থ আছে সে যদি গরীব দুঃখীকে না দেয় তা হলে ভগবানের কাছে দোষী। যার অর্থ নাই তাকেই সাহায্য করা উচিৎ।

৫৯। যে হরষিত হয়ে তাঁর জিনিষ তাঁকে দেয় সেই ভাগ্যবান পুরুষ। ভগবান তাহা গ্রহণ করেন।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।)

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(সমাধান)—না 'এইরূপ বলিতে পার না। কেননা সেই সময়ে মুখ্য আসক্তি প্রভৃতির ন্যায় তাহাদের আভাসও স্থিতপ্রজ্ঞতার বাধক হয়। (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, সেই) রজ্জুসর্পও তৎকালে প্রকৃত সর্পের ন্যায়ই ভীতি উৎপাদন করে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ। *

(শঙ্কা)—আচ্ছা (সেই আসক্তি প্রভৃতির) আভাসকে যদি আভাস বলিয়া স্মরণ রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে ত কোনও বাধা ঘটিতে পারে না।

(সমাধান)—দীর্ঘজীবি হও * * * ইহারই নাম জীবন্মুক্তি, ইহাই আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু যে সময়ে বিচারে জয়লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,

---

* অর্থাৎ পরে না হয় সর্পভ্রম অপসারিত হইলে সেই সর্পকে রজ্জু বলিয়া জানা গেল কিন্তু প্রথম দর্শন কালে ত তাহা প্রকৃত সর্পের ন্যায় ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। সেইরূপ অস্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যেন প্রজ্ঞাবলে পরিশেষে আসক্তি প্রভৃতিকে তিরোহিত করিলেন, কিন্তু প্রথম আবির্ভাব কালে তাঁহাকে ত জ্ঞানহীনের ন্যায় বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছিল।

সেই সময়ে এইরূপ ছিলেন না, কেননা চিত্তের বিশ্রান্তিলাভের জন্য বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণ করিতে তখনও তাঁহার বাকী ছিল। তখন যে তাঁহার কেবল বিচারে জয়লাভ করিবারই ইচ্ছা ছিল, তাহা নহে, প্রবল ধনতৃষ্ণাও জন্মিয়াছিল, কেননা বহুসংখ্যক ব্রহ্মবিদ্‌দিগের সমক্ষে স্থাপিত, সহস্র সালঙ্কার ধেনু বিনানুমতিতে গ্রহণ করিয়া তিনি নিজেই বলিতেছেন :—

"নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্ম, গোকামা এব বয়ং স্মঃ ইতি"

(বৃহদাউঃ ৩।১।২)

আমরা (উপস্থিত) ব্রহ্মিষ্ঠ পুরুষকে প্রণাম করিতেছি। (যদি বল তবে তাঁহার প্রাপ্য ধেনুগুলিকে কেন স্বগৃহে লইয়া যাইতেছ ? (তবে বলি) আমরা হইতেছি কেবল গোকাম (গো প্রার্থী)।

(শঙ্কা)—আচ্ছা ইহাত হইতে পারে যে অপর ব্রহ্মবিদ্‌দিগকে অবজ্ঞা করিবার উদ্দেশ্যে ইহা এক প্রকার বাক্যের ভঙ্গী মাত্র।

(উত্তর)—তাহা হইলে ইহা আর একটি দোষ। আর অপর ব্রহ্মবিদ্‌গণ আপনাদের প্রাপ্য ধন যাজ্ঞবল্ক্য অপহরণ করিতেছেন মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিই আবার ক্রোধপরবশ হইয়া শাপ দিয়া শাকল্যের মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন।* কেহ যেন এরূপ মনে না করে যে ইনি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া মোক্ষলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কেননা কৌষী-তকিগণ পাঠ করেন (কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ ৩।১)

"নাস্য কেনাপি (কেন চ) কর্ম্মনা লোকো হীয়তে (মীয়তে) ন মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন, ন স্তেয়েন, ন ভ্রূণহত্যায়া ইতি। †

(কোনও কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার সেই অবস্থা হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, মাতৃবধের দ্বারাও নহে, পিতৃবধের দ্বারাও নহে, চৌর্য্যের দ্বারাও নহে ভ্রূণহত্যার দ্বারাও নহে।)

---

* টীকা—বৃহদা উপ, ৩।৯।২৬।

† টীকা—মূলে কিন্তু "কেনাপি" স্থলে "কেন চ" এবং "হীয়তে"র স্থলে "মীয়তে" এইরূপ পাঠ আছে।

বাংলা সাহিত্যে সংযম।

(স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ)

ইংরাজগণের ভারতাধিকারের পর হইতে বাংলাভাষা শিশুজীবন হইতে যৌবন সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শত বৎসরের মধ্যে কত একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী বাংলার দীনাতিদীন ধূলিমলিন অঞ্চলে জন্মলাভ করিয়া বিশ্ব-সৌন্দর্য্যাগার হইতে কত নিরূপম রত্নরাজি, কত চির-নবীন কুসুম নিচয়, কত চির-শ্যামল লতাবিতানে বীণাপাণির চিন্ময়ী প্রতিমা ও অর্চ্চনা মন্দির সুসজ্জিত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। হইতে পারে—চণ্ডিদাস, ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, গিরীশচন্দ্র, রমেশ-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র ও স্বর্ণলতার মত জননীর মুখোজ্জলকারী সন্তান সন্ততির সংখ্যা প্রচুর নহে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় সেই ক্ষুদ্র 'কাঠ বিড়ালে'র সামান্য উদ্যমও ভগবদ্ চক্ষে সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। ভাষাই জাতীয় ভাবের প্রকাশক। ভাষা যে পরিমাণ সরল, স্বাধীন ও সম্পূর্ণ হইবে জাতীয় ভাব-স্পন্দনও সেই পরিমাণ সরল, মুক্ত ও পরিপূর্ণ আকার ধারণ করিবে। ভারতের জাতীয় জীবন উন্নত করিতে হইলে মাতৃ-ভাষার উন্নতি বিধান যে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য তাহা সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করেন। ভাষা ভাবের স্থূল অভিব্যক্তি। মাতৃভাষাকে বৈদেশিক স্নেহ হইতে মুক্ত রাখিতে পারিলে আমরা বৈদেশিক ভাব হইতে যে বহুল পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইব ইহা সুনিশ্চিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেশীয় অন্যান্য ভাষার বিষয় অনধিকার চর্চ্চারূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক যে দিন ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইল সেই দিন যেন আমাদের ভাষা পূর্ণজীবন লাভ করিল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য, অস্পষ্ট, ভ্রমসঙ্কুল হস্তলিখিত

পুঁথি ছাড়া আমাদের মাতৃ-ভাণ্ডারে আর ছিল কি? ছিল অনন্ত ভাবপ্রবাহ যাহা ইংরাজগণের শুভেচ্ছায় আজ অনন্ত রূপে ও অনন্ত ভঙ্গীতে প্রকৃতির অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে। দুই শত বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত ভাব পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে যদি মুদ্রণের প্রবর্ত্তন বাংলাদেশে না হইত তাহা হইলে উহা যে কতদিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীর অনন্ত সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণার বিষয় বিশ্ববাসীর নয়ন সমক্ষে উপস্থিত করিত তাহা বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন বাংলা সাহিত্য প্রবাহে প্রবল জোয়ার আনিয়া দিলেও ঐ জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে আবিলতা ভাসিয়া আসিয়া যে সে প্রবাহের বিশুদ্ধতা অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তুমি বলিবে সকল জিনিবের ভাল মন্দ দুটা দিকই আছে—ভাল'র সঙ্গে মন্দটা ত আসিবেই তাহাতে কি করিবে? আমি বলি তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও কোন একটী দ্রব্যের মন্দ দিক্‌টা বর্জ্জন করিবার চেষ্টাই মানব জীবনের বিশেষত্ব। ভগবদ্ সৃষ্ট অন্যান্য জীবের মধ্যে কেবল মনুষ্যই কোন একটা বস্তু হইতে মন্দাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাল অংশটী গ্রহণ করিতে সচেষ্ট ও সক্ষম হয়। নির্ব্বিচারে কোন একটী জিনিষ গ্রহণ না করিয়া বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অনন্ত ভাববাহী সাহিত্য-চর্চ্চা-স্রোত বাংলার মস্তিষ্কে আজ যেমন কোন্ অজানা অমর রাজ্যের অমৃত বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে, মৃত সঞ্জিবনীসুধা পান করাইয়া বাংলার হৃদয়ে যেমন নূতন আলোকের নব-স্পন্দন অনুভব করাইতেছে, তদ্রূপ সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা বিষাক্ত বায়ুও উড়িয়া আসিয়া এই নবজীবনের পাদদেশে ভীষণ কুঠারাঘাত করিতেছে। যদি আমরা আমাদের জাতীয় জীবন উন্নত ও রক্ষা করিতে বাস্তবিকই ইচ্ছুক হই, তবে এই বিপুল সাহিত্যচর্চ্চার দিনে আমাদিগকে কিছু সংযমী হইতে হইবে। দেখা যাইতেছে কাগজ ও মুদ্রণের সুলভতা বহু অবিবেকী, দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখক-লেখিকাকে তাহাদের নিজ নিজ চরিত্রগত ভাবানুযায়ী পুস্তক প্রণয়নে উন্মুখ করিয়া বাংলার ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনকে দুর্ব্বল ও ব্যাভিচারী করিয়া ফেলিতেছে;

এবং অসংখ্য শিশু—মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রভৃতি বাজারে জন্মলাভ পূর্ব্বক পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দিগ্-বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া অখাদ্য খাইয়া সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দেশবাসীকে অনর্থক বিপন্ন করিয়া ফেলিতেছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই সকল বিবেকহীন চিত্তের দুর্ব্বল চিন্তাপ্রবাহ, যাহা মানবকে মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বে লইয়া যায়, নানা আপাতমনোরম অরুচিকর ভাবপূর্ণ পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদের স্বভাবলুব্ধ মনকে প্রলুব্ধ করতঃ মস্তিষ্কের বিভ্রান্তি ঘটাইতেছে। যে সকল ভাব গুরুজন সমক্ষে প্রকাশ করা দূরে থাকুক বন্ধুবর্গের নিকটও যাহা অকথ্য সেই ভাবরাশি ভাষা ও লেখনী সংযোগে বড় ছোট প্রায় সকল মাসিক সাহিত্যের অঙ্গে ব্রণের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় স্বাস্থ্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। দেখিতে পাওয়া যায় যাহার আদর্শ উচ্চ না হয় তাহা জনসমাজে বড়ই বিপজ্জনক হইয়া উঠে। তথাকথিত বর্ত্তমান সাহিত্যসেবী বা বীণাপাণির অর্চ্চনাকারি-দের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় না যে তাহাদের উদ্দেশ্য সচন্দন কুসুমদামে বাগ্দেবীর অর্চ্চনা করা—বরং মনে হয় তাহারা যেন নিজ নিজ স্বার্থ চেষ্টাতেই প্রমত্ত। বড় বড় মঠের ও মন্দিরের মোহন্তদের জীবনো-দেশ্য আজ ঈশ্বরোপাসনা হইতে যেমন কাঞ্চনোপাসনায় গিয়া উপনীত হইয়াছে বর্ত্তমান সাহিত্যসেবীদের উদ্দেশ্যও যদি ঐরূপ হইয়া দাঁড়ায় তবে অগত্যা আমাদের বলিতে হইবে—"হে ভগবান, সাহিত্যিকদের হস্ত হইতে আমাদের নিস্তার কর!" অধুনা প্রকাশিত উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিতে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না—ধর্ম্ম, দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের জন্য বড় বড় আত্মত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ, দেখিতে পাওয়া যায় না ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, সত্য ও সংযমের ভূরি ভূরি নিদর্শন, দেখিতে পাওয়া যায় না কেমন করিয়া দীনহীন সমাজ ও দেশ ধীরে ধীরে স্বাধীনতার আলোকে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে, কেমন করিয়া ন্যায়, সত্য ও সাধনা সহায়ে চিরদুর্ব্বল মানব ঈশ্বরত্বে উপনীত হইতে পারে, কেমন করিয়া একটি ব্যষ্টি মানবের আত্মবিসর্জ্জনে দেশের সমগ্র নর-নারী অসত্যের পথ হইতে সত্যপথের আশ্রয় গ্রহণ করে,—কেবল দেখিতে

পাওয়া যায় দরিদ্র পল্লীবাসী ছাত্রের প্রেম, বিধবার আসক্তি, এবং সর্ব্বোপরি সধবার বিশ্বাসঘাতকতা—ইহাই অধুনা আমাদের সাহিত্য চর্চ্চার বিষয়। বড়ই দুঃখের বিষয় বড় বড় সাহিত্যসেবী ও নামজাদা মাসিক পত্রিকাগুলি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যিক ও পত্রিকাগুলি সকলেই এই ভীষণ অপবাদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতে-ছেন না। সাহিত্যসেবার উদ্দেশ্য কি সমাজ ও দেশ সেবা নহে? সাহিত্যই সমষ্টি মানবের মধ্যে ব্যষ্টির ভাবরাশি বিকীর্ণ করিবার যন্ত্র স্বরূপ। তা ভাল হউক আর মন্দ হউক উভয় ভাবরাশিই সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায়। যে সমস্ত নব্য সাহিত্যিক সমাজ, দেশ ও জাতির পাতে কিছু শুভকর, কিছু কল্যাণকর দ্রব্য দিতে সক্ষম নহেন তাঁহারা কি অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষের বাটী পরিবেশন করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যের পূর্ণ পরিসমাপ্তি করিবেন? আমাদের চিত্ত ত 'আদি-রসে' দিবারজনী হাবুডুবু খাইতেইছে, তাহাকে আর জোর করিয়া উহার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া লাভ কি? হিন্দুর সাহিত্য হইতে, হিন্দুর মস্তিষ্ক হইতে কি 'আদিরস' ব্যতীত অন্য সমস্ত রস এককালে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে? অন্য জাতির সম্বন্ধে তাহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুজাতির পক্ষে ঐরূপ হইবার কোন সম্ভবনা নাই। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় হিন্দুর বর্ত্তমান সকল বর্ণের মূলেই কোন না কোন ঋষি মহর্ষির অস্তিত্ব বিরাজ করিতেছে। যাঁহাদের মন একদিন পার্থিব ভোগবিলাস তুচ্ছ জ্ঞানে প্রকৃতি দেবীর অবগুণ্ঠন মোচন করতঃ তাঁহার অন্তরালস্থিত অনন্ত সৌন্দর্য্যসুধার একবিন্দু পান করিয়া সমাধি সাগরে ডুবিয়া যাইত তাঁহাদের বংশধরগণ যে আজন্ম কবি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ যে প্রকৃতিসুন্দরীর অবগুণ্ঠনান্তরালে অন্য কোন রস-সৌন্দর্য্য না দেখিতে পাইয়া কেবল 'আদি-রসের'ই বিকাশ দেখিতেছেন ইহা তাঁহাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন—'যে বার বছর দাসত্ব করে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়।' হিন্দুর এই সহস্র বর্ষ ব্যাপী দাসত্বের ফলে যে তাহার মনুষ্যত্ব এককালে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার মতিগতি বক্র হইবে, রুচি

বিকৃত হইয়া যাইবে, যাহা কিছু সতেজ, বলকর তাহাতে বিরাগ জন্মিয়া যাহা কিছু দুর্ব্বলতাবর্দ্ধক, মস্তিষ্ক-বিকৃতিকর তাহাতে অনুরাগ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই উঠা-জাগার দিনে যখন সমস্ত হিন্দুজাতি স্বাধীনতার অমৃতবারি পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেছে তখন আমাদের যাহা কিছু অমঙ্গলজনক, যাহা কিছু দুর্ব্বলকর, যাহা কিছু অবাধ উন্নতির পরিপন্থী, সেই সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে হইবে। আজকাল বাংলার প্রতি সহরে, প্রতি পল্লীতে জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে, জাতীয় ভাষার উন্নতিবিধানকল্পে দেশের বড় বড় মাথা চিন্তিত রহিয়াছে, তাঁহারা যদি ভাষার মধ্য হইতে যাহা কিছু পঙ্কিল, যাহা কিছু বিকৃত রুচির পরিচায়ক সেই সমস্ত কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে সচেষ্ট না হন তবে আমাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে— বাংলার পূর্ব্ব দিক্‌চক্রবালে মঙ্গল উষার পদার্পণে এখনও অনেক বিলম্ব। দেশের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহারা উৎকৃষ্টতর কিছু চাহে না, অন্ধকারে বহুদিন অবস্থান করিয়া আলোকের স্বর্ণরশ্মি আর পছন্দ করে না। তাহার নিদর্শনরূপে বলিতে পারা যায় বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে সমস্ত পুস্তক শিক্ষাপ্রদ, যাহারা উচ্চ ভাবের দ্যোতনায় মানব মনকে ভরাইয়া তুলে সেই সমস্ত পুস্তক দোকানে বহুদিন পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে কীটের আহার্য্য হইয়া থাকে; যে কয়টী মাসিক, পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পত্র দেশের উন্নতি বিধানের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, সমাজ ও দেশের প্রকৃত সেবাই যাহাদের সাধনার একমাত্র লক্ষ্য তাহাদের জীবন দেশ-জননীর স্তন হইতে ক্ষীরধারার অভাবে আজ মৃতপ্রায়! বুদ্ধদেব, নিমাইচরিত, শঙ্করাচার্য্য, সাবিত্রী প্রভৃতি উচ্চ ভাবের নাটক সমূহ অভিনীত হইলে রঙ্গালয়ে আশানুরূপ দর্শকের অভাব হয় কিন্তু কুরুচিপূর্ণ নাটক ও প্রহসন সমূহের অভিনয়কালে অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে যুবক যুবতী, বালক বালিকা সকল শ্রেণীর দর্শকের আতিশয্যে রঙ্গালয় পূর্ণ হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—মানবের এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় ঘৃতাহুতি না দিয়া

উহাকে এককালে নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করা। তাঁহাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন হইতে বিরত হইয়া উহাদের যথাসাধ্য সেবা করা। তাহা না পারিলে সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের চিরবিদায় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য—কেন না কাহারও উপকার করিতে সক্ষম না হই অপকারের প্রয়োজন কি? মানবজাতির মঙ্গল সাধন না করিতে পারি—অমঙ্গলের হেতু হইব কেন? বর্ত্তমান সময়ে ভারতের জাতীয় জীবনের সকল স্তরেই যখন আমূল সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, সকলের উদ্দেশ্যই যখন দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন তখন সাহিত্যিকগণের সকল সাধনাও ঐ একেরই অভিমুখী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভগবদ্ সাধনায় যেরূপ সংযমের প্রয়োজন, সংযম ব্যতিরেকে যেমন সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব সাহিত্য ক্ষেত্রেও তদ্রূপ সংযমের একান্ত আবশ্যক। সংযমহীনতা সাহিত্য সাধনাতেও নানারূপ ব্যভিচার সৃষ্টি করে। এই ব্যভিচার সাধকেরও অনিষ্ট সাধন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও সমাজকেও হীনাদর্শ করে। বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণ যদি সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নিজ নিজ আভ্যন্তরিক কুরুচি সমূহ দেশের সর্ব্বসাধারণের পাতে এখনও পরিবেশনে বিরত না হন তবে অগত্যা অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইবে—"আপনি মজিবে ভাই, মজাবে লঙ্কায়!"

সমালোচনা

নিবৃত্তির পথে।—শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত। ইহাতে অতি সংক্ষেপে ষড়্‌দর্শন প্রসঙ্গ ও পৌরাণিক সাধনাতন্ত্র আলোচিত হইয়াছে। শারীরক মীমাংসাদি দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে যে কয়টী প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, যাহাদের তদ্‌বিষয়ক প্রচুর জ্ঞান আছে তাঁহাদের নিকট উপাদেয় হইলেও সাধারণের নিকট ইহা প্রায় দুর্বোধ্য। অতএব বঙ্গভাষায় ইহার পুনরাবৃত্তির সার্থকতা কি?

পথের সাথী।—স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাবিশারদ, কল্পতরু-গুরুকুল-প্যাব্লিশিং-হাউস। জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া অমর পথের পথিকের 'পথের সাথী'। উক্তি,—"বিশ্বাস কর, তোমার কর্ম্মজীবনই ভগবানচরণে রক্তজবার পুঞ্জীকৃত অঞ্জলি। প্রত্যয় রাখ, তোমার প্রত্যেকটা উজ্জ্বল চিন্তা, তাঁহার আরতির অমর আলোক।" "যত তিমিরাচ্ছন্নই হউক না কেন মানুষ আলোকেরই পুত্র; যত অবসন্নই হউক না কেন, সবলতারই সে উত্তরাধিকারী।"

পথের প্রদীপ।—স্বামী স্বরূপানন্দ। প্রকাশক—শ্রীনকুলেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, কল্পতরু-গুরুকুল-সমিতি। জাতীয়তার সাধন "পথের প্রদীপ।" উক্তি—"নির্ভর করিও, জলন্ত সাধনায়—জীবন্ত তপস্যায়, কথার উপরে নয়। বিশ্বাস করিও, প্রাণের প্রেরণায়—অন্তরের আহ্বানে, বাহিরের উচ্ছ্বসিত শত কল কোলাহলে নয়।" "হৃদয়টাকে যে যত নির্ব্বিচারে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে বিলাইয়া দিয়াছে, সে তত বলবান্; আর অপ্রেমের দৃঢ় রজ্জুতে আপন বিরাট অস্তিত্বটাকে বাঁধিয়া যে যত সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সে তত দুর্ব্বল।"

দেশের কাজ ও পল্লীর ব্যবস্থা।—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দে। প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী লাইব্রেরী। লেখক বলিতেছেন "মানুষ তৈয়ারীর কথা বলিতে যাইলেই আমাদিগকে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে Child is the father of a man." "পিতামাতার কর্ত্তব্যের উপর শিশুর পূর্ণ মনুষ্যত্বের দাবী করা যদিও অন্যায় তবুও ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে মনুষ্যত্বের foundation stone (ভিত্তি প্রস্তর) পিতা-মাতাকেই সর্ব্বাগ্রে বসাইতে হইবে।" "যাহার নিকট হইতে কোনও বিষয় জ্ঞান লাভ করা যায় তিনিই গুরু; গুরুর জাতি বর্ণ ভেদ নাই। তাঁহার আদর্শ এবং কর্ম্মময় জীবনই শিশুর ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক।" "আদর্শ যুবকমণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে হইলে বালকগণকে উপযুক্ত সময়ে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে হইবে।" "Yellow Peril-এর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ভীতিও বালকগণকে শঙ্কিত ও ত্রস্ত করিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্য জ্ঞান

হইতে অনেক দূরে সরাইয়া ফেলিতেছে।" জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতেছেন "জাতীয় প্রাচীন্ ইতিহাস জ্ঞান বিজ্ঞানের অসীম ভাণ্ডার এখনও যাহা অনন্ত সমুদ্রের মত পড়িয়া রহিয়াছে তাহার অতল তলে ডুবিয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নবীন সভ্যতার পাশ্চাত্য মেঘ খানি কোন্ স্থানে যাইয়া দাঁড়ায় তাহারও একটা সন্ধান রাখিতে হইবে। মোট কথা প্রাচ্যের অনন্ত জ্ঞান রাশির সহিত পাশ্চাত্যের ব্যবসায়াত্মিকা আধুনিক শিল্প চাতুর্য্য ও নব নব বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আমাদিগকে আপনার করিয়া লইতে হইবে।" "পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে। এ ইতিহাস দুই একটি রাজা গজার বংশ তালিকা নয়, ইহা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং নূতন পুরাতন সর্ব্বকালিক দেশের অবস্থা, আচার ব্যবহার; আদান প্রদান পদ্ধতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষিসাহিত্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত সমস্ত বিষয়ে যে কোন Exhaustive খবর দিতে পারে সেইরূপ ইতিহাস পড়িতে হইবে; ভৌগলিক বৃত্তান্ত, ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা অসুবিধার কথা সমস্তই শিখিতে হইবে।" কৃষি—"ভারত কৃষি প্রধান দেশ,—এ দেশে চাল, গম, পাট, তিষি, তুলো, চা, নীল, ইক্ষু যাবতীয় Raw material এবং কত প্রকার খনিজ পদার্থ ই না জন্মাইতেছে, কিন্তু আমরা বিলাসিতায় গা ভাসাইয়া দিয়া আরাম কেদারায় বসিয়া আলস্যের এক একটি জীবন্ত বিগ্রহের মত সখের জন্য সমস্ত দ্রব্যই বিদেশীকে বিকাইয়া দিয়া দু' আনার জিনিষ ভড়ং বদলাইয়া পাঁচ টাকায় কিনিতে বাধ্য হইতেছি, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় এবং মূর্খতা কি হইতে পারে।" শিল্প—"আর্থিক হিসাবে ভারতকে বড় করিয়া তুলিতে হইবে ভারতের গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে শিল্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে; বৃহৎ বৃহৎ mill, factory ইত্যাদি করিয়া পাশ্চাত্য অনুকরণে ব্যয়ের ভার বাড়াইয়া ফেলিয়া, পাশ্চাত্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির সহিত প্রতিযোগীতা ভারতের পক্ষে আপাততঃ সম্ভব হইবে না।" "এরূপ ভাবে শিল্প প্রচার করিতে হইবে যে সামান্য মানবকেও ভারতবাসী কোন দিন অপমান জনক মনে না করে এবং এমন কি বিলাসের সাজসরঞ্জামের জন্যও যেন

সে কোন দিন পরের দ্বারে হাত পাতিয়া চাহিয়া না থাকে।" রপ্তানি ও আমদানী—"ভারতের এই অভাব দূর করিতে হইলে. প্রথমতঃ ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যাদির অবাধ রপ্তানি দুই দিন আগে হোক বা পরে হোক যে কোন প্রকারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের দরকার তাহার অতিরিক্ত আমরা উৎপন্ন করিব না বা করিলেও তাহার উপর দেশের একটা control থাকিবে। বিদেশীয় দ্রব্যাদি যাহাতে ভারতের হাট ঘাট গ্রাম মাঠকে ছাইয়া ফেলিতে না পারে তজ্জন্য বিদেশীবর্জ্জন পণ করিতে হইবে; অন্যথায় সহস্র চেষ্টাতেও দেশীয় শিল্প মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না এবং সমস্ত আশা বিলীন হইয়া যাইবে।" পল্লী সংস্কার—"পল্লীদৃশ্য যতই কেন বিভিষিকা-ময় হউক না কেন তাহার সাম্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ভার আমাদের" কত প্রাণ নষ্ট হইবে, কত প্রকার দুঃখের ঝঞ্ঝায় এবং নিরাশার হুহুরবে মনপ্রাণ অস্থির হইয়া দেহী আত্মগোপনে প্রয়াস পাইবে; দেহ আর চলিতে চাহিবে না. কত অপমান সহ্য করিতে হইবে, তখন অতিষ্ঠ হইলে চলিবে না।" স্বাস্থ্য—"গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট সংস্কার ও জলাশয় খননের ব্যবস্থা করিতে হইবে; দরকার হইলে তজ্জন্য নিজের হাতে কোদাল ধরিতে হইবে। ছোটখাট খানা ডোবা যাহার ভিতরকার অপরি-ষ্কার জল গৃহীর স্বাস্থ্য রক্ষার বিঘ্ন ঘটায় সে সমস্ত বিষয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া ঐ সমস্ত গর্ত্তাদি ভরাট করাইয়া লইতে হইবে।" তাহা ছাড়া প্রাচীন পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, কূপ খনন, বৃক্ষ রোপন, জঙ্গল পরিষ্কার, খাল, বিল, ডোবা, ঝিল বা পুকুরের জলে মল মূত্রাদি ত্যাগ নিবারণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইবে। জলে ডোবা, আগুণে পোড়া, সর্পাঘাত প্রভৃতি আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষার উপায়, এবং মাদক দ্রব্য ব্যবহার প্রভৃতির অনুপকারিতা শিক্ষা দিতে হইবে। পুস্তকাগার, Co-operative Banking Society বা যাহাতে কৃষকগণ সামান্য সুদে একজন মাত্র জমীদারের সাহায্যে যে কোন সময়ে হাত পাতিবা মাত্র টাকা পাইতে পারে তাহার

বন্দোবস্ত, Poultry বা হাঁস, পায়রা, ছাগ, মেষ প্রভৃতি পুষিবার বন্দোবস্ত, মৎস্য, গরু, শূকর প্রভৃতির সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বামীজীর 'সোনার-ভারত' আবিষ্কারের পথ অতি দুর্গম বলিয়া কবির গানে গ্রন্থারম্ভে লেখক প্রার্থনা ও দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন,—

"তোমার পতাকা যারে দাও বহিবারে দাও শকতি
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া, দুঃখের মাঝে দুঃখের ত্রাণ
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহিনা মুকতি
দুঃখ হবে মম মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি।"

* * * *

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে।
একলা চল, একলা চল, একলা চল রে॥
যদি কেউ কথা না কয়—(ওরে, ওরে ও অভাগা!)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা, একলা বল রে॥
যদি সবাই ফিরে যায়—(ওরে, ওরে ও অভাগা!)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্ত মাখা চরণতলে একলা দল রে॥
যদি আলো না ধরে—(ওরে, ওরে ও অভাগা!)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বল রে॥

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে॥
একলা চল একলা চল
একলা চল রে॥"

সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অভাব অভিযোগ এবং উহা কি ভাবে প্রবর্ত্তন ও পরিচালনা করিলে ভবিষ্যৎ স্ত্রীসমাজের কল্যাণ হইবে এ সমস্যা আজ প্রত্যেক ভারত ভারতীর নিকট আসিয়া উপস্থিত। এমন সময় আসিয়াছে যে, আমাদিগকে চুপ্ করিয়া আর ভাবিলে চলিবে না—এখন বিলম্বের অর্থ জাতীয় উন্নতির অগ্রগতিতে বাধা প্রদান। 'স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার কর' এই রব যেমন আমরা নিত্য শুনিতেছি, তখনই আবার ভাবনা, কি প্রকারে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাহাতে ভারত-লক্ষ্মীদের অন্তরের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা নষ্ট না হয়, বিকৃত না হয়।

রমণীগণের জীবন ভারতে বর্ত্তমান কালে কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত—পাশ্চাত্য মহিলাগণ, সমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেছেন, ভারতের কন্যাগণকে সেই সকল কতদূর প্রদান কর্ত্তব্য,—প্রভৃতি সমস্যাসকলের মীমাংসাস্থলে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"স্ত্রীজাতীর জীবন ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে সকল কথা রমণীগণের দ্বারাই নিরূপিত হওয়া উচিত—কারণ, তাঁহাদিগের ন্যায্য অভাব ও আকাঙ্ক্ষা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে অনেকস্থলে নিঃস্বার্থ পুরুষগণেরও সামর্থ্যে কুলায় না। অতএব বৈদিক-যুগে রমণীদিগকে পুরুষের ন্যায় যেরূপে সমভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হইত, এখনও ঐরূপ করিয়া অন্য সকল বিষয়ে আমাদিগের নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য। উহাতে সুশিক্ষিতা, স্বার্থপরিশূন্যা মহিলামণ্ডলী, সীতা সাবিত্রী প্রমুখ ভারতের জাতীয় রমণী-আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।"

স্বামিজীর শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়োগ মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া বেলুড় রামকৃষ্ণ-মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ কলিকাতা বাগ্‌বাজার পল্লীস্থ বসুপাড়া লেনে ১৭নং ভাড়াটিয়া বাটীতে—বালিকা ও অন্তঃপুরচারিকাগণের কল্যাণ-কল্পে এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক গত অষ্টাদশবর্ষ কাল উহার কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ভারতের শুভ সাধনে আজীবন ব্রতধারিণী গুরুগতপ্রাণা, পরম বিদুষী সিষ্টার নিবেদিতা ও সিষ্টার ক্রিষ্টিনা নাম্নী পাশ্চাত্য ব্রহ্মচারিণীদ্বয় এবং ব্রহ্মচারিণী সুধীরা দেবী সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দৈন্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া ঐ মন্দিরে আরাধ্য দেবতার উদ্বোধন, আবাহন ও প্রাণদান পুরঃসর অন্তর্বাহ্য পূজায় সতত নিযুক্তা থাকিয়া ঐ কার্য্যে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। এই শিক্ষার যজ্ঞানলে সিষ্টার নিবেদিতা, ব্রতধারিনী সুধীরা তাঁহার জীবন পূর্ণাহুতি স্বরূপে প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্ঠা, ত্যাগ ও তপস্যাপ্রভাবে শিক্ষামন্দিরে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে তাহার পরিচয় গত অষ্টাদশ বর্ষের কার্য্য সাফল্য। বহু বালিকা ও অন্তঃপুরচারিণী রমণী এই মন্দিরে সমাগতা হইয়া প্রকৃত শিক্ষালাভে ধন্যা হইয়াছেন ও হইতেছেন।

এই মন্দিরের পরিচালিকাগণ ত্যাগ, তপস্যা, সংযম ও পরহিতে জীবনোৎসর্গ করা রূপ ব্রত স্বয়ং অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ছাত্রীদিগকে বৈদিকযুগের ব্রহ্মচারিণীদিগের ন্যায় উন্নতচরিত্রা হইতে একদিকে যেমন শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন অন্য পক্ষে সামাজিক মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম অটুট রাখিয়া যাহাতে তাহারা আবশ্যক হইলে আপনার ভার আপনি স্কন্ধে লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদ্রূপ কার্য্য ও প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরশীলা করিতে যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

যে বিদ্যামন্দির ঐরূপে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারে রমণীগণের জীবন মহিমান্বিত করিতে এতকাল ধরিয়া সচেষ্ট আছে, তাহার উন্নতিকল্পে সহায়তা করিতে আমরা আজ সকল নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। হে ভারত ভারতী! আজ সত্যই যদি আবার স্ত্রীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে

চাও, সমাজের কল্যাণ চাও তবে নিজ জাতির কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া এইরূপ কার্য্যে সহায়তা কর—উপযুক্ত স্থানে ও ভবনে এই শিক্ষা মন্দির চিরস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা কর। তোমাদের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিদ্যালয়ের জন্য বাগবাজার পল্লীস্থ নিবেদিতা লেনে প্রায় যোল কাঠা পরিমিত ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই উহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। ভাড়াটিয়া বাটী এতই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে উহাতে কার্য্য চালান বিপজ্জনক। ছাত্রীনিবাসও এত অল্পপরিসর যে উহাতে আর ছাত্রী লওয়া অসম্ভব হইয়াছে;—দিন দিন নূতন ছাত্রী প্রবেশের আবেদন আসিতেছে—কিন্তু স্থান কোথায়, অর্থ কোথায়? এই বিদ্যাদানের এবং মাতৃ জাতির কল্যাণ করিবার শুভাবসর আজ দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত। এই শুভানুষ্ঠানে যিনি যাহা দান করিবেন তাহার শতগুণ সামাজিক কল্যাণরূপে ফিরিয়া পাইবেন। এই বালিকা-শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইয়া আজ সহায্য প্রার্থী আমরা ভারতের প্রত্যেক জনক-জননীর নিকট দণ্ডায়মান। আশা করি আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। ভগিনী নিবেদিতার অমূল্য জীবনব্যাপী সাধনা পূর্ণ হউক!

আমরা আনন্দের সহিত সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত করিতেছি যে শ্রীমতী সংজ্ঞা দেবী স্বতঃপ্রবিত্ত হইয়া তাঁহার দেশীয় ভগ্নিগণের নিকট হইতে অতি সামান্য সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া মোট ৩৬১৫।৫ এই সৎকর্ম্মে সাহায্য করিয়াছেন এবং আরও ১৫০০৲ টাকা তিনি শীঘ্রই পাঠাইয়া দিবেন বলিয়াছেন। এই সচ্চেষ্টা সকল মহিলারই অনুকরণীয়। আমাদের মনে হয় এইরূপ আদর্শে প্রতি জননী চেষ্টা করিলে এই কার্য্য অতি দ্রুত গতিতে সফলতার দিকে অগ্রসর হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ বসু, (আগ্রা কলেজ), তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিনী শিবরাণী বসুর স্মৃতি-রক্ষার্থে ৫০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। শিবরাণী এই বিদ্যালয়েরই একজন বিশিষ্টা ছাত্রী ছিলেন। আজ যদি তিনি ইহজগতে থাকিতেন তাঁহা হইলে এই স্ত্রীশিক্ষাসঙ্ঘ তাঁহার নিকট বহু প্রকারে কল্যাণ লাভ করিত। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা যথার্থই ব্যথিত।

অনুগ্রহপূর্ব্বক শিক্ষামন্দির-কল্পে যিনি যাহা দান করিতে ইচ্ছা করেন নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে—

সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন,
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

"ভারতবর্ষে দারিদ্র্য অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে—ইহা সৌভাগ্য বটে; কিন্তু দারিদ্রের সঙ্গে ব্যাধির যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে, ইহা নিশ্চিত।"

—"প্রবুদ্ধ ভারত"
সেপ্টেম্বর ১৯২১।

* * *

"বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের শিক্ষাপ্রণালী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেকে মনে করেন;....................... আমেরিকাবাসীর নিকট দেশের মান মর্য্যাদা তাহার ভগবানের অপেক্ষাও প্রিয়তর।"

—"বেদান্ত কেশরী"
সেপ্টেম্বর ১৯২১।

* * *

"আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এক অত্যাবশ্যকীয় গুণ।"

—"ম্যেসেজ্ অব্ দি ইষ্ট"
জুন ১৯২১।

পূজার আনন্দ।

বৎসরের নির্দ্দিষ্ট দিন কয়টী পলে পলে শেষ করিয়া সেই পূজার দিন আবার আসিয়াছিল,—কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে কত হৃদয়ের উদ্বেলিত ধারায় দিগ্দেশ পূর্ণ করিয়া যেমন আসে, আমার এই শ্যামা মায়ের বিশাল বক্ষ শ্যাম-সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত করিয়া আসিল প্রথম শরৎ—আনন্দময়ী মায়ের আগমন বার্ত্তা লইয়া, তাহার মধুর হাসির দীপ্তি বিকীরণে আকাশ ভুবন আলোকিত করিয়া। তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলাম, আর তাহার অভিনন্দনের জন্য আমি আমার কষ্টে সঞ্চিত অতীত-স্মৃতির যে বিচিত্র বরণ-ডালা সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম তাহা সেই সুন্দরের চরণে উপহার দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আসিল —শারদীয়া আনন্দময়ী দেবী;—শরতের সৌন্দর্য্য-গরিমার উপর আনন্দের ভাণ্ডার খুলিয়া তাহাকে আরও সৌন্দর্য্যময় আরও মহিমাময় করিয়া। বড় আনন্দে মাকে বরণ করিলাম; কিন্তু জানিনা সে আনন্দ হৃদয়ের কিনা। কেবল আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দোচ্ছ্বাসে চতুর্দ্দিক ভরিয়া যাওয়া যেন একটা চিরন্তন প্রবাদ তাই নিরানন্দকেই আনন্দ বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আনন্দের স্বতঃ উচ্ছ্বাস আজ তীব্র দহনের নিষ্ঠুর জ্বালায় যেন চিরতরে শুষ্ক, নিরাশায় বিলীন।

এই পূজার বার্ত্তা একদিন বঙ্গের প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে গৃহস্বামীর হৃদয়ে, শিশুর প্রাণে প্রাণে ঘোষিত হইয়া মুখের যে আনন্দ তাহারা তাহাতে আত্মহারা হইত, আজ তাহাদেরই জীবনে সে আনন্দ স্বপ্নে পর্য্যবসিত, সে শোকের তরঙ্গে বিধ্বস্ত। দেশের, বিরাট সমাজের সকলেই কি তবে আজ একই বেদনায় জর্জ্জরিত? না তা নয়।

আজ কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া চায়না, কেহ কাহারও সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া অপরের ব্যথার ভার আপনার বুকে লইতে পারে না। আজ প্রত্যেকেই আপনার সুখে আপনি ভাসমান, আপনার দুঃখের অকূল পাথারে আপনি মজ্জমান। আশ্রয়তরী ভগ্ন, দিক হারা হইয়া তরঙ্গাভিঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

তাই আজ আনন্দময়ীর আগমনে কাহারও রত্নাভরণ শোভিত কৈলাস-প্রতিম প্রাসাদ খানি আনন্দ ও হাস্য কৌতুকের উচ্চ কোলাহলে মুখরিত, আবার কাহারও জীর্ণকুটির খানি শোক বিষাদ-জনিত করুণ ক্রন্দনের মৃদুরোলে পরিপূরিত। কেহ তাহার জীর্ণকুটির অঙ্গনে বসিয়া ভাবিতেছে পূজার কথা,—সেই সুদুর অতীতের কত স্মৃতি বিজড়িত দিনের কথা—যে দিনে সেও তার প্রতিবেশীর মত কত আনন্দে কত উৎসাহে, কত আশায় হৃদয় মাতাইয়া তুলিয়াছে। —সেই পূজাইত আবার আসিল? কিন্তু তাহার সে আনন্দ কই, সে উৎসাহ কই, সে আশাই বা কই? আজ তাহার দশদিক্ অন্ধকার বিষাদময়! আজ তাহার সকল আশ্রয় হারাইয়া গিয়াছে তাই শূন্য হৃদয়ে শূন্যে ভর করিয়া মার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, যদি সেই বরাভয়দাত্রীর চরণে আশ্রয় পায়। কিন্তু হায় একি! যেথানে সামর্থ্যের বিচিত্র প্রাসাদ-শিখর গগনস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান, তাহারই পার্শ্বে এই নিরাশ্রয় দীনের জীর্ণ কুটিরখানি পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত অনুগ্রহা-কাঙ্ক্ষায় ভর করিয়া; কিন্তু সামর্থ্যের সেদিকে চাহিবার অবসর নাই, সে আপনার গরিমায় আপনি ভরপুর।

দেখিলাম—দীনা অনাথিনী-জননী বড় আশায় বুক বাঁধিয়া সামর্থ্যের তোরণদ্বারে দাঁড়াইল, শুধু তাহার প্রাণপ্রতিমাটীর জীবনরক্ষার মানসে। হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল:—"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে, হের ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়ে কাঙ্গালিনী মেয়ে"। কিন্তু হায়! তাহার কাতরতা শুনিবে কে, তাহার অবস্থা দেখিবেই বা কে? সে একটু মুখের সান্ত্বনাও পাইল না, তাহার ভূম্যবলুণ্ঠিত দেহের সকল শক্তি নিয়োজিত ক্ষীণ প্রার্থনার স্বর কেহ শুনিলনা—

বাতাসের দোলায় ভাসিয়া গেল, শুধু লৌহময় তোরণদ্বারে প্রতিহত একটী প্রতিধ্বনি কানে ফিরিয়া আসিল—"কিছু খাবার দাও, এক টুক্‌রা কাপড় দাও"। শিশু আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল—মায়ের বক্ষে শেল বিধাইয়া। ক্রমে অবসন্ন হইয়া শিশু স্নেহময়ীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। পাগলিনী স্নেহের পুত্তলটীকে বক্ষে চাপিয়া ছল্ ছল্ নেত্রে দাঁড়াইল আসিয়া পূজা মন্দিরের অঙ্গনে। হৃদয়ের বেদনা উচ্ছ্বসিত ধারায় বহিয়া নীরব ভাষায় আনন্দময়ীর প্রতিমার উদ্দেশ্যে জানাইল:—"মাগো! এত বাঁশী এত হাসিরাশি, এত তোর রতন ভূষণ, তুই যদি আমার জননী মোর কেন মলিন বসন"।

তখন মার বোধন-উৎসব শেষ হইয়াছে। দেখিলাম পূজামন্দিরে করুণাময়ীর প্রতিমা সজ্জিত, সম্মুখে পূজার উপকরণ স্তূপীকৃত; কিন্তু যেন প্রাণহীন! তারপর শুনিলাম—সামর্থ্য-নিয়োজিত পূজারীর স্বার্থাকাঙ্ক্ষিত প্রাণ "ধনংদেহি, পুত্রংদেহি, যশোদেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে" রবে পূজা শেষ করিল। মন্দিরাঙ্গনে "অন্নং দেহি, বস্ত্রং দেহি" রব অন্নপূর্ণার কানে গেলনা। বুঝিলাম না ইহা পূজা কি পিপাসিতের পিপাসা শান্তির দারুণ চাঞ্চল্যের প্রেরণায় অসার প্রাণহীন আয়োজন! আজ দেশময় কেবল তৃষিতের ব্যাকুল চীৎকার "দেহি দেহি"। এই কি আমাদের সেই মা! মাগো! কোন অপরাধে আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা? অপরাধের সীমা নাই। এই যে দিগন্ত ভরিয়া যাতনা রুদ্ধ বেদনাগীতি, ইহা কি মার কোমল প্রাণে আঘাত করিয়াছে? কেন করিবে? কার কাছে জানাইলাম? মাটীর প্রতিমার কাছে না আদ্যাশক্তির চিন্ময়ী মূর্ত্তির কাছে? সত্য যদি হৃদয়ের সকল কালিমা ছাপাইয়া উঠিয়া উত্তর দেয় তবে বলিতে হইবে—'মাটির প্রতিমার কাছে, স্বার্থাসূয়ার বিকট মূর্ত্তির কাছে, বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষার কাছে' আজ পূজার আয়োজন!! আমার অতীত পুরুষের কীর্ত্তি নামে মাত্র বজায় রাখা, পুরোহিতের প্রাপ্য হইতে তাহাকে নিতান্ত বঞ্চিত না করা, সর্ব্বোপরি আপনার গৌরব প্রচার করা। তারপর আবার আপনার প্রাণহীন দৈন্যের রঙে

ঢাকিবার জন্য অদৃষ্টের দোহাই স্বরূপ মায়ের ত্রুটী ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হই না। আজ পূজা বাড়ীতে অন্নপূর্ণার আগমনে দীন আতুরের সেবা-মুখরিত আনন্দকোলাহল কোন্ নিরাশার নিবিড় আঁধারে মিলাইয়া গিয়াছে। আছে শুধু তার উজ্জলস্মৃতিটুকু—যাহা এখনও প্রাণের ভিতর অব্যক্ত আকুলতার তরঙ্গ ছুটাইয়া দেয়। তাই বলি মা! আমার অপরাধ অপরিমেয়, জানিনা বিধাতার কাছে ইহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান কি আছে। হায়! কে এই আশ্বাসবাণী শুনাইবে যে আমার সেই স্বপ্ন-জীবন আবার বাস্তব জীবনে পরিণত হইয়া সেই প্রাণ সেই হৃদয় ফিরাইয়া আনিবে? আর অপরাধের বাকী কি? বাস্তব জীবন আজ স্বপ্নের মত অচিন্তনীয় অসম্ভাব্য! দেবতার সিংহাসন তাই আজ অসুরের পদভরে নিপীড়িত, বিপর্য্যস্ত, কলঙ্কিত, চিরতরে বিনষ্ট প্রায়!

এইরূপে মার পূজা শেষ হইল। দেখিলাম—দেশের বিশাল বক্ষ ভরিয়া একটা বিরাট শোকাভিনয়ের করুণ দৃশ্য। প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু করিলাম কি? করিব আর কি? করিবার শক্তিই বা কোথায়? আমাদের সকল শক্তি আজ নিষ্পেষণে তরল-বহ্নি অশ্রুতে পরিণত হইয়াছে, তাহাই জীবনের একমাত্র সম্বল। তাই সেই সম্বলই মার চরণে উপহার দিয়া বিসর্জ্জন-উৎসব শেষ করিলাম। কাঁদিলাম সত্য, কিন্তু কাহার জন্য? নিজেরই জন্য, স্বার্থের জন্য। আজ আমার সমস্ত জীবনই স্বার্থে পরিপূর্ণ, দুঃসহ ভারে অবনত। এখন এই 'স্বার্থ' এই 'আমিত্ব' হৃদয়ের সকল স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, আমার কর্ম্মাকর্ম্ম, পূজা-প্রার্থনা সবই এক অভিনব বর্ণে চিত্রিত করিয়া জীবন-গতি এক লক্ষ্যহীন অভিনব পথে মরুর বক্ষে পিপাসিত পথহারা পথিকের ন্যায় সীমাহীন দারুণ প্রান্তরে ছুটাইয়া দিয়াছে। এ গতি রোধিবে কে? আজ আমি 'স্বার্থ' ছাড়া আর সব বিসর্জ্জন দিতে পারি।

তাই বলি মাগো! যে হৃদয় স্বার্থাসুরের অত্যাচারে সর্ব্বদাই কলঙ্কিত সেথানে তোর বোধন-উৎসব কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইল মা? এখনও তোর পূজার সময় হয় নাই, তোর পূজার আয়োজনই করিতে পারি

নাই। পূজার সময় হইবে তখন—যখন আমার এই উন্মত্ত 'আমি' বিশ্বের 'তুমির' মধ্যে চিরদিনের মত হারাইয়া যাইবে। "বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর, আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর"? আমার বিধাতা আমাতে কি এখন জাগিয়াছেন? 'সেদিন' আমার কবে বা হবে? ও রূপ হৃদয় মাঝে ভাতিবে, সেদিন কবে হবে? নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ভাসিব রূপসাগরে। শান্তং শিবমদ্বিতীয়ম্ রাজ রাজ চরণে, কবে বিকাইব?' কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? হৃদয় দেবতার দ্বার রুদ্ধ আমার প্রাণযন্ত্র বিকল, স্নায়ুমণ্ডলী অনুভূতি বিহীন। তাই সব নীরব নিস্তব্ধ কোন উত্তর নাই। মা করুণাময়ী! আবার বলিতেছি তোর পূজার আয়োজন এখনও হয়নি। তোর পূজা করিতে কে আমায় শিখাইবে মা! আমি যে কর্ণধার বিহীন! বিশ্ব জননী! আমার লক্ষ্যহীন শূন্যের মাঝে স্নেহময়ী বরাভয় দাত্রী মাতৃ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া, দৈত্যকুলের ভীতি উৎপাদন করিয়া একবার "মাভৈঃ মাভৈঃ" বাণী শুনা মা! আমার সকল ভয় দূরে পলাইয়া যাক্, —সকল বন্ধন টুটিয়া যাক্, অসার সুখের হাট চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া যাক্। তবে আমার এই কলঙ্কিত প্রাণ পবিত্র হইবে, নিষ্ঠুর নির্ম্মমতায় দূরে সরাইয়া তেজোগরিমার কমনীয় মূর্ত্তি প্রকাশিত হইবে, আমি তোর চরণে আত্মবলি দিয়া তোর নিখিল বিশ্বে আপনাকে হারাইয়া দিয়া পূজার যোগ্য হইব। মাগো! আমার সকল শোক, সকল দুঃখ, সকল লাঞ্ছনা, সকল কালিমা আজ তোর বরে আমার প্রাণ জাগাইয়া দিক্—তবে শোক-বিষাদ অশ্রুই আমার জীবনের সাথী হইলেও ধন্য হইব, আত্মবলি দিয়া আপন হারা হইতে শিখিব, দেশময় তোর পূজার মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইবে! "যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার—আঘাত সে যে পরশ তব সেই ত পুরস্কার।" আমি অশ্রু বন্যাকে ভয় করি না মা! ইহাই আমার জীবনের কাম্য—সেও ত তোরই দেওয়া!

এস ভাই! মার কোটি সন্তান আজ এক সঙ্গে মিলিয়া, প্রাণে প্রাণ, হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া মাতৃ বোধন উৎসবের আয়োজন করি,

মার নিখিল বিশ্বে আপনাকে হারাইয়া ফেলি। তবেই জীবনে সার্থকতা আসিবে, জন্মে সফলতা আসিবে। নতুবা এই আসা যাওয়া পথের পরিশ্রম ও লাঞ্ছনাই একমাত্র সার হইবে। এস আজ আব্রহ্ম—হিমানী-মাতৃভূমির দিগন্ত-প্রসারিত বক্ষ কম্পিত করিয়া প্রাণ খুলিয়া গাহি :—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কথাপ্রসঙ্গে।

(১)

যে নিপুন ভাবে ছোট কায করতে পারে, বড় কাযেও সে সম্পূর্ণতা দেখাতে পারে। অবস্থাচক্রে পড়ে অতিবড় মূর্খ সেও হঠাৎ একটা বড় কায করে ফেলতে পারে—কিন্তু তাই বলে তাকে মহৎ বলা যায় না। প্রকৃত মহত্ব সেখানেই যে দৈনন্দিনের অতি ক্ষুদ্র কায থেকে আরম্ভ করে বৃহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত মনপ্রাণ দিয়ে করতে পারে—তা তাতে তার সিদ্ধি আসুক আর না আসুক।

* * *

বড় বড় কর্ম্মীদের জীবনের মন্ত্র হচ্চে "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি"! কর্ম্ম-ফলের দিকে তাঁরা দৃষ্টি আদৌ করেন না—ফলটাকে সিদ্ধি বলে গ্রহণ না করে কর্ম্মের নিপুণতা এবং আন্তরিকতাটাই তাঁরা সিদ্ধি বলে গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রে যাঁরা সিদ্ধ হাতাশা বা নিরানন্দ বলে কোনও জিনিষ তাঁদের কাছে আসতে পারে না—কারণ কর্ম্মফলে তাঁহারা আসক্তি-বর্জ্জিত—তাঁদের লক্ষ্য নিপুণতা এবং আন্তরিকতার উপর—যা তাঁদের কাছে সিদ্ধির সমতুল।

* * *

আমরা স্বরাজ গড়বার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি কিন্তু অতবড় কাযটা করবার আগে আমাদের প্রতিকর্ম্মে নিপুণতা এবং আন্তরিকতা এবং উহাতেই সিদ্ধিজ্ঞান করতে শিখতে হবে—ছোট ছোট কর্ম্ম করে। ঐ দুটি চরিত্র আমাদের ফুটিয়ে তুলতে হবে প্রথমে পারিবারিক জীবনে, পরে সামাজিক জীবনে তারপর জাতীয় জীবনে। পারিবারিক জীবনে খাওয়া পরা প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ছাড়াও উৎসবাদি অপেক্ষাকৃত বড় কায আছে। সেগুলি যেমন আন্তরিকতা এবং নিপুণতার সহিত করতে হবে তেমনি আবার পরিবারের সকল অঙ্গের সমবেত চেষ্টায় হওয়া চাই।

* * *

ব্যক্তিগত চরিত্রে নিজ দেহ মনের কল্যাণ হয় কিন্তু সমবেত চেষ্টায় যে চরিত্র গঠিত হয় তার দ্বারা নিজ দেহ মন এবং দশের কল্যাণ হয়। পারিবারিক জীবনে পূজাপার্ব্বনাদি বড় কর্ম্ম সকল যদি অতি শিশু হইতে গৃহস্বামী পর্য্যন্ত সকল অঙ্গের সমবেত চেষ্টায় সাধিত হয় তা হলে তার দ্বারা যে চরিত্র গঠিত হয় তা সামাজিক সম্পূর্ণতা আনয়নের এক মহৎ সহায় হবে। বল্‌তে পারেন 'পারিবারিক উৎসবাদি ব্যাপার ত সকলের চেষ্টার সমবায়েই হয়ে থাকে'। হয়ে থাকে বটে কিন্তু উহা অনুপানযুক্ত হয় না বলেই উহার দ্বারা যথার্থ কল্যাণ লাভ হয় না, যেটুকু হয় সেটুকু কেবল ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার সৃষ্টি করে মাত্র কিম্বা কর্ম্মের বিফলতায় হতাশা এসে সকলের হৃদয় অধিকার করে।

* * *

সেই অনুপান হচ্চে—(১) 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি' এই জ্ঞান—অর্থাৎ কর্ম্মের নিপুণতা এবং আন্তরিকতাটাকেই সিদ্ধি জ্ঞান করা—ফলের আসক্তি ত্যাগ করতে হবে; কারণ কর্ম্মে আমাদের অধিকার আছে—ফলাফলে ভগবানের হাত। কিন্তু এ রকম শুষ্ক ভাবে আমরা কার্য্য করতে পারি না যদি ভগবানে আমাদের প্রেম না থাকে। সেই জন্য কর্ম্মের আর এক অনুপান হচ্চে—(২) প্রেমময় হরি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, এই সত্যে সংস্কারবান হয়ে সকল কর্ম্মের দ্বারা তাঁর সেবা।

যদি যথার্থই আমরা ভগবানকে ভালবাসি এবং জানি যে তিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান তাহলে প্রিয়তমের সেবার জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টায় নিপুণতা এবং আন্তরিকতা আপনিই আসবে, ফলাফলের দিক থেকে নজর আপনিই সরে যাবে। উদাহরণ,—যেমন মা ছেলের সেবা করেন প্রত্যুপকার পাবার জন্য নয়—পুত্র সম্বন্ধে ভাল-বাসাই তাঁর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, ছেলে তাঁর অনিষ্ট কল্লেও তিনি তার অনিষ্ট করতে পারেন না—তিনি তাঁর মঙ্গল কামনা করতে বাধ্য। প্রেম জিনিষটি জোর করে দেহ মন প্রাণ দিয়ে তাঁকে তার সেবা করাবে।

* * *

কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে জীব-বুদ্ধিতে যে ভালবাসা, পণ্ডিতেরা তাকে মায়া বলেছেন। কারণ ব্যক্তি বিশেষে ভালবাসা থেকে অপরের প্রতি দ্বেষ উপস্থিত হয়। আর ব্যক্তি বিশেষে ঈশ্বর বুদ্ধিতে যে ভালবাসা তাকে পণ্ডিতেরা পূজা বলেছেন। কারণ এস্থলে সেবকের নিকট সকলেই তার প্রিয়তমের প্রতীক রূপে বর্ত্তমান সেই জন্যে দ্বেষ, হিংসা তার হৃদয় আশ্রয় করতে পারে না।

* * *

পারিবারিক জীবনে এই দুই চরিত্র ফুটিয়ে তুলে যদি আমরা সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত হই তবেই আমরা আদর্শ-সমাজ গড়ে তুলতে সমর্থ হব। তা না হলে কতকগুলো দ্বেষ হিংসা নিয়ে সমাজ গড়্‌তে গেলে কেবল দলাদলি ও অশান্তির সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই হবে না।

* * *

ঐ যে আগে প্রেম জিনিষটির কথা আমরা বলেছি, ঐটি এলেই সমাজ এবং পরে জাতি গড়বার সকল চারিত্র্য-উপাদান লাভ করা যেতে পারে। সে চরিত্রগুলি এই,—(১) উদারতা (২) ত্যাগ (৩) তপস্যা (৪) সততা (৫) শ্রদ্ধা ও (৬) মৌলিকতা।

* * *

(১) যিনি প্রেমিক, প্রেমময় হরিকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন, তিনি

উচ্চ-নীচ, পুণ্যবান—পাপী, রাজা-প্রজাকে সমভাবে প্রীতির চক্ষে অবলোকন করেন। তাঁরা সমাজের কোন অংশকে বাদ দিতে চান না—সংশোধন করিতে চান। কারণ ফেলিবার ত কিছুই নাই—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিলভুবন যে তাঁরই আলোকে আলোকিত; কেবল আধারের তারতম্যে প্রকাশের তারতম্য। তাই উদার ব্যক্তি সকল জীবের অন্তরবর্ত্তী পূর্ণতাকে প্রকাশ করবার সদাই সহায়ক।

*   *   *

(২) প্রেমের ভাব 'সাহায্য' নয়—'সেবা'। তিনি যে কার্য্যই করুন সকলই শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত করেন। 'কাঁচা-আমি' বা কর্ত্তা-আমি তাঁর চলে গিয়ে 'পাকা-আমি' বা দাস আমি বা সন্তান আমি তাঁর থেকে যায়। তখন তিনি পরার্থে, নিজ প্রিয়তমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। ব্যক্তিগত প্রেমেতেই জীব মরণকে বরণ করে, মৃত্যুর অচ্ছেদ্য নিয়ম ছিন্ন করে, সংসারে দেখা যায়। তখন ভগবৎ প্রেমিকের তীব্রতা ও আন্তরিকতা কতদূর হওয়া সম্ভব তা আমরা কল্পনা করিতে অপারগ। তাঁরা সমাধির জন্যও যেমন ত্বগস্থিমাংস্ শুষ্ক করিতে প্রস্তুত, তেমনি আবার ছাগ শিশুর জন্যও নিজেকে বলি দিতে সর্ব্বদা উৎসুক। প্রেমের দ্বিতীয় প্রকাশ এই ত্যাগ।

*   *   *

(৩) স্ত্রী স্বামীর জন্য, মাতা পুত্রের জন্য অনাহার, অনিদ্রা, মানসিক যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করেন, এ আমরা সংসারে দেখতে পাই। কিন্তু সে ভালবাসা গণ্ডি বদ্ধ বলে পণ্ডিতেরা তাকে মোহ বলে থাকেন, কিন্তু যখনই ঐ জিনিষটি ভগবানের নিমিত্ত আত্মপর সমভাবে হয় তখনই শাস্ত্র তাকে তপস্যা বলেছেন। ব্যক্তি বিশেষের জন্য যে দেহিক ও মানসিক কষ্ট এবং পরার্থে যে তপস্যা—এই দুটিতে প্রভেদ এই, —দ্বিতীয়টীতে (ক) রিপুর তাড়না থাকেনা—(খ) অভিশাপের পরিবর্ত্তে সদা আশীর্ব্বাণী স্ফূরিত হয় এবং (গ) তপস্যার নিষ্ফলতাও নিরানন্দ আনে না। কিন্তু প্রথমটিতে এই সকলের বিপরীত দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর

প্রেমিক ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে, প্রহারে রক্তাক্ত হয়ে, বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে, কলঙ্কের কালিমায় আবরিত হয়েও আশীর্ব্বাদ করতে ছাড়েন না।

* * *

(৪) সততা মানে 'মন মুখ এক করে' কায করা। অপর কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে সৎ-কর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়া—তা সে সৎ-কর্ম্ম হলেও—তাকে 'ভাবের ঘরে চুরি' বলে। প্রেম এবং ত্যাগ না থাকলে সততা আসতে পারে না। আমাদের দেশে অভাব-অনটনের জন্য সততা এবং ত্যাগ একরকম হারিয়ে গিয়েছিল বল্লেই চলে। সেই জন্য আমরা 'যেন-তেন প্রকারেণ', নিজের স্বার্থ এবং ভোগের জন্য একরাত্রে বড় লোক হতে গিয়ে ব্যক্তিগত বা সমবায় সকল মহদনুষ্ঠান পণ্ড করে বসি।

* * *

(৫) সে যাকে ভালবাসে তারপ্রতি তার শ্রদ্ধা স্বতঃই প্রসূত হয়। শ্রদ্ধা অর্থে জলন্ত-বিশ্বাস। মানুষকে মানুষ বলে বিশ্বাস করতে হবে—ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রতীক রূপে গ্রহণ করতে হবে। অপমান এবং অপবাদ যদি হাজার ফণা তুলে আমাদের দংশন করে তা সত্ত্বেও অসতের মধ্যেও শ্রীভগবানের কল্পনার দ্বারা তার অন্তরবর্ত্তী দেবত্বকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। বিশ্বাস যদি পাষাণে ঐশী চেতনা আনে, তবে সৃষ্টির আদর্শ মানুষে সে চৈতন্যের আবির্ভাব সে আর করাতে পারবে না। যে শ্রদ্ধা-হীন সে পরশ্রীকাতর। পরশ্রীকাতর বলেই আমরা যে কোন অবৈতনিক মহদনুষ্ঠান বা নির্ম্মল সমবায় আনন্দ উপভোগ করতে যাই অমনি হিংসা, দ্বেষ, অভিমান এসে আমাদের হৃদয় জর্জ্জরিত করে ফেলে।

* * *

(৬) উদারতা থেকে আর একটা গুণ মানুষের চরিত্রে ফুটে ওঠে। সেটি হচ্চে মৌলিকত্ব-প্রিয়তা। উদার প্রকৃতি যিনি, তিনি কখনও পুরাতনে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। সর্ব্বদা নব নব ভাবে ও আকারে নিজ পরিবার ভূষিত করেন, সমাজের সেবা করেন এবং জাতীয় শক্তির পুষ্টি সাধন করেন। গোঁড়ামী পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবন

জীর্ণ করে ফেলে—তাই নব ভাবোচ্ছ্বাসের সংঘর্ষে চূর্ণ হয়ে হাওয়ায় মিশে যায়। আমাদের দেশের এই মৌলিকত্বহীন গোঁড়ারা, প্রাচীন নয় বলে দেবালয়ে বিদ্যুতের আলোক দিতে নারাজ, বিদেশের ফল মূল পর্য্যন্ত ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিবেদন করতে প্রস্তুত নয়—এমন কি আধুনিক বাদ্য যন্ত্রে ভগবৎকীর্ত্তন পর্য্যন্ত সম্ভব নয় বলে থাকে। এই বাতুলেরা যে সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বিরোধী হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি !

* * *

একণে এই সকল দৈবী সম্পদ আমাদের লাভ করতে হবে ছোট ছোট দৈনন্দিন ব্যক্তিগত কর্ম্মের মধ্য দিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনে—বিবাহ, উৎসব, ব্যবসায়াদি সমবায় কর্ম্মে, সামাজিক জীবনে—বিদ্যালয়, সেবাশ্রম, সাধারণ ধর্ম্মমন্দির, গ্রাম্য স্বাস্থ্যবিভাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা। এসকল কর্ম্মে মানুষের যথাযথ প্রকৃতি বের হয়ে পড়ে এবং সংশোধন করবার স্থলও ঐ সকল কর্ম্ম। যাঁরা এই সকল ক্ষুদ্র কর্ম্মে কথিত চরিত্র লাভ করেছেন, তাঁরা দেশ শাসন ত তুচ্ছ কথা জগৎ শাসনও করতে পারেন।

—

ভারতীয় সমস্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ।

(বিদ্যার্থী মনোরঞ্জন)

(১)

"National union in India must be a gathering up of the scattered Spiritual forces in India. A nation in India must be the union of those whose hearts beat with the same Spiritual tone."

Swami Vivekananda

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষা, দীক্ষা ও আদর্শের নির্ম্মম সংঘাতে ভারতের জাতীয় জীবনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। তৎকালীন তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণী অম্লানবদনে স্বদেশীয় আদর্শকে বর্জ্জন করিয়া বৈদেশিক ধর্ম্ম ও সমাজনীতির আপাত মনোরম চাকচিক্যে ঝলসিত ও লুপ্তবুদ্ধি হইয়া প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু জাতীর অন্তর্নিহিত শক্তি তখন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই—পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বাংলা দেশে এক বিরাট প্রতিক্রিয়া শক্তি অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কার আন্দোলনের প্রথম যুগে—প্রথমতঃ ভারতবর্ষ যে অলক্ষ্যিতভাবে ধর্ম্ম সংস্কারেই মনোনিবেশ করিয়াছিল—তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। খ্রীষ্টধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য জড় সাধনার প্রতিযোগীতা করিতে গিয়া ভারতবর্ষ রাজনৈতিক বা সমাজিক সংস্কার চাহিল না—ধর্ম্মেরই সংস্কার চাহিল। ধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে নূতন যুগের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন তাহা যে কেবলমাত্র খ্রীষ্টধর্ম্মের অবাধ আকর্ষণ হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিল তাহা নহে—দেশের সামাজিক গোঁড়ামি প্রভৃত সংকীর্ণ বুদ্ধিকে চিন্তার স্বাধীনতার দ্বারা ব্যাপকতার দিকে টানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু, বেদান্ত গ্রহণ, মহান্

স্বদেশপ্রেম ও হিন্দু-মুসলমানে সম-প্রীতি থাকা সত্ত্বেও রাজার ভাব ও প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ভাব-গন্ধ-সংশ্রব-রহিত ছিল না। বিবিধ ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা যে মত সমূহ তাঁহার অসামান্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সমীচীন বোধ হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগের সারাংশ একত্র সুসংবদ্ধ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় অপেক্ষা সমীকরণ নিমিত্তই অধিকতম প্রয়াস করিয়াছিলেন। গুরু নানক, রামদাস স্বামী, চৈতন্য দেব প্রভৃতি মহাপুরুষের ধর্ম্ম সংস্কার যে ভাবে দেশের জন সাধারণের মন আকৃষ্ট ও আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল,—রাজার মতবাদ সমূহ সেই ভাবে অল্প সংখ্যক শিক্ষিত শ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডির বাহিরে জন সাধারণের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া দেশের মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন তাঁহার নিকট স্বদেশের মুক্তির সত্য উপায় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল—তাই তিনি সরল ও শুদ্ধ মনে তদুদ্দেশ্য সাধনে মহান প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রণালীর বিজয় লাভ ও অবাধ প্রচলন, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মতানুসারে ভারতের সনাতন সাধনাকে পঙ্গু করিয়া সুফল অপেক্ষা অধিকতর কুফলই প্রসব করিয়াছে,; কারণ—তৎকালে আমরা স্বাধীনভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া আমাদের অন্তরতম প্রদেশের সহিত থাপ খাওয়াইয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, ফলে উহা আমাদিগকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"রাজা রামমোহন ইংরাজী ভাষার প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যালয় সমূহে উহার প্রচলন করায় বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন—অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের জন্য উহাতে দেশটাকে পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐরূপ না করিয়া যদি তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রচলন রাখিতেন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানাদি বিদ্যাও গ্রহণযোগ্য চিন্তাসমূহ ঐ ভাষায় অনুদিত করিয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশ পূর্ব্বক বিদ্যালয় সমূহে পঠন পাঠন করাইতেন—তাহা হইলে অতিশীঘ্রই দেশময় ঐ সকলের প্রচার সাধিত হইয়া সমস্ত জাতিটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইত।"

কাল মাহাত্ম্যে ধর্ম্ম-সংস্কার সমাজ-সংস্কারের দিকে চলিয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু বহু বর্ষব্যাপী উভয়পক্ষীয় তীব্র আলোচনা ও বাদানুবাদ যখন কোনও চিরস্থায়ী সুফল প্রসব করিতে পারিল না, সংস্কারের প্রেরণা ও আদর্শ কেবল জনকয়েক নব্য শিক্ষিতগণের বুদ্ধির যুদ্ধেই পর্য্যবসিত হইয়া জাতীয় শরীরকে অন্তর্বিবাদের বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল—তখন নব্য শিক্ষিতগণ সংস্কার আন্দোলনে ক্লান্ত ও বীতস্পৃহ হইয়া আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত সরল, উদার ও মহান্ চরিত্রের নেতাগণ পাশ্চাত্য আদর্শ ও প্রণালীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমগ্র ভারতকে এক সুদৃঢ় রাজনৈতিক জাতিরূপে সংগঠন করিয়া তুলিবার সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। নেতাগণের সরল ও বিশুদ্ধ স্বদেশ প্রেম, মহান চরিত্র ও আত্মত্যাগ থাকিলেও এ কথা সত্য যে ভারতীয় জাতীয়তার মূল ভিত্তি, ভারতীয় সাধনার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও ভারতবর্ষের সুমহান্ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা ও অনুভূতি ছিল না;—সুতরাং তাঁহারা দেশের মুক্তির সত্য ও সংগঠন মূলক প্রণালী জাতীয় মনে সঞ্জীবিত করিয়া দিতে সমর্থ হন নাই—পাশ্চাত্য আদর্শ ও ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রণালীতে আপনারা আন্দোলিত হইয়া সমগ্র দেশকেও আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুন্দর ও চিরস্থায়ী প্রাসাদ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে সুপ্রতিষ্ঠ ভিত্তির সন্ধান লাভই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। কিন্তু সমাজ-সংস্কার ও রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তির সন্ধান হারাইয়া ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অনুকরণ ও ব্রিটীশ পার্লিয়ামেণ্টের ক্রম-পরিণতি লাভের ঐতিহাসিক ধারণায় পরিচালিত হইয়া ভারতবর্ষকেও একটি ইউরোপীয় জাতিরূপে সুগঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। জাতীয় জীবনের মূল উৎসের সন্ধান লাভ করিয়া সুসংহতভাবে সমগ্র ভারতের চিন্তা ও কর্ম্মজীবনে নূতন সৃজনী-শক্তির উদ্বোধন দ্বারা সনাতন জাতীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ—আমাদের ভাব ও ধারণার সুদূরপরাহত হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ইহা সুপ্রমাণিত হয় যে আমরা মৃত বা জড়ের ন্যায় অসাড় ও নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারি নাই, —বৈদেশিক অনুকরণ হইলেও শতাব্দীব্যাপী সামাজিক ও রাজনৈতিক

প্রতিক্রিয়া শক্তির চালনা দ্বারা সকলকে জাতীয়-জীবন-স্পন্দন অনুভব করাইয়া দিয়াছিলাম।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে দিন স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সাধনার বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়া স্বদেশে শুভ-প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—সে ভারতের জাতীয় জীবন ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় গৌরবময় দিন। দেশের সম্মুখে কোনও সুস্পষ্ট মহান আদর্শ ও তদনুযায়ী চিন্তা ও কর্ম্ম-জীবন সুপরিণত করিয়া তুলিবার ভাব ও প্রেরণা একেবারেই বর্ত্তমান ছিল না। দেশ তখন পাশ্চাত্য ভাবে মাতোয়ারা ;—বিদেশীয়-ভাব-ভাবিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন লাভ ভিন্ন অন্য আদর্শ ছিল না। অন্তরের প্রতিষ্ঠার বিধৃত শক্তি হইতে শান্ত ও সুঠাম ভাবে জাতীয় কর্ম্মজীবন সংগঠিত করিতে না পারিলে, জাতির কর্ম্ম-গতি-ভঙ্গীর প্রত্যেক প্রয়াস ছিন্ন মেঘের ন্যায় কোন্ সুদূরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে তাহা পাশ্চাত্য কর্ম্মাবেশ চঞ্চল ভারত-জীবনে তখন পর্য্যন্ত প্রতিভাসিত হইয়া উঠে নাই। স্বামীজী স্বীয় অতি-মানবীয় অনুভূতি দ্বারা এই পাশ্চাত্য অনুকরণ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে জাতীয় আত্মহত্যার অবিসংবাদিত কারণ রূপে জানিতে পারিয়া এই বৈদেশিক অনুকরণ জাত সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ সমূহের মূলদেশে প্রথমেই সজোরে কুঠারাঘাত করিয়া সমস্ত জাতিকে সাবধান করিয়া দিলেন।

"And, therefore, if you succeed in the attempt to throw off *your religion or take up either politics or society or any other* thing as your centre, as the vitality of your national life, the result will be that you will become extinct.

কিন্তু কেবল নঞবোধক (Negative) প্রতিবাদ ও আঘাত দেশের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। দেশ তখন নির্নিমেশ লোচনে একটা সুস্পষ্ট ও সবল প্রত্যাদেশের অপেক্ষা করিতেছিল কারণ শতাব্দীব্যাপী বৈদেশিক ভাবের আন্দোলন ত তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিয়া স্বধর্ম্ম-বুদ্ধি জাগরিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তদ্ভিন্ন স্বামিজীও আপন চিন্তাসমূহ ভারতবর্ষে ও সমগ্র জগতে বিতরিত করিয়া দিবার এক উৎকট দায়

ও অদম্য প্রেরণা সর্ব্বদাই স্বকীয় অধ্যাত্ম-পূত হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিতে ছিলেন। ভারতবর্ষকে তিনি কতদূর ভাল বাসিতেন, তাহা আমাদের হৃদয়সীমার অনুমান বহির্ভূত। তাঁহার মহান জীবনে এমন তিন্ চারিটি ঘটনা আছে, যেখানে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি অসামান্য মেধা ও ধীশক্তি, এবং অকৃত্রিম উদারতা ভেদ করিয়া "বিবেকানন্দ—মানুষটি" (Vivekananda as a man) আমাদের নিকট অনাচ্ছাদিত ভাবে বিকশিত হইয়া উঠে ও ধরা দেয়। ইউরোপীয় ভাব ও চিন্তার আবর্জ্জনার পশ্চাতে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মে গরিমাময় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভারতবর্ষের সন্ধান লাভ করায় তিনি স্বদেশ প্রেমকে আধ্যাত্মিক ভাবে পূত ও রূপান্তরিত (Transformed) করিয়া এক অভিনব ভাবে ও ছন্দে দেশবাসীর নিকট প্রকটিত করিয়া তুলিয়া দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান্ জীবন, স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি, অতি-মানবীয় মেধা, প্রাচীন বর্ত্তমান ভারতের সুচারু অধ্যয়ন ও পৃথিবীর অপরাপর দেশের সহিত উহার তুলনামূলক আলোচনা, শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন প্রভৃতি দ্বারা তিনি ভবিষ্যৎ-ভারতের সুসংহত, বর্ণাভূত মহিমাময় ছবি আপনার মানসপটে অনুভব করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের সম্মিলিত ভারতের (United India) উজ্জ্বল ছবি তিনিই সর্ব্বপ্রথম দেশের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া তুলেন। বিবিধ আচার এবং নানা ধর্ম্ম ও রীতি বৈচিত্র্যের সুসম্মিলিত ও সুসংযোজিত মহিমাময় পট তৎপূর্ব্বে নীতির কোন মনীষীরই মনে প্রতিভাসিত হয় নাই। স্বামীজীই সর্ব্বপ্রথম যুগ-যুগান্তরের আশা-নিরাশা-ঘাত-প্রতিঘাত সংগঠিত অধ্যাত্মপূত ভবিষ্যৎ ভারতের মনোরথ-দৃশ্য দেশের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেশবাসীর নিকট এক সরল ও সুস্পষ্ট (Positive) আদর্শ ধরিয়া দিয়া বলিলেন—

"For the next fifty years this alone shall be our key-note —this our great motherland India. Let all other vain Gods disappear for that from our minds. This is the only God that is awake, our own race, everywhere His feet, everywhere His ears, He covers every things."

বাউল-সঙ্গীত।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু)

আজ্‌গুবী কল বানিয়েছে এক আজব্‌ কারিকর।
এ কল চলে বলে, হাসে খেলে, কারিকুরি খুব জবর!
ছিষ্টিছাড়া কলের আড়া সাড়ে তিনটী হাত,
চিম্‌নী খাড়া দম্‌কলে কল চলেছে দিনরাত,
মন-জোলাতে বুন্‌ছে তাতে ওড়ন-পাড়ন তাঁত,
তিন-রঙা তিন স্থতোয় মিলে অন্তর্শীলে বয় লহর।
এ কলে পলে পলে উঠ্‌ছে কত সাধ!
আকাশের চাঁদ ধরতে পাতে বাসনাতে ফাঁদ!
করে আশার ক্ষেতে মন্‌মত আবাদ!
কাল-নদীর কূলে ফলে ফুলে সাজায় চোরা-বালির চর।
এ কলের দু'টা চাকা, আঁকা-বাঁকা আছে কত নল,
মাঝখানে পথ, আশ্‌মানে রথ করে চলাচল,
কল থেকে কল পয়দা করে নকল অবিকল—
তার মাল্‌-মশালা যোগান্‌ দিতে পাঁচটা ভূতে হয় ফাঁপর।
কি কৌশলে এ কল চলে ঠাউরে ওঠা ভার,
ইঞ্জিনীয়ার কোন্‌ জনা কেউ পায় না দিশে তার,
সে কখন্‌ সাকার কখন্‌ নিরাকার—
আছে কলের ভিতর চোর-কুঠুরী সেইখানে তার আরাম-ঘর।
নাইক তার চক্ষু-কর্ণ, জাতি-বর্ণ, নামটী আত্মারাম,
কে জানে সে রাম রহিম কি শ্যাম,
সে আত্মানন্দে আপনি বিভোর—নিত্যানন্দ ধাম,
তার আনন্দের ছিট্‌ লাগ্‌লে গায়ে উথ্‌লে ওঠে প্রেম-সাগর।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(৫)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।
১১ই জুলাই, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ৫৪১নং, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো ছাড়া আর কোন ঠিকানায় আমায় পত্র লিখো না। তোমার শেষ চিঠিখানা সারা দেশ ঘুরে আমার কাছে পৌঁছেছে—আর পত্রটা যে শেষে পৌঁছিল, মারা গেল না, তার কারণ এখানে আমার কথা সকলে বেশ ভালরকম জানে। সভার খান কতক প্রস্তাব ডাঃ ব্যারোজকে পাঠাবে—তার সঙ্গে একখানা পত্র লিখে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দেবে এবং উহা আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ কর্‌বার জন্য অনুরোধ কর্‌বে —মিশনরিরা আমার নামে এই যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে যে, আমি কারও প্রতিনিধি নই—ঐতেই তার উত্তম প্রতিবাদ হবে। বৎস, কায কত্তে কি করে হয় শেখো। এই ভাবে দস্তরমত প্রণালীতে কায কর্‌তে পার্‌লে আমরা খুব বড় বড় কায কর্‌তে নিশ্চিত সমর্থ হব। গত বর্ষে আমি কেবল বীজ বপন করেছি—এই বছর আমি ফসল কাট্‌তে চাই। ইতিমধ্যে ভারতে যতটা সম্ভব আন্দোলন চালাও। কিডি নিজের ভাবে চলুক—সে ঠিক পথে দাঁড়াবে। আমি তার ভার নিয়েছি—তার নিজের মতে সে চলুক—তাতে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবে। পত্রিকাখানা বার কর—আমি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠাবো। বোষ্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, এচ, রাইটকে একখানা প্রস্তাব পাঠাবে আর সঙ্গে সঙ্গে একখানা পত্র লিখে এই বলে তাঁকে ধন্যবাদ দেবে যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম, আমেরিকায় আমার বন্ধুরূপে দাঁড়িয়েছিলেন আর তাঁকেও ঐটী কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করবে—তা

হলে মিশনরিদের (আমি যে কারু প্রতিনিধি হয়ে আসিনি) একথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ডিট্রয়েটের বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২৭০০ টাকা পেয়েছিলাম। অন্যান্য বক্তৃতায় একটাতে এক ঘণ্টায় আমি ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০ টাকা রোজগার করি, কিন্তু পাই মাত্র ২০০ ডলার। একটা জুয়াচোর বক্তৃতা কোম্পানি আমাকে ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছি। এখানে খরচও হয়ে গেছে অনেক টাকা—হাতে আছে মাত্র ৩০০০ ডলার। আস্‌ছে বছরে আবার আমায় অনেক জিনিষ ছাপাতে হবে। আমি এইবার নিয়মিতভাবে কায কোর্‌বো মনে কচ্ছি। কল্‌কেতাতে লেখ, তারা আমার ও আমার কায সম্বন্ধে কাগজে যা কিছু বেরোয়, কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে যেন পাঠায়—তোমরাও মান্দ্রাজ থেকে পাঠাতে থাক। খুব আন্দোলন চালাও। কেবল ইচ্ছাশক্তিতেই সব হবে। কাগজ ছাপান ও অন্যান্য খরচের জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে টাকা পাঠাবার চেষ্টা কোর্‌বো। তোমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন কর্‌তে হবে—উহার নিয়মিত অধিবেশন হওয়া চাই আর আমাকে যত পার সব খবরাখবর লিখ্‌বে। আমিও যাতে নিয়মিতভাবে কায কত্তে পারি তার চেষ্টা কচ্ছি এই বছরে অর্থাৎ আগামী শীত ঋতুতে আমি অনেক টাকা পাব—সুতরাং আমাকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে। ইতিমধ্যে তোমরা এগিয়ে চল। তোমরা পল কেরসকে একখানা পত্র লিখো আর যদিও তিনি আমার বন্ধুই আছেন, তথাপি তোমরা তাঁকে আমাদের জন্য কায কর্‌বার অনুরোধ কর। মোট কথা যতদূর পার আন্দোলন চালাও—কেবল সত্যের অপলাপ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বৎসগণ, কাযে লাগো—তোমাদের ভিতর আগুন জ্বলে উঠ্‌বে। মিসেস জি, ডবলিউ হেল আমার পরম বন্ধু—আমি তাঁকে মা বলি এবং তাঁর কন্যাদের ভগিনী বলি। তাঁকেও একখানা প্রস্তাব পাঠিয়ে দিও—আর একখানা পত্র লিখে তোমাদের তরফ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ দিও। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কায কর্‌বার ভাবটা আমাদের ধাতে নেই। এই ভাবটা যাতে আসে, তার চেষ্টা কর্‌তে হবে। এইটী কর্‌বার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সর্ব্বদাই তোমার

ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে—সর্ব্বদাই যাতে মিলেমিশে শান্তভাবে কায হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। ইহাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কায কর্‌বার গুপ্ত রহস্য। সাহসের সহিত যুদ্ধ কর। জীবন ত ক্ষণস্থায়ী—একটা মহা কার্য্যের জন্য জীবনটা সমর্পণ কর।

তুমি নরসিমা সম্বন্ধে কিছু লেখ নাই কেন? সে একরকম অনশনে দিন কাটাচ্ছে। আমি তাকে কিছু দিয়েছিলাম, তারপর সে কোথায় চলে গেল কিছু জানি না—সে আমায় কিছু লেখে না। অ— ভাল ছেলে, আমি তাকে খুব ভালবাসি। থিওজফিষ্টদের সঙ্গে বিবাদ করবার আবশ্যক নাই। তাদের কাছে গিয়ে আমি যা কিছু লিখি সব বোলো না আহাম্মক! থিওজফিষ্টরা আগে এসে আমাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে—জান ত? জর্জ হচ্ছেন হিন্দু আর কর্ণেল অলকট বৌদ্ধ। জর্জ এখানকার একজন খুব উপযুক্ত ব্যক্তি। এখন হিন্দু থিওজফিষ্টগণকে বল, যেন জর্জকে সমর্থন করে। এমন কি যদি তোমরা তাঁকে সমধর্ম্মাবলম্বী বোলে সম্বোধন করে তিনি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র লিখতে পার, তাতে তাঁর বুকটা দশ হাত হয়ে উঠ্‌বে। আমরা কোন সম্প্রদায়ে যোগ দেব্‌ না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের প্রতি * সহানুভূতি প্রকাশ কোর্ব্বো ও সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কায কোর্ব্বো।

এটা স্মরণ রেখো যে, আমি এখন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি—সুতরাং ৫৪১নং ডিয়রবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো হচ্ছে আমার কেন্দ্র—সর্ব্বদাই ঐ ঠিকানাতেই পত্র দেবে আর ভারতে যা কিছু হচ্ছে সব খুঁটিনাটি আমাকে জানাবে আর কাগজে আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু বার হচ্ছে, তার এক একটা টুকরো পর্য্যন্ত পাঠাতে আমাদের ভুলো না। আমি জি, জির কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি—প্রভু এই বীর হৃদয় ও মহদাদর্শের বালকদের আশীর্ব্বাদ করুন। বালাজি, সেক্রেটারি এবং আমাদের সকল বন্ধুকে আমার ভালবাসা জানাবে।" কায কর, কায

* ইনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

কর—সকলকে তোমার ভালবাসা দ্বারা জয় কর। আমি মহীশূরের রাজাকে একখানা পত্র লিখিছি ও কয়েকখানা ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছি। তোমাদের কাছে যে ফটো পাঠিয়েছি, তা নিশ্চিত এতদিন পেয়েছ। একখানা রামনাদের রাজাকে উপহার দিও—তাঁর ভিতর যতটা ভাব ঢোকাতে পার চেষ্টা কর। খেতড়ির রাজার সঙ্গে সর্ব্বদা পত্র-ব্যবহার রাখবে আর বিস্তারের চেষ্টা কর। মনে রেখো, জীবনে একমাত্র চিহ্ন হচ্ছে গতি ও উন্নতি। আমি তোমার পত্র আস্‌বার বিলম্ব দেখে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম—এখন দেখ্‌ছি, তোমার আহাম্মকিতেই এত দেরি হয়েছে। বুঝ্‌তে পার্‌ছ ত, আমি ক্রমাগত ঘুর্‌ছি আর চিঠির-বেচারাকে আমাকে ক্রমাগত নানা স্থানে খুঁজে তবে বার কর্‌তে হয়। আরও তোমাদের এটী বিশেষ করে মনে রাখ্‌তে হবে যে, সব কার্য্য দস্তুর মত প্রণালীক্রমে কর্‌তে হবে। যে প্রস্তাবগুলি সভায় পাস্‌ হয়েছে, সেগুলি ধর্ম্ম-মহাসভার সভাপতি চিকাগোর ডাঃ জে, এচ, ব্যারোজকে পাঠাবে এবং তাঁকে অনুরোধ কর্‌বে যে, ঐ প্রস্তাব ও পত্র যেন তিনি খবরের কাগজে ছাপান।

ডাঃ ব্যারোজকে ও ডাঃ পল কেরসকে ঐগুলি ছাপাবার জন্য অনুরোধ পত্রও যেন ঐরূপ সভার প্রতিনিধি স্থানীয় কারও কাছ থেকে যায়। জাগতিক মহামেলায় (ডিট্রয়েট, মেচিগান) সভাপতি সেনেটার পামারকে পাঠাবে—তিনি আমার প্রতি বড়ই সহৃদয় ব্যবহার করে-ছিলেন। মিসেস জে, ব্যাগ্‌লিককে একখানা ডিট্রটে, ওয়াশিংটন এভিনিউ ঠিকানায় পাঠাবে আর তাঁকে অনুরোধ কর্‌বে যে, সেটা যেন কাগজে প্রকাশ করা হয় ইত্যাদি। খবরের কাগজ প্রভৃতিতে দেওয়া গৌণ—দস্তুরমত ভাবে পাঠানই হচ্ছে আসল অর্থাৎ ব্যারোজ প্রভৃতি প্রতিনিধিকল্প ব্যক্তিগণের হাত দিয়ে আসা চাই, তবেই সেটী একটী নিদর্শন স্বরূপ গণ্য হয়। খবরের কাগজে অমনি অমনি কিছু বেরুলে সেটী নিদর্শন স্বরূপে গণ্য হয় না। সব চেয়ে দস্তুরমত উপায় হচ্ছে ডাঃ ব্যারোজকে পাঠান ও তাঁকে কাগজে প্রকাশ কর্‌তে অনুরোধ

করা। আমি এই সব কথা লিখ্‌ছি, তার কারণ এই যে, আমার মনে হয়, তোমরা অন্য জাতের আদব কায়দা দস্তুর জান না। যদি কলকেতা থেকেও বড় বড় নাম দিয়ে—এই রকম সব আসে, তা হলে আমেরিকানেরা যাকে বলে Boom, তাই পাব (আমার স্বপক্ষে খুব হুজ্জুক মেচে যাবে) আর যুদ্ধের অর্দ্ধেক জয় হয়ে যাবে। তখন ইয়ঙ্কিদের বিশ্বাস হবে যে, আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধি বটে, আর তখনই তারা তাদের গাঁট থেকে পয়সা বার করবে। স্থিরভাবে লেগে থাক—এ পর্য্যন্ত আমরা অদ্ভুত কার্য্য করেছি। হে বীরগণ, এগিয়ে যাও, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ কোর্‌বো। মান্দ্রাজ থেকে যে কাগজখানা বার হবার কথা হচ্ছিল, তার কি হল? সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সভাসমিতি স্থাপন কর্ত্তে থাক—কাযে লেগে যাও—ইহাই একমাত্র উপায়। কিডিকে দিয়ে লেখাতে থাক, তাহাতেই তার মেজাজ ঠিক থাক্‌বে। এ সময়টা বেশী বক্তৃতা কর্‌বার সুবিধা নেই, সুতরাং এখন আমাকে কলম ধরে বসে লিখ্‌তে হবে। অবশ্য সর্ব্বক্ষণই আমাকে কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌তে হবে, তারপর শীতঋতু এলে লোকে যখন তাদের বাড়ী ফির্‌বে, তখন আবার বক্তৃতা দিতে সুরু করে এইবার সভাসমিতি স্থাপন কত্তে থাক্‌ব। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা। খুব খাটো। সম্পূর্ণ পবিত্র হও—উৎসাহাগ্নি আপনিই জলে উঠ্‌বে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ।

পুঃ—সকলকে আমার ভালবাসা। আমি কাকেও কখন ভুলিনা। তবে নেহাত অলস বলে সকলকে আলাদা আলাদা লিখ্‌তে পারি না। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। ইতি

বি—

পুঃ—তোমার ট্রিপ্লিকেনের ঠিকানা অথবা যদি কোন সভাসমিতি স্থাপন করে থাক, তার ঠিকানা আমায় পাঠাবে। ইতি

বি—।

নেপোলিয়ন।

(শ্রীসুব্রহ্মণ্য মিত্র বি, এ।)

"Love of country is the first virtue of civilized man"—N.

দেখিতে দেখিতে ফরাসী-বীর নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর একশতবর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল। এ বৎসর তাঁহার শাতাব্দীক শ্রাদ্ধবাসরে (তদীয় মৃত্যুদিন—৫ই মে ১৮২১) আবার ইতিহাস-ভক্ত বীরকে উপযুক্ত সম্মান প্রদানে উৎসুক হইয়া ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি হস্তে উপস্থিত। বর্ত্তমানের আলোকে অতীতকে নূতন করিয়া দেখিবার তাহার সকল প্রয়াস সার্থক হউক—পুরাতন কাহিনীর পুনরালোচনা আজি বিশেষভাবে সময়োপযোগী, সেই জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীজাতি অতীতযুগের অসহনীয় দারিদ্র্য অবিচার ও নির্য্যাতনের গুরুভার লাঘবের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। ঐ সময়ে প্রত্যেক শিক্ষিত ফরাসীর একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল—স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতির উপায় উদ্ভাবন,—এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে কোনরূপ কুণ্ঠা-বোধ না করিয়া আত্মবলিদানের জন্য মন-প্রাণ প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য ছিল তাহার শ্রেষ্ঠ সাধনা। তার লাতিন প্রকৃতিগত প্রবল ভাবপ্রবণতা, উৎসাহ-উত্তেজনা, তাকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার লীলাস্থল এক নূতন রাজ্যের কল্পনায় বিভোর করিয়াছিল। সেইজন্যই সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা ও শাসন-প্রণালী—সর্ব্বক্ষেত্রেই এক নূতন বিপ্লব আনয়নই ছিল রুসো, ভলতেয়র, ডিডেরো প্রভৃতি দার্শনিক মনীষিগণের প্রাণের ইচ্ছা। ফরসী বিপ্লবের ইতিহাস কেবলমাত্র উক্ত আদর্শ বাস্তবে কতদূর পরিণত হইয়াছিল তাহারই ইতিবৃত্ত। ইউরোপের, তথা বিশ্বের ইতিহাসের উহা এক সন্ধিক্ষণ—নবযুগের সূচনাস্থল।

কিন্তু যে বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল উন্নত আদর্শ ও উচ্চভাব লইয়া, এবং যাহা প্রথম দুই, তিন বৎসর ইউরোপীয় মহাদেশের উদার ব্যক্তি-

মাত্রেরই সহায় ও সহানুভূতি লাভে পুষ্ট হইয়াছিল,—কালের গতিতে তাহা এক ভীষণ পৈশাচিক তাণ্ডবলীলায় পর্য্যবসিত হইল। ভাগ্য-লক্ষ্মীর এমনই উপহাস যে, যে আন্দোলন সদ্বিচার এবং ন্যায়স্থাপনকল্পে দেশবাসীমাত্রকেই আহ্বান করিয়াছিল,—তাহাই অবশেষে অবিচার অন্যায় এবং বীভৎসতার উৎস হইয়া সকলের প্রাণে প্রবল আতঙ্ক আনিল।

ফ্রান্সের ভাগ্যাকাশ যখন এইরূপ অমানিশার পুঞ্জীভূত অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই সময়ে সহসা যেন বোধ হইল, সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবেন—প্রথম কিরণ-রশ্মির আভায পরিলক্ষিত হইল। সমগ্র ফরাসী জাতি তখন নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল অন্ধের ন্যায় পথহারা হইয়া আপনাকে চিরকালের জন্য ভ্রষ্ট ও পতিত ভাবিয়া নৈরাশ্যে অভিভূত। যেন অবিরাম রব উঠিতে লাগিল—"দে রামা মানুষ মিলায়ে দে।" স্বার্থপূর্ণ, অযোগ্য নেতার মোহে ভুলিয়া ফরাসীজাতি বহুভাবে আপনার কল্যাণপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল তাই সে বলিল—

"পথ দেখিয়ে যায় গো নিয়ে
এমন মানুষ কই ?
বাক্ চাতুরী কর্ব্বে না যে
ব্যাকুল যবে হই।
নিপুণ মাঝি চাই গো আজি
কাজের কাজী চাই।"

তাহাদের সেই কাতর প্রার্থনা বিভুর কর্ণে পৌছিল। কর্সিকার কোন্ এক অজানা পল্লী হইতে রজোগুণের অবতার কর্ম্মবীর নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আসিয়া দেশবাসীকে 'অভীঃ'মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। মানবেতিহাসের নিয়ন্তা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে ফরাসী আবার তাহার আত্মশক্তি ফিরিয়া পাইল। মনে হয়, সমগ্র ফরাসীজাতির সমবেত ইচ্ছাশক্তিই নেপোলিয়নরূপ বিগ্রহ ধাঁরণ করিয়া ফলবতী হইয়াছিল।

সেই যুগের যে সকল বিভিন্ন ভাব ও আদর্শ প্রচারিত হইতেছিল তাহার

সকল গুলিই এই অদ্ভুত নেতার মধ্যে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভলতেয়রের উদার যুক্তিবাদ, রুসোঁর প্রকৃতি-প্রেম, দাঁতোঁর আমূল সংস্কার-বাদ এবং রোবস্পিয়রের আদর্শসমাজ স্থাপনানুরাগ,—তাঁহার চরিত্রে এ সকলগুলিরই সন্ধান মিলিল। তাঁহাকে পাইয়া যেন সব বিবাদ, সব মতদ্বৈধের চরম মীমাংসা পাওয়া গেল—প্রত্যেক ফরাসীর তিনি হইলেন আপনার আপন, অন্তরের দেবতা,—তাঁহার সমন্বয়বাণী সকলকেই মুগ্ধ ও বশীভূত করিল।

নেপোলিয়ন দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষভাবে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,—সেইজন্যই তাঁহার যুগধর্ম্মের প্রচার। প্রজাতন্ত্রবাদ কাল-ক্রমে অনিয়ম, অত্যাচার ও গোলমালের সৃষ্টি করিতে লাগিল—তাহাতে দেশের প্রকৃত কাজ হইতেছে না দেখিয়া নেপোলিয়ন বিবেচকের ন্যায় সর্ব্বপ্রথমে সকল ক্ষমতা, সকল অধিকার কেন্দ্রীভূত করিয়া রাজহস্তে টানিয়া লইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, প্রজাদিগকে আবার উপযুক্ত শিক্ষাদানে উন্নত করিবেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের উপর শাসনকার্য্যের ভার ন্যস্ত করিবেন, অধিক অধিকার দানে আবার তাহাদিগকে মহীয়ান করিয়া তুলিবেন। এ ইচ্ছা যে কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিতে তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এলবা নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কার্য্যকলাপে পাওয়া যায়। সম্রাটের একচ্ছত্র আধিপত্য তিনি ঐ সময়ে শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। আভিজাত্য এবং যাজকতন্ত্র-নিপীড়িত ফ্রান্সকে রক্ষা করিয়া তিনি সকলের পূজ্য হয়েন। তাহা ছাড়া 'Career open to talents' ইহাই ছিল সর্ব্বসময়ে তাঁহার শাসনের মূলমন্ত্র; স্বদেশপূজার সেই যোগ্য পুরোহিত সকল ভক্তকেই আপনাপন প্রতিভা-অঞ্জলি লইয়া মাতৃঅর্চ্চনা পূর্ণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন।

বাল্য হইতেই তাঁহাতে মহত্ত্বের চিহ্ন সকল দেখা গিয়াছিল। জননী লিটিজিয়ার স্তন্যদুগ্ধ পানের সহিত তাঁহার ভিতর মাতার প্রখর ধী, অসাধারণ কর্ম্মনৈপুণ্য ও শ্রমশীলতা এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রবল প্রচেষ্টা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি বিকশিত হইতে লাগিল। যৌবনে

প্রাক্কালেই নেপোলিয়ন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন,—তিনি এক বিশেষ কর্ম্মের জন্য প্রেরিত, তাঁহার জীবনের এক বিশিষ্টব্রতের অস্ফুট স্মৃতি মানসপটে সদা ভাসমান হইতে লাগিল। সাধারণ মানবের পথে চলিয়া তাঁহাকে উন্নতি করিতে হইলে একজন সেনানায়ক (captain) হইতেই তাঁহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হইত। কিন্তু তাহা হইলে যে ভাগ্যবিধাতার সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়! তাঁহাকে একাধারে বহুগুণের স্ফূরণ হইয়াছিল। জগতেতিহাসের অতিমানবের (Super-men) শ্রেণীতে তিনি আজিও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। সাফল্যের কনককিরীটে সুশোভিত হইতে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল—নতুবা সিদ্ধি কাহার মিলে? 'উদ্যোগিনাম্ পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী'ই যে চিরসত্য।

যে যে যুদ্ধ জয় করিয়া তিনি প্রায় সমগ্র ইউরোপখণ্ডে আপনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ স্থাপিত করিয়া বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন তাহাদের কথা নাই বলিলাম। ইতালীয় যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া মারেঙ্গো, অষ্টারলিটজ্, জেনা, ফ্রিড্ল্যাণ্ড, ওয়াগ্রাম প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানায়করূপে যে অদ্ভুত শৌর্য্য এবং সাহসিকতায় তিনি সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সে কথা জানিতে কাহারও বাকি নাই। এ সকল যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক অসাধ্যসাধন ব্যতীত তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বের যথেষ্ট পরিচয়দানে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন—দুই একটি উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আরকোলার জনৈক নিদ্রাভিভূত প্রহরী সহসা নয়ন মেলিয়া দেখিল—স্বয়ং সম্রাট ধীর শান্তবদনে তাহারই পরিত্যক্ত বন্দুক হস্তে তাহার স্থানে দণ্ডায়মান—তাহার প্রাণে ভীষণ আতঙ্ক,—কারণ সে জানিত কঠিন সামরিক নিয়ম অবহেলার ফলে তাহাকে প্রাণদণ্ড দিয়া আত্মপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে! কিন্তু সেই মূঢ় সৈনিক বুঝে নাই যে নেতা নেপোলিয়ন বাহিরে লৌহ বর্ম্মাচ্ছাদিত হইলেও হৃদয়হীন নহেন—তাই সেই জীবনমরণশঙ্কটাপন্ন সৈনিককে ক্ষমা করিয়া তিনি শুধু তাহাকে চমকিত ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন নাই—'Justice tempered with mercy'র শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখাইয়া তিনি আমাদের

সকলকে চিরতরে বিমোহিত করিয়াছেন। পিতৃতুল্য রাজাধিরাজের কি সুন্দর মোহন ছবি!

আবার সিরিয়া অভিযান (১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ) হইতে ফিরিবার পথে জনৈক আহত সেনাপতিকে নিজ অশ্বে আরূঢ় করিয়া স্বয়ং পদব্রজে সাধারণ সৈনিকদিগের সহিত চলিয়া আর এক ভাবে তিনি আপনার মহত্ত্ব ফুটাইয়াছেন। তাহা না হইলে কি ফরাসী সহজে তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করে? তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ নায়কের অধীনেই ফ্রান্সের অনভিজ্ঞ অল্প-বয়স্ক সৈনিকগণের পক্ষে সমগ্র ইউরোপের মিলিতশক্তির (Concert) বিরুদ্ধে সাত আটবার সংগ্রাম করা সম্ভব হইয়াছিল, নতুবা সুনিশ্চিত পরাজয়ের ফলে ফরাসীর মুখে কলঙ্ককালিমা পড়িত। তাঁহার সেই বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিমাত্রই সৈন্যগণের নববলের সঞ্চার হইত, তাহাদের লুপ্তসাহস আবার চতুর্গুণে অভিভূত হইত। ফ্রান্সের আড়াই কোটী লোকের উপর তাঁহার প্রভাব তাই স্বপ্নকেও বাস্তবে পরিণত করিয়াছিল, নতুবা সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া আলেকজাণ্ডার বা সার্লিম্যানের ন্যায় সুবৃহৎ রাজ্যস্থাপন তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইত না।

কিন্তু নেপোলিয়ন যে বিদ্যাদেবীর একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন এবং জ্ঞানানুশীলনে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন সে কথা অনেকেই স্মরণ রাখিতে চান না। বাল্যে তিনি সিজার, টুরেন, ফ্রেড্রিক প্রভৃতি প্রথিতনামা সেনানায়কগণের সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর রচনা লিখিয়া ছাত্রসমাজে পণ্ডিত বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন—এই সকল প্রবন্ধের সারবত্তা এবং সৌন্দর্য্য দেখিলে বৃদ্ধদিগকেও স্তম্ভিত হইতে হয়। পরবর্ত্তী জীবনে ইজিপ্ত যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া তিনিই একহিসাবে ইউরোপে ইজিপ্তের প্রাচীন ইতিহাসানুশীলনের প্রবর্ত্তন করেন—সৈনিকের পরিচ্ছদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনুসন্ধিৎসুছাত্রের ন্যায় তিনি সভা-সমিতিতে পুরাতন ইজিপ্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি প্রথম শাসন

কার্য্যের ভার লন তখন প্রায় সমগ্র ফরাসীজাতি নিরক্ষর ছিল কিন্তু তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পঞ্চবৎসরের মধ্যেই প্রায় শতকরা ছিয়ানব্বই জন শিক্ষিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, তাঁহার শিক্ষানীতি ও প্রণালীতে যথেষ্ট ত্রুটী ছিল—স্বাধীনচিন্তা প্রায় দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল বলিলেও একহিসাবে অত্যুক্তি হইবে না।

যে কারণে তাঁহার নাম আজিও বিশ্বে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে তাহা তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—ইউরোপের বিচ্ছিন্ন আইন-কানুনগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া সুসংবদ্ধরূপ অসাধ্যসাধন। নেপোলিয়ন ছিলেন কৃষক শ্রমজীবিদের দরদী। তাহাদিগের দুঃখ এবং অত্যাচারের ভার লাঘবের জন্য তিনি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। ইউরোপের শাসন ও রাজনীতি সম্পর্কীয় যে যে পরিবর্ত্তন তিনি সংসাধিত করিয়াছিলেন এবং উন্নতির যে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর মেটারনিক প্রমুখ কূট রাজনীতিজ্ঞের রক্ষণ-নীতির কুহকে ভুলিয়া ইউরোপ পরিত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কালে নেপোলিয়নের শাসন সংস্কারে ইটালি জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশে কি অসাধ্যসাধন হইয়াছিল তাহা সকলেই শেষে বেশ বুঝিলেন।

কেহ যেন না বুঝেন যে নেপোলিয়নের লোকোত্তর প্রতিভা ও অদ্ভুত সাধনা-সিদ্ধির যশোগান গাহিতেছি বলিয়া আমরা তাঁহার ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। খুঁজিলে তাঁহার অনেক ভ্রমের কথা ইতিহাসের মধ্যে সন্ধান করিয়া বিস্তৃত তালিকা দিতে পারা যায়, কিন্তু ভুল যে মানব-ধর্ম্ম—'To err is human'.

নেপোলিয়ন নিজের সম্বন্ধে একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন—'I am a fragment of rock launched into space'—বাস্তবিকই ইতিহাসে তাঁহার আবির্ভাব, অভ্যুদয় এবং পতন সৌদামিনীর ন্যায় বড়ই চমকপ্রদ। ইউরোপকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবার সকল বাসনাই জীবনে তাঁহার অপূর্ণ রহিয়া গেল কারণ—"I asked twenty years but Destiny granted me only thirteen."

অবশেষে চির-প্রিয় ফ্রান্স হইতে বহুদূরে আটলাণ্টিক মহাসাগরের

সামান্য একটী দ্বীপপুঞ্জে অশেষ নির্য্যাতন সহিয়া তাঁহার প্রাণ-বায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল—কি বিচিত্র জীবন-যবনিকাপতন? বীরশ্রেষ্ঠ হানিবলের উপর প্রাচীন রোমের পৈশাচিক ব্যবহারের কলঙ্ককথা ইতিহাস আজিও ভুলে নাই,—নেপোলিয়নের উপর ব্রিটেনের ব্যবহার একান্ত ঘৃণ্য—ঐতিহাসিক মরিসের একথা আজ আর স্বীকার না করিয়া উপায় কৈ? নেপোলিয়নকে যুদ্ধে দ্বিতীয় আটিলা, রাজ্যশাসনে দ্বিতীয় বরজিয়া, নিষ্ঠুরতা এবং লাম্পট্যে দ্বিতীয় নীরো বলিয়া বর্ণনা করা ধৃষ্টতামাত্র। আবার তিনি যে সংযমে ঋষিতুল্য ছিলেন একথা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও তেমনি বৃথাপ্রয়াস।

উপসংহারে কবিকণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আবেগভরে আমরা বলি—

"চলে গেছ তুমি আজ—
মহারাজ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে;
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায়—পথের ধূলি পরে। *
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোন দিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে; *
সমুদ্র-স্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট তোমারে ভরিতে নাহি পারে। *
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।" *

———

* গত ভাদ্রের 'ইতিহাস ও আলোচনায়' প্রকাশিত লেখকের একটী প্রবন্ধ অবলম্বনে তৎকর্ত্তৃক নূতন আকারে পুনরালোচিত। উঃ সঃ।

স্বপ্ন-ভঙ্গ।

(শ্রীঅজিতনাথ সরকার)

(প্রতিবাদ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল প্রবন্ধের উক্তি :—

(১) "হুজুগে ধার্ম্মিকদের আবার রকমারি আছে। ঠাকুর বলেছেন,—"কাম কাঞ্চন ত্যাগ"। ধার্ম্মিকেরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ফস্ করে ধরে ফেল্লেন,—"এত সোজা কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছনা ? বে কর্ত্তে হবে না।"

(২) 'হুজুগে' ধর্ম্মের আরও লক্ষণ আছে। যেই ধর্ম্ম এসে ঘাড়ে চাপ্‌লেন, ওম্নি দেখ্‌বে, ধার্ম্মিকেরা মাথায় তেল দেওয়া বন্ধ করেছেন, খালি পা, জামা বা চাদর অদল বদলে গায়ে বিরাজ কচ্ছে। দেশে যে দিন পড়েছে তাতে শরীর ধারণের জন্য যে খাদ্য নেহাৎ দরকার, পনর আনা লোকের ভাগ্যে তাও জুটছে না। ধার্ম্মিকেরা আবার তারই থেকে কমিয়ে কমিয়ে শাক পাতা চচ্চড়ির ব্যবস্থা কচ্ছেন। ফলও ব্যবস্থা মতই হচ্ছে—কঙ্কালসার দেহ কোটরাগত চক্ষু ; বিষাদময়, উৎসাহশূন্য মুখ, ঢোকগিলে কথা বলা।

(৩) হুজুগ ছেড়ে নিজ্‌কে চিন্‌বার চেষ্টা করা কি প্রত্যেক বুদ্ধিমান যুবকের কর্ত্তব্য নয় ?

---

(১) আজ দেশে যে দুর্দ্দিন আসিয়াছে তাহাতে কিছুদিনের জন্য বিবাহ বন্ধ করা বোধ হয় আমাদের একটা আংশিক কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ; যদি দেশের দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন করিতে হয়, দরিদ্র-নারায়ণের সেবারূপ মহাব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়। স্নেহময়ী মার কোলে অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার শিশুর অন্তিম কাকুতিরস্বর যদি কোন সহৃদয় মহাত্মার মর্ম্মে আঘাত করিয়া থাকে, তবে তিনি বলিবেনঃ—'এ হতভাগ্য

দেশে বিবাহোৎসব কিছুদিনের-জন্য-বন্ধ থাকুক"। স্বামিজী বলিতেন,—"ভিক্ষুক বিবাহ করিয়া দেশে আরও দশটী ভিক্ষুকের সৃষ্টি করিতেছে"। একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। 'বিবাহ কর' বলিয়া কাহাকেও জাগাইবার দরকার নাই আপনা হইতেই বিবাহের ঠেলায় অস্থির করিয়াছে। "আমরা যা করি যতখানি করি, সে অলৌকিক! ওই যে পোষ্য প্রতি-পালন ক্ষমতা একটী জন্মিবার পূর্ব্বেই আমরা পরম বৈরাগ্যের সহিত অমন চার পাঁচ ছয়টীকে পৃথিবীতে আনিয়া ফেলি, জাতির মুখ চাহিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিই এ আর কোন্ জাতির লোক পারে? ......আরও আমাদের বিরাট মন কতখানি রোমান্সে ভরা! ধাক্কায় গলদঘর্ম্ম সহসা একদিন দেখিতে পাই, সারাজীবনের সুখভোগ উপার্জ্জন সঞ্চয়ের ফলে দেহ পুষ্টি স্বস্তি ও মিতাচারের অভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অবস্থার উপযুক্ত ব্যবসা কোন দিনই করিয়া তুলিতে পারি নাই—সঙ্গতির মধ্যে জমিয়াছে ঋণ, আপনার দিকে না চাহিলে চলে না অথচ পশ্চাতে আপনার হাতে গড়িয়া খাড়া করিয়াছি যাহাদের তাহারা এখনও আমারি অনুজিবী"। * ধন্য আমাদের জীবন! ধন্য আমাদের স্বদেশ প্রেম!! আবার অন্নের সংস্থান না হইতেই যদি কেহ বিবাহ করিতে নারাজ হয়, তাহাকেও মা বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রক্ষণশীল মহাত্মাদিগের কশাঘাত সহ্য করিতে হয়, এ অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বনীয়?

আমরা বলি কাহারও কথা শুনিবার আবশ্যকতা নাই। এস ভাই! আমারা সমবেত চেষ্টায় কিছুদিনের জন্য পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডদানাধিকারীর দল বাড়াইতে কতকগুলি অসার জীবের সৃষ্টি না করিয়া, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদেরই জীবন রক্ষা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগি। আমার গর্ভধারিণী স্নেহময়ী জননী, প্রাণের ভাই ভগিনীরা অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল সার, বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণে অসমর্থ, আমাদের আবার বিবাহের সখ কেন? আত্মঘাতী ও নরঘাতী বাড়াইতে কি? যদি কেহ ঠাকু-

* 'নারায়ণ'। সত্যবালা দেবীর 'অন্তরের পাগল' নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

রের জীবন্ত ঈশ্বরের বাণী স্বরূপ 'কামকাঞ্চন' ত্যাগের কথা শুনিয়া বিবাহ করাং বন্ধ করে,—তবে বুঝিতে হইবে আমাদের সুদিন আসিবার সূচনা দেখা যাইতেছে, দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা কমিবার উপক্রম হইতেছে। বক্ষে পাষাণ চাপিয়া আর আমাদিগকে মার চক্ষে অপুষ্টাঙ্গ শিশুর নিশ্চয় অকাল মৃত্যুর করুণ দৃশ্য দেখিতে হইবে না—আপন হাতে শত শত অনাহার-হত মহাপ্রাণীগুলিকে শ্মশানের জলন্ত চিতায় তুলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু হায়! জগদ্গুরুর আশীর্ব্বাণী কি যথেচ্ছাচারীর দেশে সফলতা লাভ করিবে? বিবাহের মর্ম্মঘাতী দৃশ্য এখনও বোধ হয় আমাদের নজরে পড়ে নাই, তাহার বিষময় কুফল বোধ হয় এখনও আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারি নাই। তা যদি পারিতাম তবে বল্লাল সেনের বিচিত্র কৌলিন্য ও বাল্য বিবাহ প্রথা এরূপ মূর্ত্তিতে দেশে থাকিয়া নিত্য নূতন বাল বিধবার সৃষ্টি করিত না এবং কন্যার মাতা পিতাকে সর্ব্বস্ব হারাইয়া 'ভিক্ষাং দেহি' রবে পথের পাশে দাঁড়াইতে হইত না। মঙ্গলময় বিধাতার আশীর্ব্বাদে যেন দেশে অন্ততঃ এইরূপ নিত্যনূতন হুজুগের ধার্ম্মিক ও ধার্ম্মিকার দলই বাড়ীতে থাকে। শুধু ছেলে নয়, মেয়েদেরও এইরূপ হুজুগে ধর্ম্মে যোগ দিয়া 'বিয়ে করিব না' বলা একান্ত দরকার হইয়াছে,—তাঁহাদেরও শিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণী হইয়া আত্মবলী দিবার সময় আসিয়াছে। হুজুগে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বাবুয়ানার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া অপেক্ষা ধর্ম্মে যোগ দেওয়া শত সহস্র গুণে ভাল। ঠাকুরের আশীর্ব্বাণী ভারতের প্রতিগৃহে এইরূপ জলন্ত আদর্শের সৃষ্টি করুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। ইহার উপর আমরা কোনরূপ তীব্র মন্তব্য গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নই। পিতামাতা আজ ষোড়শ বর্ষীয় বালকের এবং দশম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহের আয়োজন করিলে তাদের বলিতে শিখাইব—পিতামাতা আমাদের শত্রু।

তারপর বিয়ে করিব না এই কথাটা কাম কাঞ্চন ত্যাগের একমাত্র উপায় না হইলেও ইহার যে আংশিক সফলতা আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়া কয়জন বীর অক্ষত

শরীরে থাকে তাহা আমাদের ধারণায় আসে না। শাস্ত্রে আছে—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" কিন্তু কয়জন পুত্র জন্মের পর স্ত্রী সংসর্গ ত্যাগ করেন? স্ত্রী আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্গিনী না হইয়া—অদম্য পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ও আমরণ ভোগ বাসনার সহায়রূপিণী হইয়াছে; ফলে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষত্ব হইতে পশুত্বে, এবং জীবন হইতে মরণের দিকে অগ্রসর হইতেছি। ইহাই কি বিবাহের সনাতন নীতি? হায় ভারতের শাস্ত্রকারগণ! তোমাদের শাস্ত্র আজ কি বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা কি দেখিতেছ? তোমাদের জীবন-দায়িনী নীতি সমূহ আজ কিরূপ অনাবিল পঙ্কে নিমজ্জিত ও কলঙ্কিত, অন্তর্য্যামী তোমরা তাহা কি জানিতে পারিয়াছ? যদি তোমাদের পুণ্যময় স্বর্গলোকে এই নরকের পূতিগন্ধ পঁহুছিয়া থাকে, তবে তোমরা একবার কৃপাদৃষ্টি পাত কর। তোমাদের আজীবন সাধনালব্ধ জ্ঞান গরিমার বিপুল তেজে এই নরক পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দাও, তাহাই আমাদের উপযুক্ত পুরস্কার। নরক জীবনের দুঃসহ ভার বহন অপেক্ষা মৃত্যু শত সহস্রবার বরণীয়!!

(২) পাশ্চাত্য বিলাস স্রোতে ভাসমান জাতির পক্ষে একটু আধটু লোক দেখানো ব্রহ্মচর্য্যেরও আবশ্যকতা আছে বৈ কি! দেশের পনর আনা বাবুর দল সকল সময় বেশ বিন্যাস রূপ উৎকট কর্ম্মসাগরে নিমজ্জিত। আজ পর্য্যন্ত কত রঙ বেরঙের সুগন্ধি তৈল, পমেটম, আতর, এসেন্স ইত্যাদির যে সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে কত অর্থ যে অপব্যয় যাইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই বিলাস স্রোতে মজ্জমান জাতিকে আর বিলাসের দিকে প্রলুব্ধ করিবার দরকার নাই, তাহার স্বতঃ উচ্ছাসেই তাহাকে অস্থির করিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় যদি কাহারও ঘাড়ে ধর্ম্ম চাপেন এবং সে মাথায় তেল দেওয়া বা বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য বন্ধ করে, খালি পায়ে বেড়ায়, তবে বুঝিতে হইবে মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার হইতেছে; গতিহীন প্রাণযন্ত্র আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিজের দুর্দ্দিনের কথা, অবস্থার কথা অন্ততঃ হুজুগে পড়িয়াও আংশিক বুঝিয়াছে। লাঞ্ছিত কলঙ্ক কালিমা

লিপ্ত দেহকে বিলাস সজ্জায় চাকচিক্যময় করিতে যাওয়ার অর্থ কালিমার উপর আরও নিবিড় কালিমা লেপন করা। অতএব বিলাস স্রোতে বাধা পড়িলে আর কিছু না হউক অন্ততঃ ঘরের পয়সা ঘরে থাকিবে।

আর আমাদের রসনা তৃপ্তির কথা বলাই বাহুল্য। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত পাক প্রণালীই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। আমার দীন প্রতিবেশী যখন সপরিবারে অনশনে দিন যাপন করিতেছে, আমার বাড়ী তখন পোলাও কালিয়ার গন্ধে ভরপূর। এ দৃষ্টান্তের কি অভাব আছে? এক্ষেত্রে যদি কেহ শাক পাতার চচ্চড়ির ব্যবস্থা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, এবং পাক প্রণালীর অমোঘ নীতির ছলনা হইতে পরিপাক যন্ত্রকে রক্ষা করিতে প্রয়াশ পান, তবে তাহা অতীব সুলক্ষণ। "কোটরাগত চক্ষু, বিষাদময় উৎসাহশূন্য মুখ হওয়ার কারণ শাক পাতার চচ্চড়ি অথবা ব্রহ্মচর্য্য নয়,—তাহার একমাত্র কারণ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং সুশিক্ষার অভাব স্থানে কুশিক্ষার প্রভাব। ঠাকুর বলিতেন—"বেশী খেয়োনা আর শুচিবাই ছেড়ে দাও।" স্বামিজী বলিয়াছিলেন,—"অবিরত বার বৎসর নিরামিষাশী হইলে সিদ্ধ পুরুষ হওয়া যায়।"(?)। যদি ধর্ম্ম পথে কাহাকেও উন্নতি করিতে হয়, তবে ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করা একান্ত দরকার। অতিরিক্ত রকমারি ভোজনে আমাদের দৈহিক মানসিক শক্তি বাড়ে না, তাহাকে আরও কর্ম্মের অনুপযুক্ত করে। ধর্ম্মপথের পথিকদিগকে আহারে ও বিহারে সতত সংযমী হইতে হইবে, ইহাই সনাতন নীতির চিরন্তন সত্য। আজ আবার কেমন করিয়া বাবুগিরি চালাইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়, ধার্ম্মিক ও কর্ম্মবীর হওয়া যায়। তাহা অবশ্য আমাদের শিক্ষনীয় বিষয়। এই যুগেরই আচার্য্য বিবেকানন্দের পরিব্রাজক অবস্থার কথা যদি কাহারও স্মরণ পথে থাকে তিনি বেশ বুঝিতে পারিবেন—কি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া কি দুঃসহ উৎকট শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া স্বামিজী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, পূর্ণ মানব হইয়াছিলেন। দেবতা হইয়াছিলেন !! ভগবান হইয়াছিলেন !!! আমাদের এখনকার বচন-বাগীশ বাবুর দল

তাহার সহস্রাংশের একাংশও কি কেহ কখন পালন করিয়াছেন? কই তাঁহার দেবকান্তি ত সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনে মলিন হয় নাই? তাহার পরিবর্ত্তে অনুপম তেজোগরিমায় উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হইয়াছিল। কায়মনো বাক্যে পবিত্রতা রক্ষা এবং আহার ও বিহারে স্পৃহাহীন ও আড়ম্বর শূন্য হওয়াই ব্রহ্মচর্য্যের একটা ভিত্তি। অতএব যদি কেহ ধর্ম্ম পথের পথিক হইতে ইচ্ছুক হন (অন্তরের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রেরণাতেই হউক অথবা হুজুগে পড়িয়াই হউক) ব্রহ্মচার্য্য পালন তাহার—একমাত্র সহায়। কষ্ট সহ্য না করিয়া মায় কোলে স্নেহের আচ্ছাদনে সুখনিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া কোন সাধারণ মনুষ্য ধার্ম্মিক হইতে পারিয়াছে তাহা আমাদের ধারণায় আসে না। তবে নূতন যুগে বিজ্ঞান বলে সম্ভব হইতে পারে।

(৩) নিজেকে চিনিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান যুবকের কর্ত্তব্য ইহা আমরা শতবার স্বীকার করি, কিন্তু নিজেকে চিনিবার শক্তি আমরা কোথায় পাইব? সেই সর্ব্বশক্তিমানের দেওয়া শক্তিতেই মানুষ শক্তিমান হয়। আমার সকল দৈহিক মানসিক শক্তি, সকল বিদ্যাবুদ্ধি তাঁরই দেওয়া, সুতরাং নিজেকে চিনিবারশক্তিও তাঁর কাছেই প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি প্রার্থনা করিতেও জানি? আমরা কি কোনদিন নিজেকে চিনিবার শক্তি প্রার্থনা করি? কৈ একদিনও ত সে প্রার্থনা আমার হৃদয় হইতে বাহির হয় না? যদি ভগবানের কাছে কখন কিছু চাই তবে 'স্বার্থ' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ সংসারের আপনভোলা কূট নীতি আমার কানে কেবলই স্বার্থের মন্ত্র দিতেছে। কে আমাকে জাগাইবে? কে আমার স্বপ্নজড়িত তন্দ্রাঘোর ছুটাইবে? কে আমার দিশাহারা অকূলপাথারে কাণ্ডারী হইবে? এরই জন্য গুরুর আবশ্যক। "গুরু কর্ণধার"। জ্ঞান হউক, ভক্তি হউক, কর্ম্ম হউক, সকল সাধনাতেই গুরু একমাত্র অন্ধের যষ্টি, নাবিকের ধ্রুবতারা। "ভক্তিতেই সব পওয়া যায়। যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরিয়া থাকে তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে। তাঁর দয়া থাকিলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে?......তাঁকে ভালবাসতে পারলে

আর কিছুরই অভাব থাকে না।......তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাক্‌তে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন। তারপর বিচার—শাস্ত্র; জগৎ।"(?) কিন্তু ভালবাসিতেই বা পারি কৈ? কাঁদিতেই বা পারি কৈ? সমস্ত জীবনটাই যে স্বার্থে ভরা! নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাস্‌তে পারে কয়জন? ভালবাসা একটী মহা সাধনা। যে ভালবাসায় মনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যশের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, কেবল ভালবাসিয়াই—তৃপ্তি দিয়াই তৃপ্তি! কিছু পাইবার আশা মোটেই থাকে না। মানুষ যখন ভালবাসিতে শিখে তখন সে হৃদয়ারাধ্যের নাম ধরিয়া ডাকিয়াই পরম তৃপ্তিলাভ করে। "শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে, জানে না সে কি সুখে যে ডাকে মা মা বলে" ভালবাসায় যখন এইরূপ ডাকা হয় তখনই তার নিজকে চেনা হয়। তখন 'আমার' বলিতে কিছু থাকে না, সবই "তোমার" হইয়া যায়। মানুষ যে পথেই থাকুক না কেন তাহার জীবনের চরম পরিণতি এই 'আমি' হারার মধ্যে।—কথাটীত বেশ সহজে বুঝিলাম, কিন্তু 'আমি' হারাইব কিরূপে? তাহারই একমাত্র সহায় গুরু।

লেখক বলিয়াছেন—"স্বামিজীর সব বই বেরিয়েছে, ঠাকুরের কথাও ঘরে ঘরে।" এই বলিয়া তিনি একটা শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা খাঁটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। আজ স্বামিজীর বই বাহির হইয়াছে বলিয়াই, অন্ততঃ প্রাণহীন ভাবে ঠাকুরের কথা ঘরে ঘরে হইতেছে বলিয়াই দেশের বাতাস ফিরিয়াছে, দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত বিরাট কায় অজগর নড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু ভারত কেন সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়াই ধর্ম্ম রাজ্যে একটা বিপুল জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। জগদগুরু বিবেকানন্দের শরীরের রক্ত জল হইয়া যে অমৃতোপম মৃত-সঞ্জীবনী বহির্গত হইয়াছিল, তাহা হইতেই যে গ্রন্থ রাজী হইয়াছে আমাদের জীবনে তাহাই একমাত্র সহায় বলিয়া বিবেচনা করি। তাহা আমাদের শোক সান্ত্বনা ও বিপদে অকৃত্রিম বন্ধু স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এ বিষয়ে তীব্র মন্তব্য আমাদের অসহ্য।

স্বামিন্! অনাথবন্ধু! এদুর্দ্দিনে আজ তুমি কোথায়? অতীত ভারতের যমুনা পুলিনে, কুরুক্ষেত্রের রণপ্রান্তরে তুমিই একদিন সৃষ্টি-সংহারের মধুর গম্ভীর লীলা এবং মহিমাময় হিমাদ্রি ক্রোড়ে—'রাজপুত্র সন্ন্যাসী রূপে' ত্যাগের লীলা, আত্মবলির চরম আদর্শ দেখাইয়াছিলে। আবার একদিন এই যুগেই সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যে দিগ্বিজয়ের লীলা দেখাইয়া গিয়াছ, যে মহাসাধনার উদ্বোধন করিয়া গিয়াছ তাহা কি সম্পূর্ণ হইবে না? হতভাগ্য আমরা দীন, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, অনাহারে ক্লিষ্ট আমরা তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবার শক্তি কোথায় পাইব প্রভু! দয়াময়! তুমি যে তোমার ভারতের নিরাশ্রয়দিগের জন্য আপনার জ্ঞান ভক্তি মুক্তি কিছুই কামনা কর নাই? সুদূর পশ্চিমে নানা রত্নালঙ্কার পরিশোভিত ঐশ্বর্য্য গরিমা দৃপ্ত-কুবেরের পুরীতে মণিময় সিংহাসনে বসিয়াও এই হতভাগ্যদের জন্য আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া ছিলে! কিন্তু আজ তুমি কোথায়? এই নিবিড় অন্ধকারে—কে আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইবে? আমরা যে কর্ণধার বিহীন হইয়াছি প্রভু! তাহা কি তুমি দেখিতেছনা? এই অরুন্তুদ কাতর ক্রন্দন ধ্বনি কি তোমার কোমল প্রাণকে আকুল করিতেছে না? তোমার লীলা অবসানান্তে আমাদের কথা তুমি ভাবিবে ইহা ত তোমার স্বমুখের বাণী। যেদিন তুমি দিগ্বিজয়ান্তে "আমার ভারতবর্ষ" বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভারতের উপকূলে অবতরণ করিয়াছিলে সেইদিন কি আর আসিবে? দয়াময়! আজ তোমার সাধের ভারতবর্ষের, প্রাণের ভারতবাসীর দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও। তোমার সাধের ভারত বক্ষে আজ অসুরের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহার হৃৎপিণ্ড নিঃসৃত রক্তস্রোতে দিগন্ত রঞ্জিত হইতেছে। তেজোগরিমাময় রুদ্র তুমি! এদৃশ্য কি দেখিতেছ না? যে একটী ভারতবাসীর নিন্দা তোমার বক্ষে শেলসম বাজিত; সেই দীন নিরাশ্রয়দিগের মাথায় অগ্নি বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে। ইচ্ছাময় তুমি! আমাদের অসার হৃদয়ে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক তবেই আমরা মানুষ হইব। আমাদের একমাত্র আশা শোকে দুঃখে বিপদে অকূল পাথারে তুমি সাথে সাথে ফিরিতেছ। তোমার অভয়বাণী

আমাদের অক্ষয় কবচ হউক, আমরা তোমার মহাব্রতের উদ্‌যাপনে কৃতকার্য্য হইব। দয়াময়! তোমার সেই স্বমুখের বাণীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। আমাদের এই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সঙ্কুলের মাঝে একমাত্র ভরসা "সম্ভবামি যুগে যুগে"। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শেষপর্য্যন্ত তাঁহার প্রণীত "আর্য্যাপঞ্চাশীতি" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :—(পরমার্থসার ৭৭শ্লোক)

হয় মেধশতসহস্রাণ্যথ কুরুতে ব্রহ্মঘাতলক্ষানি
পরমার্থবিন্ন পুণ্যৈর্নচ পাপৈঃ স্পৃশ্যতে বিমলঃ॥

[পরমার্থবিৎ যদি সহস্র সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তথাপি তাঁহাকে পুণ্যস্পর্শ করে না, আর যদি লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মহত্যা করেন তথাপি তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করেনা, (কারণ) তিনি বিমল অর্থাৎ অবিদ্যামল শূন্য হইয়াছেন।]

সেই হেতু অধিক বিচারে প্রয়োজন কি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মলিন বাসনার অবশেষ ছিলই বটে। আর বশিষ্ঠদেবও (স্বকৃত রামায়ণে যে ভগীরথ বৃত্তান্ত) বর্ণনা করিয়াছেন (তাহাতে দেখা যায়) যে ভগীরথ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও রাজ্যপালন করিতে করিতে মলিন-বাসনা বশতঃ চিত্তের বিশ্রান্তিলাভ করিতে না পারায় (রাজ্যাদি) পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন। (১) অতএব

(১) নির্ব্বাণ প্রকরণ পূর্ব্বভাগ, ৭৫ সর্গ—জ্ঞানী অশুভ যাহা কিছুই করুন না, তদ্দ্বারা তাঁহার কর্ম্মলোপ ঘটে না, কেননা তিনি বিমল অর্থাৎ

কোনও মলিনবাসনা আপনাতে অবশিষ্ট রহিয়াছে দেখিলে, তাহাকে পরকীয় দোষের ন্যায় সম্যক্‌প্রকারে লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাহার প্রতিকার অভ্যাস করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই স্মৃতিশাস্ত্র বলিতেছেন :—

যথা সুনিপুণঃ সম্যক্ পরদোষেক্ষণে রতঃ।
তথা চেন্নিপুণঃ স্বেষু কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ (১)

অপরের দোষ লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লোকে যেরূপ সম্যক্ প্রকারে নিপুণতার আতিশয্য প্রকাশ করে নিজের দোষসমূহ লক্ষ্য করিতে যদি সেইরূপ নিপুণতা দেখায় তবে কে না (সংসার) বন্ধন হইতে মুক্ত হয়?

আচ্ছা প্রথমে, বিদ্যা-মদের প্রতীকার কি? যদি এই প্রশ্ন কর, (তবে জিজ্ঞাসা করি সেই বিদ্যামদ আছে কোথায়?) তাহা কি তোমাতেই থাকা হেতু তুমি অপর লোককে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে কর অথবা তাহা অপর লোকে থাকা হেতু সে তোমাকে নিজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করে? যদি প্রথমোক্ত প্রকারই হয়, তবে নিরন্তর চিন্তা করিবে তোমার এই বিদ্যামদ অবশ্যই কোনও না কোন স্থলে চূর্ণ হইবে। দেখ শ্বেতকেতু বিদ্যামদে মত্ত হইয়া রাজা প্রবাহণের সভায় গমন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি সেই বিদ্যা না জানা হেতু নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। রাজা তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে ভৎসনা করায়, তিনি পিতার নিকটে আসিয়া

তাঁহার অবিদ্যামল তিরোহিত হইয়াছে, এই হেতু তিনি সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন অথবা লক্ষ ব্রহ্মহত্যাই করুন, তজ্জনিত পুণ্য বা পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শেষাচার্য্য প্রণীত "পরমার্থসার"ই আর্য্যাপঞ্চাশীতি নামে প্রসিদ্ধ কেননা এই গ্রন্থখানিতে আর্য্যাচ্ছন্দে বিরচিত। ৮৫টি মাত্র শ্লোক আছে। ট্রিভেণ্ড্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর দ্বাদশ গ্রন্থরূপে মুদ্রিত। রাঘবানন্দ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—তত্ত্ববিৎ শুভ।

(১) এই শ্লোকটি স্মৃতি বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইলেও যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদে (৩।২৫-২৬) দেখিতে পাওয়া যায়।

আপনার দুঃখের কথা জানাইলেন। তাঁহার পিতা কিন্তু নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি সেই রাজারই অনুসরণ করিয়া, সেই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা লাভ করিলেন। (১) বালাকি (অসম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হেতু) গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। রাজা অজাতশত্রু তাঁহাকে ভৎর্সনা করাতে তিনি দর্প পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। (২) উষস্ত (৩) কহোল (৪) প্রভৃতি বিদ্যামদ বশতঃ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। যখন সেই বিদ্যামদ অপর লোকে থাকা হেতু সে তোমাকে আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিবে, তখন তুমি মনে করিবে সেই অপর ব্যক্তি (বিদ্যামদে) মত্ত হইয়াছে, সে আমাকে নিন্দা করুক বা অপমান করুক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি নাই। এই হেতু কথিত হইয়াছে—

আত্মানং যদি নিন্দন্তি স্বাত্মানং স্বয়মেব হি ॥
শরীরং যদি নিন্দন্তি সহায়াস্তে জনা মম ॥

তাহারা যদি আমার 'আত্মাকে' নিন্দা করে তবে তাহারা নিজেই আপনাদের 'আত্মাকে' নিন্দা করিতেছে (কারণ আত্মা এক বই দুই নহে)। যদি তাহারা আমার শরীরকে নিন্দা করে তবে তাহারা ত আমার অনুকূল ব্যক্তি।

নিন্দাবমানাবত্যন্তং ভূষণং যস্য যোগিনঃ।
ধীবিক্ষেপঃ কথং তস্য বাচাটৈঃ ক্রিয়তামিহ ॥ (৫)

নিন্দা এবং অপমান যে যোগীর ভূষণস্বরূপ, এই সংসারে বাচাল লোকে কি প্রকারে তাহার বুদ্ধির বিক্ষেপ ঘটাইতে পারে? (অর্থাৎ

(১) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২য় ব্রাহ্মণ, ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫ম অধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণ।

(২) কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২য় অধ্যায় ১ম ব্রাহ্মণ।

(৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩য় অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

(৪) ঐ ৫ম ব্রাহ্মণ।

(৫) এই দুইটি শ্লোকের মূল অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই।

'আমি নিন্দাপমানের অতীত নিরঞ্জন আত্মা' এইরূপ সংস্কারের বিলোপ ঘটাইতে পারে ?)।

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে আছে—

সপরিবারে বর্চ্চস্কে (১) দোষতপশ্চাবধারিতে।
যদি দোষং বদেত্তস্মৈঃ কিং তত্রোচ্চতুর্ভবেৎ॥

২য় অধ্যায় ১৬ শ্লোক।

যখন নিষ্ঠা ও তদানুসঙ্গিক বস্তুসকল, দুষ্ট (এবং সেই হেতু পরিত্যাজ্য) বলিয়া অবধারিত হইল, তখন যদি কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিন্দা করে, তাহা হইলে মলত্যাগকারীর তাহাতে কি হইবে ?

[পাঠান্তরের অর্থ—যে বিষ্ঠা সম্যক্ প্রকারে পরিত্যক্ত হইয়াছে ইত্যাদি]

তদ্বৎ স্থূলে তথা সূক্ষ্মে (২) দেহে ত্যক্তো বিবেকতঃ।
যদি দোষং বদেত্তাভ্যাং কিং তত্র বিদুষো ভবেৎ॥

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ২য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক)।

সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ বিচারপূর্ব্বক পরিত্যক্ত হইলে, (অর্থাৎ সেই দেহদ্বয়ে অভিমান পরিত্যক্ত হইলে) যদি কেহ তাহাদিগের উদ্দেশ্যে নিন্দা করে তাহা হইলে জ্ঞানীর তাহাতে কি হইবে ?

শোক হর্ষ ভয় ক্রোধ লোভ মোহ স্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্মমৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ (৩)॥

অহঙ্কারেরই শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ মোহ স্পৃহা প্রভৃতি এবং জন্ম মৃত্যু ঘটে, তাহারা আত্মার নহে।

---

(১) মূলের পাঠ—বর্চ্চস্কে সম্পরিত্যক্তে। এই শ্লোকের অবতরনিকার ব্যাখ্যায় টীকাকার জ্ঞানোত্তম বলিতেছেন—"এইরূপে আমাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে বিভিন্ন বলিয়া জানিলে সেই জ্ঞানের দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ ফল, সকল অনর্থের বীজভূত রাগদ্বেষের নিবৃত্তি হয়, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন।"

(২) মূলের পাঠ—"তদ্বৎসূক্ষ্মে তথা স্থূলে"।

(৩) এই শ্লোকের মূল-পাই নাই।

জ্ঞানাঙ্কুশ (১) নামক গ্রন্থে নিন্দা যে ভূষণস্বরূপ হইতে পারে, তাহা দেখান হইয়াছে, যথা—

মন্নিন্দয়া যদি জনঃ পরিতোষমেতি
লব্ধপ্রযত্নজনিতোঽয়মনুগ্রহো মে।
শ্রেয়োর্থিনো হি পুরুষাঃ পরিতুষ্টিহেতো
দুঃখার্জ্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি॥

যদি কোনও ব্যক্তি আমার নিন্দা করিয়া সন্তোষলাভ করে, তাহা-হইলে, আমি যে তাহার প্রতি (তাহার সন্তোষবিধান রূপ) অনুগ্রহ করিলাম, তাহা করিতে আমাকে নিশ্চয়ই কোনও আয়াস ব্যয় করিতে হইল না। আর (দেখ) কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ, অন্যের সন্তোষবিধানের জন্য কষ্টে উপার্জ্জিত ধনও ব্যয় করিয়া থাকে।

সতত সুলভ দৈন্যে নিঃসুখে জীবলোকে,
যদি মম পরিবাদাৎ প্রীতিমাপ্নোতি কশ্চিৎ।
পরিবদতু যথেষ্টং মৎসমক্ষং তিরো বা
জনতি হি বহুদুঃখে দুর্লভঃ প্রীতিযোগঃ॥

এই সংসারে সুখ ত দেখাই যায় না, দুঃখ কিন্তু সকল সময়েই সুলভ। এইরূপ সংসারে যদি কেহ আমার নিন্দা করিয়া প্রীতিলাভ করে, তাহা হইলে সে আমার সমক্ষেই হউক, আমার অসাক্ষাতেই হউক, যত ইচ্ছা নিন্দা করুক, কেননা দুঃখবহুল এই সংসারে আনন্দলাভ অতি দুর্ঘট।

অবমান যে ভূষণ স্বরূপ হইতে পারে তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। যথা—

তথা চরেত বৈ যোগী সতাং ধর্ম্মমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্॥ (২)

(নারদ পারিব্রাজকোপনিষৎ ৫।৩০)।

---

(১) অনুসন্ধানে জানাগেল, এই অত্যুপাদেয় প্রাচীন গ্রন্থখানি বিলুপ্ত প্রায়; ইহার একখানি অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি তঞ্জোর পুস্তকালয়ে আছে। তাহার সংখ্যা ৯৭৪৮।

(২) বৈশাখ ২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

যোগী সাধুগণের ধর্ম্ম দূষিত না করিয়া (অর্থাৎ মিথ্যাচরণাদি বর্জ্জন করিয়া) এইরূপ আচরণ করিবেন যাহাতে লোকে তাঁহার অবমাননা করে এবং তাঁহার সঙ্গে মিলিতে না আইসে।

যাজ্ঞবল্ক্য, উষস্ত প্রভৃতির যে অপর সম্বন্ধে নিজ নিজ এবং নিজ নিজ সম্বন্ধে অপরের, এই দুই প্রকারের বিদ্যামদ ছিল, সেই দুই প্রকার বিদ্যামদের প্রতীকার যেরূপ বিবেক দ্বারা করিতে হয়, ধনাভিলাষ ও ক্রোধ এই দুইয়ের প্রতীকারও সেইরূপ বিবেক দ্বারা করিতে হইবে। এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে।

ধন সম্বন্ধে বিচার এইরূপে করিতে হইবে :—

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিপালনে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ ॥

(মহাভারত ? পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপ ১৩৯)।

অর্থের উপার্জ্জনে ক্লেশ আছে, রক্ষণেও সেইরূপ। অর্থ বিনষ্ট হইলে দুঃখ, ব্যয়িত হইয়া যাইলেও দুঃখ। অতএব (সর্ব্বথা) ক্লেশদায়ক অর্থকে ধিক্।

ক্রোধও দুই প্রকার যথা নিজের ক্রোধ অপরের উপর এবং অপরের ক্রোধ নিজের উপর। তন্মধ্যে (অপরের উপর) নিজের ক্রোধ সম্বন্ধে এইরূপ বিচার উপদিষ্ট হইয়াছে :—

অপকারিনি কোপশ্চেৎ কোপে কোপঃ কথংনতে।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষানাং প্রসহ্য পরিপন্থিনি ॥

(যজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ২০)।

সমুদ্রে ডুব দিয়াও যদি রত্ন না পাও—তবে উহার দোষ দিও না—দোষ সম্পূর্ণ তোমার।—ফেরদুসী।

মহিলা শিক্ষা গোষ্ঠি

(শ্রীমতী সত্যবালা দেবী)

চাই অগাধ অপরিসীম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা দ্বারা যমকেও জয় করা যায়! এই মৃতজাতি যদি বাঁচে সে ঐ শ্রদ্ধা দ্বারাই বাঁচিবে! শ্রদ্ধার পরিণাম সম্মান। আপনাকে সম্মান করিতে পারিলে তবেই মানুষ পরকে সম্মান করিতে শিখে। এই সম্মান হইতেই কর্ত্তব্য বোধ—কর্ত্তব্য বোধ হইতেই দায়ীত্ব বুদ্ধি। দায়ীত্ব বুদ্ধি না থাকিলে মানুষ সকল কর্ম্মেই অক্ষম। নাবালকের দায়ীত্ব বুদ্ধি নাই—সে বস্তু তাহার হইয়া যাঁহাতে বর্ত্তে তিনিই তাহার অভিভাবক। অভিভাবকই নাবালকের গতি। তিনিই তাহার আশ্রয়স্থল।

মেয়েরা মনুষ্যত্বের আদালতে এখনও অস্মদ্দেশে সাবালক সাব্যস্ত হয় নাই। কিন্তু চিরদিনের জন্যও তাহাদের আবার নাবালক হইয়া থাকা চলে না। নাবালক থাকিবার একটা সময়ের সীমা প্রকৃতি বাঁধিয়া দিয়াছেন। সেই সময় অতীত হইলে তিনি স্বভাবে এমন একটা বেগ সঞ্চারিত করিতে থাকেন, যে বেগ অভিভাবকের অভিভাবকত্বের সীমা লঙ্ঘন করিবার জন্য মনকে ভিতর দিক হইতে ক্রমাগত ঠেলিতে আরম্ভ করে। চলার মধ্যে যেমন পদক্ষেপ রূপ মাপকাঠি আছে, এই বেগ বাহিত হইয়া অভিভাবকের শাসনের সীমা লঙ্ঘন করাতেও তেমনি একটা মাপকাঠি আছে। সে মাপকাঠির নাম ঔচিত্য অর্থাৎ উচিৎ অনুচিৎ বিচার। পদক্ষেপের পরিমাণ অনুসারে না থাকিয়া চলিতে গেলে যেমন চলা হয় না, গড়াগড়ি দেওয়া হয়,—মাতালে যাহা করিয়া থাকে, তেমনি উচিৎ অনুচিৎ বিচারের বাধায় স্বভাবের বেগ নিয়মিত না হইলে অভিভাবককে উত্তীর্ণ হইবার অধিকার জন্মে না। সে ভাবে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করিয়া বসার নাম সাবালক হওয়া নহে, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠা।

তা বলিয়া, থামিয়া থামিয়া চলিতে হয় বলিয়া, থামাটা যেমন সত্য নহে বরং বলা যায় থামাটা চলার সত্য আর চলাটা পায়ের সত্য, তেমনি উচিৎ অনুচিৎ মানিয়া চলিতে হইবে বলিয়া উচিৎ অনুচিতের ধাঁধায় নির্ব্বাণ প্রাপ্তবৎ বসিয়া থাকাটাও সত্য নহে। এখানে বলিতে হইবে অভিভাবককে মানা সংসারের সত্য কিন্তু নিজে সাবালক হইয়া উঠাই জীবনের সত্য।

সংসার এবং জীবন উভয়ের সত্যকে মানুষ সেইখানে স্বীকার করিয়া চলিতেছে যেখানে নাবালকের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য অভিভাবকের অনুবর্ত্তীতা আর অভিভাবকের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নাবালককে শিক্ষা দান।

চলার চেয়ে পায়ের সত্য অনেক বড়, তেমনি সংসারের চেয়ে জীবনের সত্য অনেক বড়—স্পষ্ট এ কথা বুঝিয়াছিল বলিয়াই মানুষ শিক্ষা পদ্ধতির গঠন করিয়াছে।

শিক্ষার স্বাভাবিক ক্রমকে ভাঙ্গা চলে না। প্রথম, শ্রদ্ধা। দ্বিতীয়, আত্ম-সম্মান। তৃতীয়, পরের আত্ম-সম্মানের সহিত আপনার আত্ম-সম্মানের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিয়া চলা, অর্থাৎ শিষ্টাচার। চতুর্থ, কর্ত্তব্য-বোধ। পঞ্চম দায়িত্ব-বুদ্ধি। মনুষ্য প্রকৃতির গঠন অনুসারেই এই ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি মনের ভিতর হইতে একটা ঠেলা দিবেই। এই ক্রম অনুসারে পথ ঠিক করিয়া রাখা থাকিলে ঠিক পথে সমাজে জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে। পথ ঠিক নাই বলিয়া জীবন অপেক্ষা করিতে চাহে না,—বড় ও ছোটর মধ্যে যত দ্বন্দ্ব সমস্তই এই নিয়ম আছে বলিয়াই হয়। ফলতঃ দ্বন্দ্ব বিদ্রোহ প্রভৃতি এই ক্রমের মেরামত ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ক্রম ভাঙ্গিলেই তাহা আরম্ভ হয়—চলিত কথায় যাহাকে বলে গ্লানি (corruption)।

জীবনের সকল অবস্থাতেই এই ক্রম আছে সুতরাং যেমন তেমন আয়োজনেই শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। দেশের আর্থিক দারিদ্র্যকে আমি শিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায় বলিয়া গণনা করি না। আমি দেখিতেছি আমাদের শ্রদ্ধাহীনতাই শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। মন,

অশ্রদ্ধায় মরিয়া আছে বলিয়াই আমরা নিজের ও নিজেদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। বাহিরের তুচ্ছ আয়োজনের প্রতীক্ষায় অকর্ম্মণ্যের মত বসিয়া আছি। আমরা চাই বাঙ্গালীর মেয়ে আপনার প্রতিহত শ্রদ্ধা ভুলিয়া যাউক। "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।" শ্রদ্ধাসম্পন্না হইয়া আপনার পানে চাহিলেই তাহারা নিজেকে চিনিতে পারিবে। সমস্ত সমাজের দ্বারে আমাদের আবেদন তোমরা চেষ্টাকর, যেন আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও অপবিত্র নির্ব্বোধ জ্ঞানে ভয়ত্রস্ত ভাব মুছিয়া অন্ততঃ মুষ্টিমেয় রমণী জাগিয়া উঠে। কপর্দ্দকেরও প্রয়োজন নাই। তাহারা আত্মশক্তির সহায়ে স্বচেষ্টাবসেই ভারতের ঘরগুলিকে জাপানের আদর্শে গড়িয়া দিবে। যে অর্থ ও আয়োজনকে তোমরা বিশ্বাস করিতেছ আমি তাহাকে অনুমাত্রও বিশ্বাস করি না। যদি *মেয়েদের মন এইরূপ অবসাদগ্রস্ত থাকে, যদি মেয়েদের সম্বন্ধে দেশ* আপনার সংস্কার ও অভ্যাসগত হতশ্রদ্ধার ভাব পরিত্যাগ না করে, আমরা কোটী কোটী মুদ্রা হাতে পাইলেও স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের ভার হাতে লইতে সাহসী নহি। কিন্তু যেমন ভাবমণ্ডল চাহিতেছি তাহা পাইলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে ভারতের ঘরগুলি আমাদের জীবনকালের মধ্যেই গড়িয়া উঠিবে।

এ কথা এত জোরের সহিত বলিতেছি, কারণ, আমাদের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট বুঝিয়াছে জাতির মনের দিকে মেয়েদের নাবালক হইয়া থাকিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা হওয়াটাই স্বাভাবিক। উচ্চ অবস্থার অভাবে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ব্যবস্থার আশু প্রয়োজনীয়তা বা স্বাভাবিক বিকাশকে অগ্রাহ্য করা Gross blunder, মস্ত ভুল—তা সে যত বড় হ্যাট কোট ধারী কর্ত্তাই হউন, তাঁহার বুদ্ধিকে আমি সমর্থন করিতে পারি না। মেয়েদের শিক্ষার জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, জেলায় জেলায় বেথুন কলেজ গড়িবার মত ফণ্ডের প্রতীক্ষা করিতে গেলে এখনও একশত বৎসর। এদিকে এই একশত বৎসরের মধ্যে বাহিরের পৃথিবী আমাদের সমাজকে, জাতিকে কতগুলা যে ধাক্কাদিবে তাহার স্থিরতা নাই। এখন স্পষ্টই দেখিতেছি

পুরুষ অটল হিমাদ্রি শৃঙ্গের মত থাকিয়া ধাক্কাগুলা হজম করিতে পারে না। ঝাঁকানি মেয়েদের উপরও বিলক্ষণ আসে। শিক্ষাদ্বারা সৎপথে চালাইবার ঠিক ঠাক ব্যবস্থা না রাখিলে তাহারা বিপথে যাইবেই—যদি নির্ব্বাণ লাভ করে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহারা নির্ব্বাণ লাভ করে নাই। করিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট অল্প।

পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতেই তাহাদের শিখাইয়া লইতে হইবে। কেমন করিয়া যে হইবে সে স্কিম (উপায়) Arithmetical calculation এ আমরা ছকিয়া দিতে প্রস্তুত নহি। জানি, যদি আমাদের রচিত সেই স্কিম মনে লাগিয়া যায় গতানুগতিক সংস্কার সে থানাকে ইষ্টকবচ করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু আমরা তাহা চাহি না। আমি চাই মেয়েদের উপর অশ্রদ্ধা ভুলিয়া যাও। প্রথম ক্রম উত্তীর্ণ হও। দ্বিতীয় ক্রমের দৃশ্য চথে পড়িবে।

মেয়েরা কোনও কর্ম্মের নয় এই ধারণা যাঁহাদের হৃদয় বৃত্তি নিঃসারের উৎস—শিক্ষাগোষ্ঠিকে নূতন নূতন তাঁহাদের লইয়া ছুঁৎ মার্গ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বেশী দিন নহে। চারাগাছটিকে মুড়াইয়া খাওয়ার অবস্থাটুকু ভালয় ভালয় কাটিয়া যাইতে দেওয়া পর্য্যন্ত। ভারতের তপস্যার ভাণ্ডারে মেয়েদের আত্মশক্তির বীজ জমা করা আছে। বীজটুকু অঙ্কুরিত হইবার জন্য একটু সরস ভূমি নির্ম্মেঘ রৌদ্র—অর্থাৎ অনুকূল দেশকাল প্রয়োজন হইবে বৈ কি! তারপর, গুঁড়িটুকু মাথাচাড়া দিয়া শক্ত সমর্থ হইয়া উপরে ডালপালা মেলিয়া ধরিলে, তথন, অমন বস্তু তাহার অঙ্গে বাঁধা থাকিয়াও চরিয়া ধরণীর তৃণভোজন করিতে পারে, নারী-শক্তির বিকাশ ক্ষুণ্ণ হইবে না।

মেয়েরা ঘরকন্নায় যাহা করিতেছে সত্যই পুরুষে তাহা পারে না। বাহিরে যাহা যাহা পারে না বলিয়া, বুঝিয়া আছে সে বুঝিয়া থাকাটা অনেকটা Hypnotismএরই ঘোর। বিশ্বজগতে মেয়েরা অনেক কিছু

করিতেছে,—করিতে পারেও। তোমরা পৃথিবীতে নবযুগ আনিতে মানব স্বভাবের যে আমূল পরিবর্ত্তন কল্পনা করিতেছ, সে স্বভাব পুরুষের মস্তিষ্ক মধ্যে Manufactured হইবার নহে। সেখানে ঐ স্বভাবের লক্ষণ নিরূপক Ideaগুলির Academic developement and arrangement ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। মানব স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন যেখানে আরম্ভ হয় সে একটা স্থান in mysterious unfathomable depth.

মস্তিষ্ক বহির্জ্জগতের সংজ্ঞাগুলিকে বুদ্ধির সাহায্যে দেশকাল অনুসারে সাজাইতেছে,—কোনটারও সহিত কোনটার মিল বা যোগ নাই, তবুও, সমস্ত এক। এই এক জিনিষটা কি? জিনিষটা যে কি তাহা আমারাও জানিতে পারি না, ধরিতে পরি না, বুঝিতে পারি না। বরং সেইটা হইতেই আমরা জানিতে ধরিতে বুঝিতে পারিতেছি। বাঁটালি কাঠ কুঁদিয়া ত্রিকোন, চতুষ্কোন, সুগোল বিবিধ আকার প্রস্তুত করে সেগুলিকে দেখিয়া বাঁটালির আকার ঠিক করা চলে না তেমনি জানা, ধরা, বুঝা প্রভৃতির হেতু বলিয়া সেই এক যে কিরূপ তাহা ঠিক করা চলে না। এক উহাদের হইতে সম্পূর্ণ অতীত।

পুরুষ যাহা করিতেছে ও করিবে সে ত Literary discussion। সে ত ঐ বুদ্ধির স্তর ঐ দেশকাল অনুসারে সাজানর কাজ যেন মনোময় কোষের পর্দ্দার উপর সংজ্ঞাগুলির বায়স্কোপ চলিতেছে! canvas screen যদি চেতন জীব হইত তাহার cameraর উপর যতখানি দখল ও প্রভাব থাকা সম্ভব জগতে বুদ্ধিরও ঐ একের উপর ততখানি হাত।

মেয়েদের বুদ্ধি কম। বুদ্ধি জিনিষটা কি যদি ঠিক জানিতে পারিলাম তবে বুদ্ধি কম কেবল এই টুকুর জন্যই তাহাদের কেমন করিয়া অভিশপ্ত করিয়া রাখিতে পারি? অন্ধের দৃষ্টি শক্তি নাই কিন্তু দৃষ্টি শক্তি যে শক্তির agency সেটা অন্ধেতে এমন তীক্ষ্ণভাবে বিকশিত যে, চোখে না দেখিলেও তাহারা দেখিতে পাইবার কাজ চালাইয়া লইতে পারে। হয় ত মেয়েরা বুদ্ধির বায়স্কোপের ঐ পর্দ্দাখানাকে অনুভব তত তীক্ষ্ণভাবে

করে না, কিন্তু, পর্দ্দা হইতে বিশেষ কিছুকে আরও তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়া থাকে।

সময়ে সময়ে আমরা ক্ষিপ্তবৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি কিংবা দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়ি, তখন সহসা যেন যুক্তি তর্কের জাল ছিন্ন হইয়া যায়। সে সময় এমন কিছু করিয়া ফেলি যে কায ঐ সময় ভিন্ন অন্য সময়ে করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। চলিত কথায় এই অবস্থাকে বলে আঁতে ঘা লাগা। একাগ্রমনে এই অবস্থাটাকে অনুভব করিতে পার ত নিজের জীবনের কোনও ঘটনা লইয়া একবার ধ্যানে বসিয়া যাও। দেখ সে সময়ে ঐ ক্রোধ কিংবা দুঃখ যাহা হউক একটা সংজ্ঞা তোমার যুক্তি তর্ক ধারণার জাল ছিন্ন করিয়া তোমার অতি গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত গিয়া পরম গোপন একটা কিসে স্পর্শ করিয়াছিল। করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তোমার সমস্তটা কেবলমাত্র ঐ সংজ্ঞাস্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল,—আর সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য; অন্তর্জগৎ বহির্জগৎ কোথায় যে সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়াছিল তাহা তুমি জান না। কেবল এইমাত্র মনে আছে যে ঐ বস্তুটীর স্পর্শ মাত্র সেই অন্তঃপ্রবিষ্ট সংজ্ঞাটী এমন প্রভূত বলশালী হইয়াছিল যে সে বল তোমার নিত্যকার জীবনের বস্তু নহে। ঐ যে গুপ্ত মহাশক্তির আধারটী যাহা তোমার অথচ তোমার নহে,—তোমাতে আছে অথচ থাকিয়াও নাই ঐটীর সহিত মেয়েদের চরিত্র একটু কাছাকাছি বেশী থাকে। পুরুষের সংজ্ঞা যুক্তি তর্ক ধারণার জাল সহসা ছিন্ন করে না প্রতিপদে অন্তঃপ্রবিষ্টও হয় না। পৃথিবীর প্রভাব প্রতিপত্তি অবস্থা সমস্তই ঐ যুক্তি তর্ক ধারণার স্তরে প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি তর্কের হিসাব নির্ভুল বলিয়া, ধারণা নিশ্চিত বলিয়া পুরুষের অনুকূল অবস্থা ও স্থায়ী প্রভাব প্রতিপত্তি জমিয়া গিয়াছে। নারীর ক্রোধ, দুঃখ, মান, অভিমান, স্নেহ মমতা কেবলি যুক্তিতর্ক ধারণার জালকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিতেছে। পৃথিবীতে নারী মহাশক্তি বিড়ম্বনা সঞ্জাত দুর্ব্বলতার জন্যই সৃষ্টির আদি কাল হইতে আমরা আজ পর্য্যন্ত আপনার স্থান আপনি করিয়া লইতে পারি নাই।

নারী ও নরে ইহাই বস্তুগত পার্থক্য। পুরুষত্বের মাপ্‌কাঠিতে নারী দুর্ব্বলা। নারীত্বের মাপ্‌কাঠি দিয়া মাপিলে পুরুষও ঐ পরিমাণ দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইবে। এখন কে কাহাকে দাবিয়া রাখিয়াছে? নিরপেক্ষ হইয়া বলিলে এই কথা বলা ভিন্ন গত্যন্তর নাই যে দাবিতে গেলে উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়মে উভয়কে দাবিয়া বসিবে। আবার বাড়াইলে উভয়েই উভয়কে বাড়াইবে। জগতে এমন কোনও দেশ নাই যেখানে পুরুষ কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য দুর্দ্দশার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার বুদ্ধি বলে সে এমন উৎরিতে পারিয়াছে যে, সে দুর্দ্দশা সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও স্পর্শ করে নাই। নারীর পক্ষেও সেই কথা। মোট কথা পরস্পর অনুকূল ভাব সমাজের উন্নত অবস্থা। পরস্পরের আচার ব্যবহারে যখন নির্ম্মমতা অবিবেচনা অবিশ্বাস ফুটিয়া উঠে তখন বুঝিতে হইবে সমাজের অবনতি প্রবলবেগে চলিতেছে,—এ সমাজ এমন ভাবে অধিক দিন আর থাকিবার নহে। পরস্পরের হৃদয়ের নিবিড় সংযোগ স্থলে যে মধুচক্র রচিয়া উঠে জাতির শ্রী সভ্যতা স্বজাতীয়তা তাহারি মধ্যে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। ঐ মধুচক্র ভাঙ্গিয়া গেলে ব্যক্তির জীবন কেন্দ্র হীন, পরিবারের অবস্থা লক্ষ্মীছাড়া সমাজের অবস্থা অমঙ্গলের আবাস ভূমি এবং দেশের অবস্থা দুঃখ দুর্দ্দশার আকর হইয়া উঠে। আমাদের যদি এই অবস্থা হয় তবে এ সমাজ ব্যবস্থা কিছুতেই বজায় থাকিবার নহে। ভাঙ্গিবেই এবং আবার গড়িয়া উঠিবেই। সেই ভাঙ্গাগড়ার পরপারেই আমরা দেশের উন্নতির মুখ দেখিব।

প্রতি জনে যোগ্য কর্ম্ম প্রতি জনে যোগ্য পুরস্কার,—
ভাগ্য রহে দিতে;
যে পোষে বিশ্বের প্রাণ, বিসর্জ্জন করি’ আপনার,—
মরে সে বাঁচিতে।

—সুইন্‌বার্ণ।

কাপাস চাষ।

(স্বামী কেশবানন্দ।)

(১)

গাছ কাপাস।

যে অঞ্চলে সেচন বা অন্য প্রকারে ক্ষেত্রে জল দিবার উপায় নাই সেই অঞ্চলে উচ্চ ভূমিতে অথবা ডাঙ্গায় বৈশাখের শেষ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে এই কাপাশ লাগাইলে সুবিধা হয়। বৈশাখে বৃষ্টির জলে মাটী ভিজিবার 'বাত' হইলে কোদালী দ্বারা তিন হাত অন্তর এক হাত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া মাটীর সহিত চূর্ণ গোবর সার মিশাইয়া গর্ত্ত গুলি পূর্ণ করতঃ—প্রত্যেক থানায় দুইটী করিয়া বীজ পুঁতিতে হয়। উর্ব্বরা মাটী হইলে বেশী গোবর সার দিতে হয় না এবং গর্ত্তও গভীর করিবার আবশ্যক নাই। (আমরা দেখিয়াছি অনেক উর্ব্বরা ডাঙ্গা পতিত অবস্থায় রহিয়াছে।) এইরূপ উর্ব্বরা ক্ষেত্রে কাপাস গাছের থানার বাহিরের জায়গা খুঁড়িয়া চীনা বাদামও লাগান যাইতে পারে।

গাছ বাহির হইয়া কিছু বড় হইলেই প্রতি থানায় একটী করিয়া গাছ রাখিতে হয়। বর্ষার জল পাইয়া গাছগুলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, দেখিতে হইবে গাছের গোড়ায় জল না দাঁড়ায় এবং গবাদি পশুতে নষ্ট করিয়া না ফেলে। সযত্নে রক্ষিত হইলে বর্ষান্তে ফুল ও কাপাশের মুছি ধরিয়া পৌষ মাসের শেষ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত কাপাস ফুটিতে থাকিবে। বৎসর বৎসর বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে খুঁড়িয়া দিলে এই কাপাস গাছেই ৪।৫ বৎসর কাপাস জন্মিয়া থাকে। বৎসরে প্রতি বিঘায় প্রায় গড়ে ৮।১০ মণ কাপাস উৎপন্ন হয়। প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বর্ষ হইতে কাপাসের ফসল বৃদ্ধি হয়।

দোআঁশ মাটী কাপাস চাষের পক্ষে ভাল এজন্য স্থান ভেদে কাপাসের গাছ ভাল মন্দ এবং ফলও কম বেশী হইয়া থাকে।

(২)

ক্ষেত্র কাপাসের চাষ।

আশ্বিন মাসে আশু ধান্য কাটিয়া বা অন্য কিছু ফসল থাকিলে তাহা তুলিয়া লইবার পর ক্ষেত্রে 'বাত' থাকিলে উপর্য্যুপরি দুইবার লাঙ্গল দিয়া

মাটী বেশ করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। কেননা বর্ষার ভিজা পচামাটী বেশ শুকাইলে শস্যোৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। ক্ষেতের মাটী বেশ শুকাইয়া আসিলে রীতিমত ভাল সেচন করিয়া মাটীগুলি ভিজাইতে হয়। কয়েকদিন পরে 'বাত' হইলে অর্থাৎ মাটী লাঙ্গল দিবার উপযুক্ত হইলে বিঘা-প্রতি ৩০।৩২ মণ চূর্ণ গোবর সার ছড়াইয়া লাঙ্গল দ্বারা ২।৩টী উন্টাপাল্টা চাষ দিতে হয় অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিমে একবার লাঙ্গল দিয়া দ্বিতীয়বারে উত্তর দক্ষিণে লাঙ্গল দিতে হয়। তারপর ঐরূপ উন্টাপাল্টা মই দিয়া ক্ষেত্রের মাটীগুলি বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া ৩।৪ দিন জমি ফেলিয়া রাখিতে হয়।

"ষোল চাষে মূলা, আট চাষে তুলা।
চারি চাষে ধান, বিনাচাষে পান॥"

আবার দুইটী চাষ ও মই দিয়া ক্ষেতের মাটিগুলি সমতল করিয়া লইতে হয়, যদি মই দ্বারা সমতল না হয় তাহা হইলে কোদালের দ্বারাও সমতল করা চলে। তারপর পুনরায় চারি অঙ্গুলি গভীর করিয়া লাঙ্গল দিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বপনের পূর্ব্বে কাপাশ বীজগুলি ৮।১০ ঘণ্টা কাল জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর তুলিয়া কাঁচা গোবর সহ থাসিয়া বীজগুলি ঝরঝরে করিয়া লইতে হয়।

কাপাস বীজ বপনের পর সরিষা, মুগ কি জারাবিরি যে কোন একটী রবিশস্যের বীজ এবং কাঁকুড়, তরমুজ ও খেড়ো বীজ কিছু কিছু মিশাইয়া বপন করিতে হয়। বপন শেষ হইলে বিপরীত দিক হইতে আর একবার লাঙ্গল দিয়া উন্টাপাল্টা মই দ্বারা সমতল করিয়া দিতে হয়। তৎপরে কোদালী দ্বারা পার্শ্বের মাটী সামান্য সামান্য টানিয়া লইয়া ৪ হাত অন্তর এক একটী দাঁড়া অর্থাৎ ক্ষেতের চূর্ণ মাটীর দ্বারা ছোট আলি তুলিয়া কয়েকটী পাট করিয়া দিতে হয়। তবে এই দাঁড়াগুলি যেন ক্ষেতের উচ্চদিক হইতে নীচের দিকে লম্বা হয়। ক্ষেতের ঐ উচ্চ দিকের বড় আলির নীচে একটী নালা করিয়া দিয়া নালার মাটী দ্বারা একটী শিয়র দাড়া করিয়া দিলে ক্ষেতে জল দিবার সুবিধা হয়।

প্রতি বিঘায় কাপাস বীজ পাঁচ সের, মুগ বা জারাবিরি কলাই বীজ পাঁচ সের এবং বিঘা প্রতি সরিষা পাঁচ ছটাক লাগে।

কাপাস বীজের সহিত যে কোন একটা রবি শস্যের বীজ বপন করিলে কাপাস গাছের কোন অপকার হয় না। কাপাস গাছ বড় হইবার পূর্ব্বেই মাঘ মাসের মধ্যে উক্ত রবিশস্য তুলিয়া লওয়া হয়। কাঁকুড় তরমুজাদি থাকিলেও কোন ক্ষতি হয় না।

কাপাস মুগ প্রভৃতি বপন করিবার পরে মাঘ মাস অর্থাৎ রবিশস্যটী তুলিয়া লওয়া পর্য্যন্ত ক্ষেতে জল দিতে হয় না তবে জলাভাবে শস্য গাছের ক্ষতি হইতেছে বুঝিলে সরিষা বা মুগের ফুল ধরিলে ক্ষেতে জল দেওয়া কর্ত্তব্য।

রবিশস্য তুলিয়া লইবার পর কাপাস ক্ষেতের মাটী খুঁড়িবার সুবিধা হইলে অর্থাৎ ধূলা মাটী থাকিলে আধ হাত গভীর করিয়া কোদালের দ্বারা খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত। মাটী শক্ত হইয়া গেলে ক্ষেতে জল দিয়া 'বাত' হইলে আধহাত গভীর করিয়া খুঁড়িতে হয়। কাপাস চারা গুলি ১ হাত ১ হাত অন্তর থাকা চাই। চারা ঘন বাহির হইলে কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নতুবা কাপাস কম ফলিবে। "গাছ গাছালী ঘন সবে না, গাছ হতে তার ফল হবে না।"

এইরূপে মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে জল দিয়া খোঁড়া হইলে কাপাস গাছ গুলি শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিবে ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতে ফুল ধরিয়া কাপাস মুচি ধরিতে থাকিবে। চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে মুচি ফাটিয়া কাপাস বাহির হইলে তুলিয়া আনিয়া শুষ্ক মুচি হইতে কাপাস বাছিয়া লওয়া হয়।

আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ বর্ষা লাগিবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত কাপাস আদায় করিয়া লইয়া আশুধান্য রোপনের জন্য কাপাস তুলিয়া দেয়। কোন কোন চাষী কাপাস হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত গাছ রাখিয়া দিয়া কাপাস আদায় করে এবং উক্ত ক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠ মাসে বিট কলাই বপণ করিয়া আর একটা ফসল আদায় করিয়া লয়। প্রতি বিঘায় প্রায় ৩।৪ মণ ক্ষেত কাপাস এবং মুগ বা জারাবিরি কলাই প্রায় চারিমণ জন্মিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সেই জমিতে আশু ধান্য ৮।১০ মণ উৎপন্ন হয়।

শান্তি অন্বেষণে।

(স্বামী নির্ব্বাণানন্দ)

প্রভাত-অরুণ প্রতিফলিত শুভ্র হিমগিরি, কুলু কুলু নিনাদিনী স্রোতস্বিনী, সুদূর প্রসারিত অচল নীলাম্বুরাশি, অগণন তারকা মণ্ডিত অনন্ত আকাশ, জ্যোৎস্নার বিমল হাসি, নির্ম্মল উষার স্নিগ্ধ সমীরণ, পত্রাভ্যন্তরচারী পবনের মৃদু মর্ম্মর ধ্বনী, বিহঙ্গের সুমধুর কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতসুধা, সুন্দর কুসুমরাশি বিতরিত মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ এবং ধন জন যৌবন, প্রকৃতির এ সবই সুন্দর এবং সুখকর। প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্যের উপবনে সুখের আশায় সকলেই আকৃষ্ট ও বিমোহিত। সিংহাসনোবিষ্ট রাজা হইতে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী সকলেই জগতে সুখের অন্বেষণে নিরন্তর ঘূর্ণায়মান। সুখসম্ভোগই মানুষের চির ঈপ্সিত এবং স্বভাবসিদ্ধ। সুখের বাসনা মানব-মনে নিরন্তরই জাগরুক। স্থূল, সূক্ষ্ম অনন্ত অনন্ত বাসনাশ্রেণী একটীর পর একটী করিয়া মানব-হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই বাসনার তৃপ্তি সাধনেই জগতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান। বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ জগতে কত কি করিতেছে। মনোহর পুষ্পোদ্যান, মণিরত্ন খচিত সুবৃহৎ অট্টালিকা, পণ্যবীথিকা সুসজ্জিত বিপুল নগরী, বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপটুতা এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার, এ সমস্তই মানবের বাসনাপ্রসূত।

এই পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, যাহাতে আমরা এত আসক্ত, তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তিত এবং বিনাশী; উহার বর্ত্তমানতা বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় চকিত দৃষ্টিতে অন্তর্হিত। সুখের বলিয়া যাহা গ্রহণ করিলাম, শান্তির আশায় যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি কালপ্রভাবে তাহা যেন দুর্ভেদ্য তমসাবরণে বিলীন হইতেছে। আজ যাহা দেখিতেছি, পাইতেছি কাল তাহা ধ্বংসীভূত। এইরূপে সৃজন প্রলয়, জন্ম মৃত্যু অনাদি কাল হইতে জগতে পরিলক্ষিত ও অপরিহার্য্য এবং অনন্তকাল এইরূপে চলিবে ইহাও সিদ্ধান্ত। এই অনন্ত সত্যের

অপ্রতিহত নিয়মনে ভোগ্য পদার্থের অবর্ত্তমানতা বা অভাব চিরকালই লক্ষ্যিত হইবে। একে একে সমস্ত জগৎ সম্ভোগও যদি সম্ভাবীত হয়, এ অভাব আকাঙ্ক্ষা ফুরাইবে না, বাসনার তৃপ্তি হইবে না।

ন যাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

কামনার উপভোগে বাসনার তৃপ্তি হয় না, অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় দিন দিন বাড়িতে থাকে। বিষয় সম্ভোগে বাসনা অতৃপ্ত এবং অভাব আকাঙ্ক্ষা থাকিবেই। যেখানে অভাব, দুঃখও সেখানে ছায়ার ন্যায় পরিলক্ষিত। জগতে ভোগও অনন্ত—দুঃখও অনন্ত। এ জগৎ দুঃখ পূর্ণ। আপাতঃ রমণীয় জাগতিক মোহে দুঃখই যেন সুখের মূর্ত্তি পরিগ্রহণে পরমাত্মীয়রূপে প্রকাশিত; সুখের মুখস পরিহিত হইয়া দুঃখই যেন জগৎ-রঙ্গমঞ্চে লীলাখেলা করিতেছে। ভ্রমবশতঃ আমরা যাহা সুখের মনে করিতেছি, বাস্তবিকপক্ষে তাহা দুঃখ পূর্ণ। জগতে দুঃখের সতত বিদ্যমানতা ধ্রুবতারার ন্যায় নিরন্তর পরিলক্ষিত। অনাদিকাল হইতে জগতে এই দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে কিন্তু দুঃখ যেমন তেমনই রহিয়াছে। উহা যেন সুদৃঢ় শৈলমালার ন্যায় সুখের চরম উৎকর্ষরূপ প্রবল আবর্ত্তের নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাতেও অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান। দুঃখের এই সুদৃঢ় শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করা বড়ই দুঃসাধ্য। অনুল্লঙ্ঘনীয় দুঃখের তীব্র দংশন বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও মানুষ মিথ্যা নশ্বর বিষয় গ্রহণে খাদ্যদৃষ্ট কুক্কুরের ন্যায় দ্রুত গতিতে ধাবমান। জীবনসংগ্রামে দুঃখই জয়ী এবং উহার অপ্রতিহত প্রভাব জগতে অনিবার্য্য জানিয়াও মানুষ তল্লাভে ভূয়োভূয়ঃ চেষ্টা করিতেছে এবং অশান্তি সাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে। কেন আমাদের এই অশান্তি? কিসে আমরা এত অসুখী? বাসনা হইতেই উহার উৎপত্তি। একটু কিছু অভাব বোধ হইতেছে, উহা পূর্ণ না হইলেই অনন্ত দুঃখ আসিবে। অভাব না থাকিলে, বাসনা না থাকিলে, দুঃখও থাকিবে না। এখানে একটা আপত্তি হইতেছে এই যে, বাসনা না থাকিলে জীবন ধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে

পারে। শরীর এবং ইন্দ্রিয়গত আমাদের এই জীবন সমুদ্রগামিনী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় বিষয়মুখী। উহা নিয়ত গতিতে বিষয় অভিমুখে চলিতে থাকিবেই। বাসনা ত্যাগ বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? বিষয় সম্ভোগ পরিহার। বিষয় বিমুখ ইন্দ্রিয় দাহিকাশক্তিহীন আগুনের ন্যায় অসম্ভব কল্পনা মাত্র। সুতরাং ইন্দ্রিয়গত আমাদের এই জীবনে বিষয় বাসনা থাকিবেই। এই বাসনার সংহার করিতে হইলেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। মৃত্যু কিম্বা আত্মহত্যা ভিন্ন সংসার ত্যাগের আর উপায় কি। এ আপত্তি ভ্রান্তি মূলক। সংসার পরিত্যাগ করা অর্থ মৃত্যু বা আত্মহত্যা নহে। সত্যকে জানিতে হইলে অসত্যকে ত্যাগ করিতে হইবে, ভাল জানিতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে। এখানে যেমন অসত্য বা মন্দ ত্যাগ করা—সত্য কিম্বা ভাল জানা বুঝায় সেইরূপ সংসার ত্যাগ অর্থে ভগবানকে জানা বুঝায়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন পশ্চিমদিকে এগুলে পূর্ব্বদিক আপনিই পিছনে পড়ে থাক্‌বে, ভগবানকে জান্‌লে সংসার আপনিই ত্যাগ হয়ে যাবে।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এখন আমাদের নিকট যেরূপে প্রতিভাত এবং যে ভাবে আমরা অনুমান করিতেছি তাহা নাট্য রঙ্গমঞ্চের ন্যায় আপাত রমণীয় এবং সর্ব্বৈব মিথ্যা। উহার কোনই অস্তিত্ব নাই। উহা আমাদিগের মরীচিকার জল সন্দর্শনে প্রধাবিত হরিণের ন্যায় ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে। এই ভ্রম দূর কর। জগতের প্রকৃতস্বরূপ, সেই ভগবানকে অবগত হও। "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি" ঈশ্বরই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে রহিয়াছেন। মানুষেও তিনি, পশুপক্ষীতেও তিনি রহিয়াছেন। বৃক্ষ পাষাণাদি স্থাবর জঙ্গমেও তিনিই অধিষ্ঠিত। সুখে দুঃখে তিনিই বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ড ভরা ব্রহ্মতে, জগৎ ভরা জগন্নাথে, তিনিই এই জগদ্রূপে প্রাকাশিত।

"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" ইত্যাদি

এইরূপে জগৎ ঈশ্বরের আচ্ছাদিত, এবং ভূতে ভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি প্রতিভাত হইলে তোমার সমস্ত ভার, সমস্ত চিন্তা বদলাইয়া যাইবে; তখন দেখিতে পাইবে তোমার অভাব, আকাঙ্ক্ষা ফুরাইয়াছে, বাসনা

কামনা নষ্ট হইয়াছে। বাসনা না থাকিলে কি হইবে? দেয়ালের ত বাসনা নেই। দেয়াল সুখ দুঃখও ভোগ করে না। এ কথা স্বীকার করি কিন্তু দেয়াল উন্নতিও করে না, যে দেয়াল সেই দেয়ালই থাকে। মানুষ উন্নতশীল। সুখদুঃখের সমষ্টিরূপ শিক্ষার ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ নিয়তই উন্নতির শিখর দেশে ক্রমশঃ আরোহণ করিতেছে। যে যত উন্নত তার সুখশান্তিও সেই পরিমাণে অধিক। উন্নতির চরম উৎকর্ষে চির সুখ, চির শান্তি বিরাজিত। এই আনন্দ সমুপস্থিত হইলে, ভক্তি সূর্য্যের কিরণ বিকিরণে চিদাকাশ উদ্ভাসিত হয়। তখন পত্রান্তরে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলাধারাবৎ নিরন্তর ভগবৎ স্মৃতি সমুৎপন্নে, বিষয় বাসনা, অভাব আকাঙ্ক্ষা, দুঃখকষ্ট ইত্যাদি জাগতিক, অতি ঘৃণ্য লীলাভিনয় স্মৃতির অতীত পথে গমন করে এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অনুভূত হয়।

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ।

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু উক্তিগুলি "শ্রীভগবান উবাচ" বলিয়া লিখিত। কোন স্থানেই শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ নাই। সুতরাং গীতা পড়িবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিৎ।

শ্রীমদ্ভাগবৎ বলেন "কৃষ্ণস্তঃ ভগবান স্বয়ং" অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই গীতার বক্তা শ্রীভগবান। "ভগ" শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ যিনি ঐশ্বর্য্যশালী তিনিই ভগবান। ঐশ্বর্য্য ষড়বিধ যথা—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রীয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব যন্নাং ভগ ইতি স্মৃতম্ ॥

অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ এই ছয়টি ভগশব্দ বাচ্য। যিনি একাধারে এই ছয়টির অধিকারী তিনিই শ্রীভগবান কিন্তু ঐশ্বর্য্য মাত্রই হ্রাসবৃদ্ধি যুক্ত সুতরাং বিনাশশীল। অতএব ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী ভগবান অবিনাশী নহেন। কিন্তু গীতায় ভগবান বলিতেছেন :—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ ॥ ১০ অঃ ২০ শ্লোক।

হে অর্জ্জুন, আমি ভূতগণের অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মা। আমিই ভূতসমুদয়ের আদি, মধ্য ও অন্তঃ অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুই আমি। আবার এই "আত্মাকে" অবিনাশী বলিতেছেন :—

অবিনাশী তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ গীতা ২য় ১৭।

যিনি এই সমুদয় ভূতাদি ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই সেই অব্যয় আত্মার বিনাশ করিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে গীতার বক্তা শ্রীভগবান বিনাশশীল নহেন। যেহেতু তিনি অব্যয়, অবিনাশী পরমাত্মা। সুতরাং তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালীও নহেন।

এখন দেখা যাক্ আত্মা বস্তুটি কি? গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে বলিতেছেন:—

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্ম জাত, অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম (অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্ত সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা) সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা তিনিই শ্রীভগবান এবং শ্রীভগবানই শ্রীকৃষ্ণ। অতএব ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণে প্রভেদ কোথায়?

আধুনিক অধিকাংশ বৈষ্ণব গ্রন্থেই দেখা যায় যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" রচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি শক্তি॥"

এখানে কবিরাজ গোস্বামীর মতে ব্রহ্ম বস্তুটি গোবিন্দের অঙ্গকান্তি বা রূপমাত্র সুতরাং রূপ ও রূপাধার এক পদার্থ নহে। অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় হইলেও "অঙ্গ" ও "কান্তিতে" পার্থক্য আছে। যেহেতু "অঙ্গকান্তি" সগুণ পদার্থ এবং গোবিন্দ নিগু্ণ। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে গোবিন্দকেও নিগু্ণ বলা যায় না, কারণ তাঁহারও অঙ্গ আছে। অঙ্গ বা মূর্ত্তি কখনই নিগু্ণ হইতে পারে না। নিম্নে শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম উদ্ধৃত করিলাম যথাঃ—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

অর্থাৎ গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতার্থ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দকে নমস্কার নমস্কার। এখানে ব্রহ্মণ্যদেব ও গোবিন্দ এই দুইটি শব্দই শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম, গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ পৃথক নহেন। এখন দেখা যাক্ শ্রীকৃষ্ণ বস্তুটি প্রকৃত কি? বৈষ্ণবেরা বলেন "ব্রজেন্দ্র নন্দন, যশোদাদুলাল" শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। কিন্তু উপরে দেখাইয়াছি যে "কৃষ্ণস্তুঃ ভগবান স্বয়ং" অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীভগবানই শ্রীকৃষ্ণ। নতুবা "শ্রীকৃষ্ণই ভগবান" এইরূপ লেখা উচিৎ ছিল। কিন্তু তাহা হইলে ভাগবৎ বাক্য ব্যর্থ হয়। কেবল মাত্র যশোদানন্দন কৃষ্ণ কখনই ভগবান হইতে পারেন না যেহেতু তিনি একটি গোপবালক মাত্র সাধারণ মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। সুতরাং এ হিসাবে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কিছুই থাকে না। কিন্তু তাহা নহে, ভাগবৎ বাক্য অখণ্ডনীয় অতএব শ্রীভগবানই শ্রীকৃষ্ণ। এ ভগবান আবার ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নহেন যেহেতু ইনি পূর্ণব্রহ্ম। সেই গুণাতিত অক্ষর পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীভগবানই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহাই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বলোক পূজিত পরম পুরুষ। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে কৃষ্ণকে পৃথক করিলে কৃষ্ণের

শ্রীকৃষ্ণত্ব থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত যে ব্রহ্ম তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। যথাঃ—

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, তিন তাঁর রূপ॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে,
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

এই শ্লোক অনুসারে বুঝিতে হইবে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব অর্থাৎ যাবৎ জীবের ব্রহ্ম জ্ঞান না হয় তাবৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপত্ব উপলব্ধি হয় না। অতএব ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা, আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ব্রহ্মই পূর্ণ শ্রীভগবান। অতএব পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানই শ্রীকৃষ্ণ।

পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখন একমাত্র পরব্রহ্মই ছিলেন। এই ব্রহ্ম শব্দের পূর্ব্বে আর কোন শব্দ বা উপাধি ছিল না। কৃষ্ণ শব্দ ও ব্রহ্ম শব্দের পরবর্ত্তী। ব্রহ্মকে আবার সনাতন কহে যথা ব্রহ্মসনাতনং ৭ম আদি। সুতরাং ব্রহ্মই যে সৃষ্টির আদি কারণ তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রহ্মপদার্থ টি শ্রীকৃষ্ণের, "অঙ্গকান্তি" মাত্র নহেন।

সৃষ্টি প্রকরণে দেখা যায় যে পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবা মাত্র "মায়ার" সৃষ্টি হইল। মায়া, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের আধার। এই তিন গুণে বিভিন্ন শক্তিমান তিন দেবতা আবির্ভূত হইলেন। রজোগুণে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা ; সত্ত্বগুণে বিষ্ণু পালন বা রক্ষাকর্ত্তা এবং তমোগুণে শিব বা মহেশ্বর সংহার কর্ত্তা। ইহাঁদের কেহই একাধিক গুণশক্তির পরিচালনে সমর্থ নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা পালন বা লয় করিতে পারেন না, সেইরূপ বিষ্ণুরও সৃষ্টি ও ধ্বংশশক্তি নাই এবং শিবও সৃষ্টি ও পালনে অক্ষম। কিন্তু এই গুণত্রয় সমষ্টি, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর নামে অভিহিত। ঈশ্বর একাধারে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্ত্তা। তাহা হইলে দেখা গেল

যে সৃষ্টির আদিকারণ 'ব্রহ্ম' হইতে 'মায়া', মায়া হইতে 'গুণত্রয়' এবং গুণত্রয় হইতে যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতগণের সৃষ্টি হইয়াছে।

পরব্রহ্মের প্রকৃতি দুইভাগে বিভক্ত "সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ"। সবিশেষ ব্রহ্ম অর্থাৎ গুণময়ি ব্যক্তাবস্থা আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অর্থাৎ নিগুর্ণ, অচিন্ত, মনোবুদ্ধির অগোচর অব্যক্তাবস্থা। "পরমেশ্বরই ব্রহ্মের স্বগুণ ও স্বপ্রকাশরূপ, ইনিই লীলচ্ছলে বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া জগতে আবিভূর্ত হন। তাঁহাকেই অবতার বলে। ইনি কখন আংশিক শক্তি বিকাশে, কখন বা পূর্ণপ্রভাবে অবতীর্ণ হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান করেন; এই পূর্ণশক্তি সম্পন্ন ঈশ্বরই শ্রীকৃষ্ণরূপে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। তাহাই গীতায় বলিয়াছেন :—যদা যদাহি ধর্ম্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্ত তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪ অঃ ৭ শ্লোক।

হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি (দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই) অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম পরমকারুণিক শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদিগকে দমন করেন।

ওঁ তৎ সৎ।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

নিম্ন ও পতিত জাতি।—শ্রীমধুসূদন কাব্যব্যাকরণ তীর্থ প্রণীত। নিম্ন ও পতিত জাতির অভিযোগ ও তাহাদের প্রতি অবিচার—লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, নিম্নত্ব ও পাতিত্যের অবৈধতা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া, তাহাদের প্রতি সামাজিক নির্য্যাতনের কঠোরতা, বর্ণগত-বৈষম্য সামাজিক সমবেত ক্রমবিকাশের অন্তরায় এবং কি প্রকারে তাহাদের উন্নতি সাধন করিতে হইবে তাহা তিনি এই পুস্তকে দেখাইয়াছেন। প্রতি দেশহিতৈষীর ইহা পাঠ্য। প্রাপ্তিস্থান ১৮৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

রামকৃষ্ণ মনঃ শিক্ষা।—ভক্ত অন্নদাঠাকুর দ্বারা প্রাপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী অবলম্বনে নানা ধর্ম্মোপদেশ কবিতায় লিখিত। মূল্য এক টাকা।

তত্ত্ব সমালোচনা।—শাঙ্কর মত নূতন ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত ও তুলনা করা হইয়াছে। প্রতি দর্শন-রসাস্বাদীর ইহা অবশ্য পাঠ্য। "উপাধ্যায় তিলক" শ্রীমতিলাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম, এ, প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

১। বিবেকানন্দ সোসাইটীর ১৯২০ সালের কার্য্য বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বৎসর ৩৮টী ধর্ম্মসভা, শ্রীবুদ্ধ ও বিবেকানন্দের জন্মোপলক্ষে বিশেষ সভার অধিবেশন, খৃষ্ট, রামকৃষ্ণ এবং সারদাদেবীর জন্মোপলক্ষে বিশেষ পূজা, সহরের বিভিন্ন পল্লীতে ১৩টী বিশেষ ধর্ম্মালোচনা সভা, সোসাইটী গৃহে ৩০টী সপ্তাহিক অধিবেশন, ৯৯৮টী রোগীর চিকিৎসা ও ৩১টী গরীব ছাত্রকে মাসিক বৃত্তিদান কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সোসাইটী গৃহে নিয়মিত ধ্যান ধারণা পাঠাদিও হইয়া থাকে। এখানকার লাইব্রেরীতে এই বর্ষে ২৩২২ খানি পুস্তক ছিল। কয়েকটী সেচ্ছাসেবক দক্ষিণ বারাসতের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাবে সেবাকার্য্য করিয়াছেন। উহার মোট সভ্য সংখ্যা ৪৭৮, পাঠাগারের গ্রাহক ৪৫ জন।

২। রেঙ্গুনের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১৯২১ সালের ৩০শে জানুয়ারী হইতে জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০০ রোগী ঔষধ, পথ্য, ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বেলিয়াতি গ্রামে নিম্ন ও পতিত জাতির শিক্ষার জন্য রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

৪। আমরা পূর্ব্বে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে স্বদেশে ফিরিতেছেন উদ্বোধন পাঠকদের জ্ঞাত করিয়াছি। তিনি ২৪শে সেপ্টেম্বর টাণ্ডা নামক জাহাজে সিঙ্গাপুরে অবতরণ করেন। কোয়ালা লামপুর, সিরেমবান এবং সিঙ্গাপুরের হিন্দু সমাজ হইতে তাঁহার অভ্যর্থনা করা হয়। তিনি বর্ত্তমানে রেঙ্গুন পৌঁছিয়াছেন। তথায় গত ১৮ই অক্টোবর তারিখে জুবিলী হলে তাঁহাকে আবাহন করা হয়। ঐস্থলে পরে তিনি 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম' ও 'শ্রীবুদ্ধের' বাণী নামক দুইটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। পরে রেঙ্গুন হইতে এ্যাঙ্গোরা নামক জাহাজে, বৃহস্পতিবার, ১০ই নবেম্বর কলিকাতা আউট্রাম ঘাটে তিনি অবতীর্ণ হন। বেলুড়মঠ, উদ্বোধন কার্য্যালয়, রামকৃষ্ণ ষ্টুডেণ্টস্ হোম, ভবানীপুর মঠ, বিবেকানন্দ সোসাইটী প্রভৃতির সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ ও রামকৃষ্ণ ভক্তগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে তিনি বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন। বিবেকানন্দ সোসাইটীর তরপ হইতে শীঘ্রই তাঁহাকে এক বিশেষ অভিনন্দন দেওয়া হইবে। কলিকাতার জনসাধারণ পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শ্রবণে উৎসুক। আশা করি আমরা তাঁহার সুললিত বক্তৃতাবলী বহুবার শ্রবণ করিব। তাঁহার ইচ্ছা শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সহিত দেখা করিয়া তিনি মায়াবতী গমন করিবেন।

৫। গত ফাল্গুন মাসের উদ্বোধনে মহিশূর গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এণ্ড ম্যারেজ এসিওরেন্স কোম্পানী রামকৃষ্ণ মিশনের লোকহিতকর কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিবেন এইরূপ বিজ্ঞাপিত হয়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম বিজ্ঞাপনে প্রচার করিলেও উক্ত কোম্পানী আজ পর্য্যন্ত মিশনের সহিত আদৌ ঐরূপ কোন সংস্রবে আসেন নাই। গ্রাহকমণ্ডলীর অবগতির জন্য ইহা অধুনা পত্রস্থ করিতে বাধ্য হইলাম।

অন্তিম কামনা।

(শ্রীমতী মলিনাবালা দাসী)

দিবা অবসান আশা ম্রিয়মান
এ জীবনে দেখা হলো না হলো না।
দীরঘ দিবস আছিনু চাহিয়া
আশা পথ পানে বিফল বাসনা ॥
উষার আলোকে চপলা প্রকৃতি
আকুল বিহগ করে কল-গীতি
এনে দেয় মনে তাঁহারি যে স্মৃতি
প্রেমভরা হৃদি মধুর নিশানা ॥
প্রভাত-কুসুমে সুধামাখা হাসি
ধীর সমীরণে সুরভির রাশি
নীরবে শ্রবণে কহে যেন আসি
সে যে গো আমার নহেত অজানা ॥
মধ্যাহ্ন ভাস্কর ভাস্বর কিরণে
প্রসুপ্ত নিশীথে নীরবতা সনে
মহিমা মণ্ডিত সুরভি মোহনে
ভেসে উঠে মনে পাসরি আপনা ॥
ঘোর দুঃখ দৈন্যে গভীর বেদনে
ব্যাকুলতাময় প্রবাস জীবনে
নিরাশার মাঝে আশার সিঞ্চনে
দিয়াছে কতই মধুর সান্ত্বনা ॥
আজি এ শয়নে নয়নে আমার
ভাসিছে গো যবে তমো-পারাবার
কোথা ওহে প্রভু করুণা-আধার
জাগ আসি হৃদে অন্তিমে কামনা ॥

কথাপ্রসঙ্গে।

যদি আমার প্রিয় যেদিকে মুখ করে আমার দিকে আসছেন, আমিও যদি মিলনের জন্য সেই একই দিকে মুখ করে দৌড়াই, তবে মিলন সম্ভব নয়। আমাদের পরস্পরকে বিপরীত মুখী হয়ে যেতে হবে তবেই মিলন সম্ভব। তাই, শ্রীভগবান নিত্য থেকে লীলার দিকে নেবে এসেছেন বলে—ভক্তকে লীলা থেকে নিত্যের দিকে যেতে হবে; তবেই ভক্ত ভগবানে মিলন হবে—এই বিপরীত পন্থায়।

* * *

অরূপ ভগবানের লীলা বিলাস হ'ল রূপেতে, গানেতে, তাই তিনি অরূপ হয়েও এই বিশ্বের ছন্দে ও রূপে নেমে এসেছেন। কিন্তু ভক্ত কখন নামরূপে তৃপ্ত হতে পারে না, কারণ, তারা এই নামরূপের যে প্রাণ—অনন্ত—তাঁকে জানে না; তাই সে নামরূপের কারাগার ভেঙে মুক্ত হতে চায়—অনন্তকে জান্‌তে চায়। এই মুক্তির পথে তাই বিপরীত পন্থায় জীবের আনন্দ, আর মুক্তেশ্বরের বন্ধন-লীলায় এত আনন্দ।

* * *

অনন্ত-শক্তি খণ্ড-শক্তিতে বিভক্ত হয়ে খেলা করেন; যশোদার বন্ধন তাঁর ছিন্ন করবার শক্তি নাই, ত্রিপাদে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল আবরণকারীর সাগর-গোষ্পদ লঙ্ঘনে আকুল হতে হয় আর তাতেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু অল্প শক্তি চায় এক লাফে সাগরপারে যেতে, সূর্য্যকে কুক্ষিগত করতে, সে নিজে রথী হয়ে শ্রীভগবানকে করে তার সারথী। এই বিপরীত পন্থায় যে মিলন—সে মিলন মণি-কাঞ্চনের সংযোগ।

দুরন্ত বালিকার মত পৃথিবী পালাতে চায় ছুটে—সূর্য্য রাখে তারে ধরে, নদী ঢালে জল সমুদ্রের পদতলে—সে জল দেয় সে ফুৎকারে আকাশে তুলে, মেঘ ঢালে জল পর্ব্বতশিরে—অশ্রুর মত ঢালে সে তারে তটিনীর বক্ষে, চাতক চায় উর্দ্ধে মেঘের পানে—মেঘ ঢালে জল নিম্নে। এই বৈপরীত্যেই জগদ্‌বৈচিত্র্য প্রতিষ্ঠিত।

* * *

ভাবুকের হৃদয় ভাবে ও আনন্দে পূর্ণ হয় তখন সে আনন্দ ও ভাব উছলিয়া ওঠে কণ্ঠের মধ্য দিয়ে রাগিণীতে, অঙ্গুলির মধ্য দিয়ে বীণার তন্ত্রীর ঝঙ্কারে। কিন্তু শ্রোতা ঝঙ্কার ও রগিণীর মধ্য দিয়ে ভাব ও আনন্দের রাজ্য পায়—এই বিপরীত পন্থায়।

* * *

ভক্ত ও ভগবানের, রূপ ও অরূপের, অনন্ত ও সান্তের, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের, শব্দ ও ভাবের বিপরীত পন্থা যিনি জেনেছেন তিনিই সম্যক্‌ বেত্তা—জগদ্‌রহস্যের অবগুণ্ঠন তাঁরই চখের ওপর থেকে অপসারিত হয়ে যথার্থ সত্য যা তারি প্রকাশ দিয়ে তাঁকে অতিবাদী করে—তাঁকে ভূমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

"কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, "বুঝি, কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।" হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে সে ভাল মন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি বিচার, শাস্ত্র বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গে যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

—বিবেকানন্দ।

অভিনন্দন।*

ধন্য আজিকে হয়েছি আমরা
    হৃদয়ে মোদের কি আনন্দ
দীর্ঘ দিনের প্রবাস হইতে—
    ফিরেছে বঙ্গে "অভেদানন্দ"
চল নরনারী চল ত্বরা করি
    লইগে শরণ চরণে তাঁর
দেবতা মোদের আসিয়াছে আজ
    চল করিবারে নমস্কার।
স্বাগত হে মুক্ত পুরুষ—
    জাগ্রত কর সুপ্তপ্রাণ
তব আহ্বানে নরনারী আনে
    করিতে "হৃদয়-অর্ঘ্য" দান।
তব আগমনে সকলের প্রাণে
    আজি এ নূতন কিসের হর্ষ?
ধন্য তোমারে বক্ষে ধরিয়া—
    জননী মোদের ভারতবর্ষ।
বেদান্তের গূঢ় রহস্য প্রচারে
    সহেছিলে তুমি অশেষ ক্লেশ
ধন্য কোরেছো সকল মানবে
    ধন্য কোরেছো সকল দেশ।
বাজাও শঙ্খ ওগো পুরনারী
    বাজুক মৃদঙ্গ ঘনঘোর রোলে

---

* পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী অভেদানন্দের ভারতে শুভ পদার্পণে জনাই বৈদান্তিক সেবক-সঙ্ঘ এই কবিতাটী পাঠাইয়াছেন।

দেবতা মোদের মন্দির দ্বারে
বরণ করিয়া লহগো তুলে।
মন্দির দ্বার মুক্ত করিয়া
রেখেছি তোমারি তরে
পূজার অর্ঘ্য রয়েছে সাজান
এস হে মোদের ঘরে।
যদিও গো হীন হয়েছিনু মোরা
তবুও মোরা তোমারি ছেলে
পিতা হয়ে তুমি নিদয় হয়োনা
যেও না—আর চরণে ঠেলে।
(মোদের) হৃদয়-বীণাটী ছিল এতদিন
তন্ত্রী বিহীন পড়িয়া—
এসেছ যদি হে তব পরশনে
উঠিবে আবার বাজিয়া।
দেখগো দাঁড়ায়ে কত নরনারী
দীন নয়নে চাহিয়া
প্রাণ বলি দিতে পারে আজ তারা
প্রাণের দেবতা লাগিয়া।
কি কায করিতে হইবে মোদের
আদেশ করহ স্বামী—
তোমারি আলোকে পথ যেন দেখি
আঁধারে দিবস যামী।
(মোদের) সুপ্ত হৃদয়-তন্ত্রী যতেক
ঝঙ্কারি আজ বাজে—
(হের) রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত এখন
ফিরিতে হবেনা লাজে।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা,
৩১শে আগষ্ট, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র আমি বোষ্টন ট্রান্সক্রিপ্টে মান্দ্রাজের সভার প্রস্তাবগুলি অবলম্বন করে একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেখ্‌লাম। আমার নিকট ঐ প্রস্তাবগুলির কিছু পৌছায়নি। যদি তোমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠিয়ে থাক, তবে উহা শীঘ্রই পৌঁছিবে। প্রিয় বৎস, এ পর্য্যন্ত তোমরা অদ্ভুত কর্ম্ম করেছ। কখন কখন একটু ঘাবড়ে গিয়ে যা লিখি, তাতে কিছু মনে কোরো না। মনে করে দেখ, দেশ থেকে ১৫০০০ মাইল দূরে একলা রয়েছি—গোঁড়া শত্রুভাবাপন্ন খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে আগাগোড়া লড়াই করে চল্‌তে হয়েছে—এতে কখন কখন একটু ঘাবড়ে যেতে হয়। হে বীরহৃদয় বৎস, এইগুলি মনে রেখো এবং কায করে যাও। বোধহয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে থেকে শুনেছ, জি, জির কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম। এমন করে ঠিকানাটা লিখেছিল যে, উহা আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারিনি। তাইতে তার কাছে সাক্ষাৎভাবে জবাব দিতে পারিনি। তবে সে যা যা চেয়েছিল, আমি সব করেছি আমার ফটোগ্রাফগুলি পাঠিয়েছি ও মহীশূরের রাজাকে পত্র লিখেছি। আমি খেতড়ির রাজাকে একটা ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে উহার প্রাপ্তিস্বীকার পত্র এখনও পাইনি। উহার খবরটা নিয়ো ত! আমি কুক এণ্ড সন্স, র‍্যাম্‌পার্ট রো, বোম্বাই ঠিকানায় উহা পাঠিয়েছি। ঐ সম্বন্ধে সব খবর জিজ্ঞাসা করে রাজাকে একখানা পত্র লিখো। ৮ই জুন তারিখে লেখা রাজার একখানা পত্র পেয়েছি। যদি ঐ তারিখের পর কিছু লিখে থাকেন, তবে তা আমি এখনও পাইনি।

আমার সম্বন্ধে ভারতের খবরের কাগজে যা কিছু বেরোবে সেই কাগজখানাই আমায় পাঠাবে। আমি কাগজটাতেই তা পড়্‌তে চাই,—বুঝ্‌লে? চারুচন্দ্র বাবু যিনি আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখবে। তাঁকে আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাবে, কিন্তু তোমাকে আমি গোপনে বল্‌ছি, দুঃখের বিষয় যে তাঁর কথা আমার কিছু স্মরণ হচ্ছে না। তুমি তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমায় জানাবে কি? থিওসফিষ্টেরা এখন আমায় পছন্দ কর্‌ছে বটে, কিন্তু এখানে তাদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬৫০ জন মাত্র। তারপর খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিকগণ আছেন তাঁদের সকলেই আমায় পছন্দ করেন তাঁদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ হবে। আমি উভয় দলের সঙ্গেই কায করি বটে, কিন্তু কারও দলে যোগ দিই না আর ভগবৎকৃপায় উভয় দলকেই ঠিক পথে গড়ে তুল্‌ব—কারণ, তারা কতকগুলো আধা-সত্য কপ্‌চাচ্ছে বইত নয়।

এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আশাকরি নরসিমা টাকাকড়ি ইত্যাদি সব পাবে।

আমি 'ক্যাটের' কাছ থেকে এক পত্র পেলাম, কিন্তু তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একখানা বই লিখ্‌তে হয়, সুতরাং তোমার এই পত্রের মধ্যেই তাকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি আর তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে বল্‌ছি যে, আমাদের উভয়ের মতামত বিভিন্ন হলেও তাতে কিছু এসে যাবে না—সে একটা বিষয় একভাবে দেখ্‌ছে, আমি না হয় আর এক ভাবে দেখ্‌ছি, এই এক জিনিষকে বিভিন্নভাবে দেখা স্বীকার করে নিলেই ত আমাদের উভয়ের ভাবের এক রকম সমন্বয় হোলো। সুতরাং সে বিশ্বাস যাই করুক তাতে কিছু এসে যায় না—সে কায করুক।

বালাজি, জি জি, কিডি, ডাক্তার ও আমাদের সব বন্ধুকে আমার ভালবাসা জানাবে আর যে সকল স্বদেশহিতৈষী মহাত্মারা তাঁদের দেশের জন্য তাঁদের মতবিভিন্নতা গ্রাহ্য না করে সাহস ও মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সকলকেও আমার হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা জানাবে।

একটা ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাময়িক পত্র বার কর—তুমি তার সম্পাদক হও। কাগজটা বার করবার ও কাযটা আরম্ভ করে দেবার জন্য খুব কম করে ধরে কত খরচা পড়ে হিসেব করে আমায় জানাবে আর সমিতিটার নাম ও ঠিকানাও জানাবে। আমি তা হলে তার জন্যে নিজে টাকা পাঠাব—শুধু তা নয়, আমেরিকার আরও অনেককে ধরে তাঁরা যাতে বছরে মোটা চাঁদা দেন, তা কোর্‌বো। কল্‌কেতায়ও ঐরকম কর্‌তে বল। আমাকে ব—র ঠিকানা পাঠাবে। সে বেশ ভাল ও মহৎ লোক। সে আমাদের সঙ্গে মিশে বেশ সুন্দর কায কর্‌বে।

তোমাকে সমস্ত জিনিষটার ভার নিতে হবে—সরদার হিসাবে নয়, সেবকভাবে—বুঝ্‌লে? এতটুকু কর্ত্তাত্বির ভাব দেখালে লোকের মনে ঈর্ষার ভাব জেগে উঠ্‌বে—তাতে সব মাটি হয়ে যাবে। যে যা বলে, তাইতে সায় দিয়ে যাও—কেবল চেষ্টা কর—আমার সব বন্ধুদের একসঙ্গে জড় করে রাখ্‌তে—বুঝ্‌লে? আর আস্তে আস্তে কায করে উহার উন্নতির চেষ্টা কর। জি, জি, ও অন্যান্য যাদের এখনই রোজগার কর্‌বার প্রয়োজন নেই, তারা এখন যেমন কচ্ছে তেমনি করে যাক্‌ অর্থাৎ চারিদিকে ভাব ছড়াক্‌। জি, জি, মহীশূরে বেশ কায কচ্ছে। এই রকমই ত কত্তে হবে। মহীশূর কালে আমাদের একটা বড় আড্ডা হয়ে দাঁড়াবে।

আমি এখন আমার ভাবগুলি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ কোর্‌বো ভাব্‌ছি—তার পর আগামী শীতে সারা দেশটা ঘুরে সমিতি স্থাপন কোর্‌বো। এ একটা মস্ত কার্য্যক্ষেত্র আর এখানে যত কায হতে থাক্‌বে, ততই ইংলণ্ড এই ভাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবে। হে বীরহৃদয় বৎস, এতদিন পর্য্যন্ত বেশ কায করেছো। প্রভু তোমাদের ভিতর সব শক্তি দেবেন।

আমার হাতে এখন ৯০০০৲ টাকা আছে—তার কতকটা ভারতের কার্য্যটা আরম্ভ করে দেবার জন্য পাঠাব আর এখানে অনেক লোককে ধরে তাদের দিয়ে বাৎসরিক, ষান্মাসিক বা মাসিক হিসাবে টাকাকড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। এখন তুমি সমিতিটা খুলে ফেল ও কাগজটা বার করে দাও ও আর আর আনুসঙ্গিক যা আবশুক তার তোড়জোড়

কর। এ ব্যাপারটা খুব অল্প লোকের ভিতর গোপন রেখো—সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মান্দ্রাজে একটা মন্দির কর্‌বার জন্য মহীশূর ও অন্যান্য স্থান থেকে টাকা তোলবার চেষ্টা কর—তাতে একটা পুস্তকালয় থাক্‌বে—আফিষ ও ধর্ম্মপ্রচারকদের অর্থাৎ যে কোন সন্ন্যাসী বা বৈরাগী এসে পড়ে, তাদের জন্য কয়েকটা ঘর থাক্‌বে। এইরূপে আমরা ধীরে ধীরে কাযে অগ্রসর হব।

সদা স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

পুঃ—তুমি ত জান টাকা রাখা—এমন কি, টাকা ছোঁয়া পর্য্যন্ত আমার পক্ষে বড় মুস্কিল। উহা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মনকে বড় নীচু করে দেয়। সেই কারণে কাযের ভাগের টাকা-কড়ির ব্যাপারটার বন্দোবস্ত কর্‌বার জন্য তোমাদিগকে সংঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন কর্‌তেই হবে। এখানে আমার যে সব বন্ধু আছে—তারাই আমার সব টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে থাকে—বুঝ্‌লে? এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফছেড়ে বাঁচ্‌ব। সুতরাং যত শীঘ্র তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পার এবং তুমি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়ে আমার বন্ধু ও সহায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পত্রাদি ব্যবহার কর্‌তে পার, ততই তোমাদের ও আমার উভয় পক্ষের মঙ্গল। এইটে শীগ্‌গির করে ফেলে আমাকে লেখ। সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে—'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা হলে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোন আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট কর্‌বে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতেই ('প্র=সঙ্গে+বুদ্ধ) বোঝাতে পারে 'বুদ্ধের' অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে—ভারত জুড়্‌লে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে। যাই হক্‌, আমাদের সকল বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ কোরো—তাঁরা যা ভাল বিবেচনা করেন।

আমার মঠের গুরুভাইদেরও এইরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কায কর্ম্ম কর্ত্তে বল্‌বে, তবে টাকাকড়ির কায সব তোমাকেই কর্ত্তে হবে। তারা সন্ন্যাসী,

তারা টাকাকড়ি ঘাঁটা পছন্দ করবে না। আলাসিঙ্গা, জেনে রেখো তোমায় ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় কায করতে হবে। অথবা তুমি যদি ভাল বোঝ, কতকগুলি বড়লোককে ধরে তাদের রাজি করে সমিতির কর্ম্মচারিরূপে তাদের নাম প্রকাশ করবে—আসল কায কিন্তু কর্ত্তে হবে তোমাকে—তাদের নামে অনেক কায হবে। তোমার যদি সাংসারিক কাযকর্ম্ম খুব বেশী থাকে এবং তার দরুণ যদি এসব করবার তোমার সময় না থাকে, তবে জি, জি, সমিতির এই বৈষয়িক ভাগটার ভার নিক—আর আমি আশা করি, পেট চালাবার জন্যে যাতে কলেজের কাযের উপর তোমায় নির্ভর না কর্ত্তে হয়, তা করবার চেষ্টা কোর্ব্বো। তা হলে তুমি নিজে উপোষ না করে আর পরিবারদের উপোষ না করিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে এই কাযে নিযুক্ত হতে পারবে। কাযে লাগো, বৎস, কাযে লাগো। কাযের কঠিন ভাগটা অনেকটা সিধে হয়ে এসেছে। এখন প্রতি বৎসর কায গড়িয়ে গড়িয়ে হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি কেবল উত্তমরূপে দাগা বুলিয়ে যেতে পার, তা হলে আমি ভারতে ফিরলে কাযের খুব দ্রুত উন্নতি হতে থাকবে। তোমরা যে এতদূর করেছ, এই ভেবে খুব আনন্দ কর। যখন মনে নিরাশ ভাব আসবে, তখন ভেবে দেখো, গত বর্ষের ভিতর কতদূর কায হয়েছে। আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি—এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে আশাপূর্ণ নয়নে চেয়ে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় জিনিষ আশা করছে। নির্ব্বোধ মিশনরিগণ, ম—এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পার্ব্বে না। তোমার কি মন মুখ এক হয়েছে? তুমি কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থভাবে থাকতে পার? তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? যদি এইগুলি তোমার থাকে তবে তোমার কোন কিছুকে, এমন কি, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করবার দরকার নাই। এগিয়ে যাও, বৎসগণ, সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উহা উৎসুক নয়নে ঐ জ্ঞানালোক পাবার জন্য আমাদের দিকে আশা করে রয়েছে। কেবল ভারতের কাছে সেই জ্ঞানালোক আছে—সে জ্ঞানালোকের অলৌকিক কার্য্যকারিশক্তি, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি বা বুজরুগিতে,

নাই—আছে—সত্য ধর্ম্মের মর্ম্মভাগের—উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের অশেষ মহিমার উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী কর্‌বার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখদুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়ও আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন উহা দেবার সময় এসেছে। হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কায কর্ব্বার জন্য জন্মেছো। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেয়ো না—খাড়া হয়ে উঠ—উঠ কায কর।

তোমাদের
বিবেকানন্দ।

ভারতীয় সমস্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।

(বিদ্যার্থী—মনোরঞ্জন)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জাতীয়তার উদ্বোধন ধ্বনি প্রথমতঃ স্বামীজীর নিকট হইতেই বহির্গত হইল। যে উদ্দেশ্য লইয়া ভারত-জীবন আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—যে আধ্যাত্মিক সাধনাধারার সুশীতল প্লাবন ভারতীয় জীবনকে এতকাল সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা স্বামীজীই সর্ব্বপ্রথম দেশের সম্মুখে বিবৃত করিলেন। কেবল আদর্শ লইয়াই তিনি নিরস্ত থাকেন নাই, দেশের মুক্তির একটি মহতী প্রণালীও আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রবল কর্ম্ম তরঙ্গের আবর্ত্তে পড়িয়া দেশ যাহাতে আপন চিন্ময়সত্বাকে বিধ্বস্ত করিয়া না ফেলে সেইজন্য তিনি বারম্বার সাবধান করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় জীবনের কোন বিভাগকেই তিনি পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ দেখিতে

চাহেন নাই। পরন্তু নিজের ভিত্তি-ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রয়োজন মত নানাদেশের অভিজ্ঞতায় অধিকতর প্রজ্ঞালাভ করিয়া নূতনভাবে কর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত আমাদিগকে নানাদেশ হইতে বিজ্ঞানাদি অনেক জিনিষই আয়ত্ত করিয়া লইতে (assimilate) হইবে কিন্তু অপরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে গিয়া যেন অপরের কবলিত না হইয়া যাই তন্নিমিত্ত বলিয়াছেন—

"Stand on your own feet and assimilate what you can; but learn from every nation, take what is of use to you but remember as Hindus every thing else must be subordinated to your own national ideal".

ভারতবর্ষের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালীকে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ভারতব্যাপী এক মহান্ নেশন্ (জাতি) গঠন করিয়া তোলাই বর্ত্তমানের অভিনব প্রয়াস। কিন্তু অন্যান্য দেশের শত শত বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে বিজ্ঞতম হইয়া উঠিবার নিমিত্ত তৎপূর্ব্বে সমগ্র জগতের চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালীর বিশেষভাবে আলোচনা করা অত্যাবিশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সমস্যার সহিত সমস্ত জগতের সমস্যা এমনই জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে সংগঠনমূলক কোন প্রচেষ্টা করিতে গেলেই আমরা পাশ্চাত্যের দিকে না তাকাইয়া পারি না। শত শত বৎসর ব্যাপী অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সমাবেশ এবং সাম্য ও বৈষম্যের ঘাত প্রতিঘাতে ইউরোপ খণ্ডে এক একটি নেশন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যে যে ষ্টেট্-কেন্দ্রিভূত-রাজনীতি (State centred politics) অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে নেশনের প্রতি ব্যষ্টিই আপন বিশেষত্ব ও স্বাধীন বর্দ্ধনকে নিষ্পেষিত করিয়া অল্প কয়েকজন লোকের অঙ্গুলি সঙ্কেতে যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন গ্রীসের চিন্তা ও রোম সাম্রাজ্যের সুপরিণত আইনকানুন ও সঙ্ঘবদ্ধতা সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপীয়া টিউটন স্বায়ত্তশাসনের সহিত সম্মিলিত হইয়া feuda-

lismএর পরবর্ত্তী অভিব্যক্তিরূপে এক একটি ষ্টেট্ সংগঠিত হইয়া উঠিয়াছে। নানাজাতি ও শাসনপ্রণালীর ভৌগলিক সংস্থান, ঐতিহাসিক ক্রম পরিণতি ও পাত্রগত বৈশিষ্ট্যের পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে,—Parliamentary বা Non-parliamentary যে প্রণালীই হউক না কেন, মূল আদর্শ ও ভিত্তির দিক্ হইতে সমগ্র ইউরোপই একই ভাবের ভাবুক ও একই প্রণালীতে সম্বন্ধ। সংক্ষিপ্ত ও সরল ভাবে বলিতে গেলে প্রত্যেকটি নেশন পার্থিব উন্নতিকে চরম উদ্দেশ্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক জাতীয় জীবনের প্রতি সাধনায় লক্ষ্যনির্দ্দেশ করিতেছে। নেশনের উদ্দেশ্য—ভোগ, উপায় ভোগ প্রসূতি জড়বিজ্ঞান, ভোগাধিকার সংরক্ষণের যন্ত্র ষ্টেট্, ভোগ যন্ত্রের প্রচারক—প্রতিহিংসা ও লালসা দীপ্ত পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ অবাধ বাণিজ্যনীতি। ডেমক্রেসীই ইউরোপীয় রাজনীতির শেষ কথা; কিন্তু স্বাধীনতা ও সাম্যের ধ্বজা উড়াইলেও মৈত্রীর অভাবে আজ ডেমক্রেসীর ভিত্তি-ভূমি টলটলায়মান। আধ্যাত্মিকতায় মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। ইউরোপের অনুর্ব্বর জড়প্রান্তরে আধ্যাত্মিকতার স্থান নাই। টলষ্টয় প্রভৃতি মনীষীর সাধু জীবন ও বাণী বর্ত্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা করিয়াছে এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ নূতন ভাবে সমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। সমাজনৈতিক চিন্তায় ম্যার্ক্স (Marx), এঞ্জেলস্ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে Communistic আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাহাই ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবে বলিয়া সকলের আশা।

ভারতবর্ষের জাতীয় চিন্তা ও সাধনা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানে এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও তদনুযায়ী কর্ম্মজীবন পরিচালিত করিবার ভাব আমাদের অন্তরে সুচারুরূপে প্রতিভাসিত হইয়া উঠা দরকার, কারণ এতদিন যে বৈদেশিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ লইয়া ধাবিত হইয়াছিলাম তাহা ত চক্ষের সম্মুখে তত্তৎদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকই পরিত্যক্ত ও গ্লানিপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ যে চরম আদর্শকে

শেষ-সাধ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহা কিংবদন্তীর ঘনান্ধকার মিশ্রিত কোন্ সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে শত শত বাধাবিঘ্নের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতীয় জীবনকে অভিব্যক্ত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইয়া আসিতেছে। জাতীয় জীবনাদর্শ বৈদিক যুগেই আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী যুগে এক মহান্ সাধনা-ধারা ধীরে ধীরে সুবৃহৎ ভারতখণ্ডে বিস্তারিত হইয়া মহাভারতের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও কুরুক্ষেত্রের সহিত আদর্শ স্থাপনার ইতিহাস হইয়া গিয়াছিল এবং বৌদ্ধযুগে ভারতীয়-সাধনা কর্ম্মকাণ্ডের বহুলতা এবং নানা জাতিগত ও সামাজিক উচ্ছৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া সমূহকে সমন্বিত করিয়া লইয়াছিল। তাহার পর আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক বৈদিক মত স্থাপনের পর, চৈতন্যদেব, গুরু নানক, কবীর প্রভৃতি মুসলমান-ভারতের ধর্ম্ম-সংস্কারক কর্ত্তৃক উহা বহুলাংশে উদারভাব সম্পন্ন হইয়া ও বিজাতীয় সমস্যার কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাসের আর এক অভিনব অধ্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে। দেশ যখন এই মহান্ ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পাশ্চাত্য মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া ধাবিত হইতে ছিল তখন স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বপ্রথম এই জাতীয় বিশেষত্বের সন্দেশ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন—"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য্য কর্‌ছে ও সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন এ জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ দারিদ্র্য, ঘরে বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটি জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।"

বর্ত্তমান কালে চিন্তাশীল সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরেই ভারতীয় জাতীয়-জীবন গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই "আধ্যাত্মিক ভিত্তি" কথার ভাবটি আমাদের নিকট অধিকতর

সরল ও সহজবোধ্য হইয়া উঠা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা সাধারণতঃ ধারণা করিয়া বসি যে আধ্যাত্মিকতা বুঝি দেশের ভৌতিক উন্নতি-লাভের একটি উপায় মাত্র। উহাই যে চরম সাধ্য (End in itself) এই কথাটি ভালরূপে ধারণা না করিয়া সাধারণ-বুদ্ধি এই ভাব পোষন করিয়া থাকে যে উহাকে মনে মনে ভাবিতে পারিলেই বুঝি উহার কর্ম্ম শেষ হইয়া যায়। বস্তুতঃ তাহা নহে; আমাদের যাবতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ততক্ষণ পর্য্যন্তই ভারতীয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা বিভিন্ন চরিত্রের মানুষকে বিভিন্ন প্রকার ভোগের মধ্য দিয়া একই চরম আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রেরণ করে। ভারতীয় কর্ম্মজীবনের উদ্ভব ও সংবর্দ্ধণ কোন যান্ত্রিক উপায়ে সম্পাদিত হয় নাই এবং ইতিহাসও তাহার প্রমাণ দেয় না। দেশের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কর্ম্মজীবন ধীরে ধীরে ও স্বাভাবিক ভাবে উত্তম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও সাধনার নূতন সৃষ্টির অভিনয় করিয়া আসিয়াছে। যুগে যুগে যখনই বিরাট আধ্যাত্মিক তরঙ্গসমূহ দেশকে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই যথার্থ জীবনীশক্তির সবলতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুন্দর ও সুঠাম ভাবে এক অভিনব কর্ম্মময় জীবনের পত্তন করিয়া দিয়াছে। স্বর্ণকার স্বর্ণের উপর শিল্পচাতুর্য্য প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে স্বর্ণকে তাতাইয়া লয়। ঠিক সেইরূপ কর্ম্মজীবনকে নানা বিভাগে পরিচালিত করিবার পূর্ব্বে সমগ্র সমাজ শরীরকে আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ দ্বারা তাতাইয়া লওয়া প্রথম কর্ত্তব্য। তাই স্বামীজী বলিয়াছেন,—

"Before flooding India with political and socialistic ideas first deluge the land with spiritual ideas......So that these truths may run like fire all over the country from North to South and East to West."

কোন জাতির সমস্যা বলিতে সামাজিক সমস্যাই বুঝায় এবং প্রত্যেক সমাজ বিভিন্ন প্রকারের সমন্বয় প্রণালীর দ্বারাই সমাজ-শরীরকে সমাহিত করিয়া রাখে। সমাজ আপনার অন্তর্গত ব্যষ্টিসমূহ ও তাহাদের বিসদৃশ

অধিকার তৃষ্ণাকে সমন্বিত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। ইউরোপের ও আমেরিকার সমাজের পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় স্বাধিকার-প্রমত্ততার উপরই তাহাদের সমাজ স্থাপিত এবং ভোগাধিকারের (Rights) সমন্বয় বা ভাগবাটোয়ারার উপর তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে। বিশেষতঃ জীবনের আদর্শ ভোগাধিকারে পর্য্যবেশিত বলিয়া অন্য কিছুর সমন্বয়ের প্রতি তাহাদের মাথা খাটাইতে হয় না। ভারতবর্ষের আদর্শ ভিন্ন ও সমন্বয়ের ধারাও পৃথক। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের আদর্শ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মজীবন যাপনে প্রতি ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া ভারতবর্ষ ধর্ম্মরাজ্যে খুব উন্নত হইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে—কারণ—"Freedom is the first condition of grouth" ভারত-ইতিহাসের প্রতি যুগেই প্রধান শক্তি ধর্ম্ম সমন্বয়েই নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের অবাধ স্বাধীনতা হেতু বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের এমত প্রকার বৈসাদৃশ্য ঘটিয়া উঠে যে, সমস্ত জাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া যাবতীয় আধ্যাত্মিকতাকে কোনও মহান্ সার্ব্বভৌমিক উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত করিবার নিমিত্ত, তখন বিভিন্ন ধর্ম্মমতের এমন একটি সমন্বয় সূত্র বাহির করিতে হয় যাহা আপাতদৃষ্টে বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একই সম্মোহন সূত্রে বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়কে একীভূত করিতে সমর্থ হয়। সমগ্র দেশের শক্তিকে এক কেন্দ্রাভিগত করিতে হইলে এই ধর্ম্মসমন্বয়ই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং স্বামীজী বলিয়াছেন—"This is the first step."

ভারতবর্ষ যেন এই সার্ব্বভৌকি মহাসমন্বয় সাধন নিমিত্তই পাশ্চাত্যকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মমত, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা সমূহ এই ভারতের উদার বক্ষে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতব্যাপী—সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যাতায়াতের ও চিন্তাসমাগমের যে প্রকার সুযোগ ঘটিয়াছে তাহা যেন ভারতের মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের সহায় রূপেই বর্ত্তমান। এই সমন্বয়ের উপর একদিকে সমস্ত পৃথিবীর ও অপর দিকে ভারতবর্ষের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে উদার ভাবে সুসংহত করিয়া তোলা

এক মহা সমস্যা। সাময়িক কোন প্রকারের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য বা বাহিরের আঘাতের তাড়নায় যে একত্ব আপাততঃ সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার স্থিতিস্থাপকতা আদৌ নাই সুতরাং তাহা বস্তুতন্ত্র হীন। কারণ কোন উন্নত ও উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্ত্তে উহা সাময়িক লাভ ও ভোগাধিকারের চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা ভোগাধিকারের চুক্তির উপর কোন মহান চিরস্থায়ী একতার আশা করিতে পারি না কারণ ভোগ-চুক্তির অকর্ম্মণ্যতা ও শেষ পরিণাম ইউরোপে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। শাসনপ্রণালীর উপর শাসন-প্রণালীর ভার চাপাইয়া কত সংস্কার চলিতেছে কিন্তু শান্তি স্থাপিত হইয়াছে কি? আমরা চিরদিনের জন্য যাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছি যাহার সুশীতল ছায়া সমগ্র উৎকণ্ঠিত ও ত্রস্ত জগতকে শান্তির স্নিগ্ধ-মধুর আহ্বানে আপ্যায়িত করিবার আশা করে তাহার ভিত্তি এত সংকীর্ণতার উপর স্থাপিত হইলে চলিবে কেন? সমগ্র দেশের নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভারত-ভারতী এক সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়াইবে—বুদ্ধি প্রসূত চুক্তি বা সমীকরণের দ্বারা নহে—উর্দ্ধের সমন্বয়ের দ্বারা। হিন্দুকে হিন্দুত্ব হারাইতে হইবে না, মুসলমানকে মুসলমানত্ব বর্জ্জন করিতে হইবে না এবং খ্রীষ্টানকেও খ্রীষ্টানত্বের বিরুদ্ধ-বাদী হইতে হইবে না; পরন্তু হিন্দুকে সত্য হিন্দু, মুসলমানকে সত্য মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে যথার্থ খ্রীষ্টান হইতে হইবে। বিশেষতঃ সহস্র বৎসর একত্র বাসের ফলস্বরূপ হিন্দু মুসলমান একই ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত অনেকাংশে হিন্দুর বেদান্তেরই অনুরূপ। তন্নিমিত্ত স্বামীজী মুসলমানগণকে হিন্দু হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই—ভারতবাসী বলিয়াই দেখিয়াছেন। ভগবান্ যীশুর উপদেশে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়েরই উল্লেখ আছে যেমন তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—"আমি ও আমার পিতা এক।" স্বামীজী সর্ব্বধর্ম্মের সারতথ্য ও শেষ কথা বেদান্তের অদ্বৈতানুভূতিকে গ্রহণ নিমিত্ত সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সম্মুখে ধরিয়াছেন। জগততত্ত্বের চরম মীমাংসায়, কর্ত্তব্যের (Ethics) ভিত্তি স্থাপনে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক

গবেষণার অনুকূলে এবং সার্ব্বভৌমিক যথার্থ একত্ব স্থাপনে একমাত্র বেদান্তের অদ্বৈতানুভূতিই সমর্থ উহা স্বামীজী স্বকীয় মহান্ জীবন ও লেখনী দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। এই দীর্ঘ শত শত শতাব্দীর নিষ্পেষণ ও সংকীর্ণতার মধ্যে থাকিয়া যে মহান আধ্যাত্মিক সত্য ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছে—তাহা এই যে, মানুষ যে কোন অবস্থায় যে কোন স্থানে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার নিকট আধ্যাত্মিক চরম সত্য লাভের পথ উন্মুক্ত, নিষ্কণ্টক ও উদ্ঘাটিত; সমাজের যে কোনও স্তরে, যে কোনও স্থানে বাস করিলেও সে ইচ্ছা করিলে আধ্যাত্মিক চরম সত্য লাভে সমর্থ। স্বামীজী বেদান্তের এই সত্য সমূহকে কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ না রাখিয়া আপামর সাধারণের গ্রহণের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন—

Therefore, these conceptions of the Vedanta must come out, must remain not only in the forest, not only in the cave, but they must come to work out at the Bar and the Bench, in the pulpit and in the cottage of the poor man, with the fisher man that are catching fish and the students that are studying. They call to everyone, woman and child whatever be their occupation wherever they may be."

সাধারণ চক্ষে উহা আমাদের মনেই স্থান প্রাপ্ত হয় না যে হিন্দু হিন্দু থাকিয়া, মুসলমান মুসলমান থাকিয়া এবং খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান থাকিয়াও এক মহান্ সমন্বয় সম্ভবপর হইতে পারে। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সমন্বয় অনেকটা সম্ভবপর মনে হয় কারণ বৈসাদৃশ্য থাকা সত্বেও উক্ত সকল সম্প্রদায়ই বেদ স্বীকার করেন। কিন্তু আমাদের আর সন্দিগ্ধ থাকিবার প্রয়োজন নাই কারণ এক মহান্ দেব-জীবনে এই মহাসমন্বয় পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় এই মহা সমন্বয় চরিতার্থ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে কেবলমাত্র হিন্দুগণের যুগযুগান্তরের মহান্ অনুভূতি সমূহ একটি জীবনে সুপরিণত করিয়াছিলেন তাহা নহে, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মানুসারেও যথাবিধি সাধনা করিয়া একই শেষ ফলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যাহা স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন—তাহাই স্বামীজি নিজ জীবনে পরিণত করিয়া দেশের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ভারতবর্ষের আদর্শই প্রতি যুগে ভারতের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া আসিয়াছে এবং এই আদর্শরূপ চিন্ময়সত্তাই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বামীজী ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের সম্মুখে তাঁহার পূত-জীবন ধরিয়া বলিয়াছেন—

"সতত বিবদমান, আপাত দৃষ্টে বহুধা বিভক্ত, সর্ব্বথা বিপরিত আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ের সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশ কালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" "হে মানব, মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হয় না,—গত রাত্রি পুনর্ব্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্ব্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্তাবস্থার পুনরুদ্ধার হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি, বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।"

সংসার পথ শঙ্কট অতি কণ্টক ভরা তায় রে।
পথ দেখে চল মুখে হরিবল ফুটিবে না কাঁটা পায় রে॥
(তার) দেখা যদি পাবে আশা পাও আর নাহি পাও।
বিশ্বাস রাখিয়া হৃদে সোজা পথে,চলে যাও॥

—উমাপদ।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"।

(শ্রীশস্ত্রপাণি শর্ম্মা)

কথাটি বহুলোকের মুখে শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি একজন ব্যায়াম শিক্ষক এই বাক্যটি তাঁহার প্রধান মন্ত্রস্বরূপ গণ্য করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল 'শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা ধর্ম্মজীবন গঠনের একমাত্র উপায় না হইলেও যে তাহা প্রধানতম ও অপরিহার্য্য, এই তথ্য নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিয়া অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

প্রথমতঃ অনেকগুলি ছাত্র তাঁহার শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য আগ্রহ সহকারে আকৃষ্ট হয় ও তাহার মধ্যে কেহ কেহ অল্প সময়ের মধ্যেই শারীরিক সুস্থতা ও সবলতা লাভ করে। অতঃপর শিক্ষক মহাশয় কলিকাতায় কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। অন্য কোনও স্থানে তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানি না। ব্যর্থতার কারণ অবশ্য আমি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহি, তবে যে কয়টি ছাত্র তাঁহার শিক্ষার গুণে আশু শারীরিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের সহিত আলাপে বুঝিয়াছি যে শিক্ষক মহাশয়ের আদিষ্ট প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া, আহার বিহারের সংযম শাসন ও অন্যান্য অল্পবিস্তর কষ্টসাধ্য নিয়মানুষ্ঠান ঠিক ঠিক পালন করিয়া তাহারা দেহ সম্বন্ধে যথাযথ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহারা ঠিক ঠিক পারে নাই, তাহারা সেরূপ ফল পায় নাই ও বেশীভাগ ব্যাপার কঠিন মনে করিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল। ইদানীং যে সকল ছাত্র তাঁহার শিক্ষায় শারীরিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহারাও পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ শিক্ষায় তাহাদের ধর্ম্মজীবনের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাহা হউক বা না হউক, আশাকরি একটা বিষয়ে তাহাদের জ্ঞানলাভ হইয়াছে যে শারীরিক দুর্ব্বলতা বা সাধারণ অসুস্থতার কষ্ট অপেক্ষা সংযম প্রাণায়ামাদি অভ্যাস রাখিয়া সুস্থ শরীর বহন করা অধিকতর ক্লেশকর।

দেহটাকে সুস্থ ও সুবল করিতে হইবে—অর্থাৎ (বয়স, সামর্থ্য ও রুচি

অনুযায়ী) প্রচলিত ব্যায়ামাদি, খেলাধূলা, ভ্রমণ ও আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত যথাসম্ভব নিয়ম পালন ব্যতীত অনন্য সাধারণ উপায়ে দেহটাকে সুস্থ ও সবল করিতে হইবে—কেন ?

যদি বল, উত্তম ভোগের জন্য—সে জন্য ১০০০ রের মধ্যে সংসারের ৯৯৯ জন খাটিতেছে, মরিতেছে, চুরি করিতেছে, এবং আত্মীয় স্বজনের মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে, নশ্বর সুখভোগের জন্য ; অথবা যদি বল সাধারণ ব্যক্তি যে সকল উপায়ে ঐহিক সুখভোগের চেষ্টা করে, এই অসাধারণ উপায় অবলম্বনে তাহা ত সহজসাধ্য হইবেই, অধিকন্তু উচ্চতর সুখভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে ; তাহাতে বাচনিক আপত্তি করিবার কিছু না থাকিলেও কার্য্যতঃ উপরোক্ত "সকল" ছাত্রদিগের দৃষ্টান্ত শিক্ষক মহাশয়ের অবধারিত উপায়ের উপর আমাদিগকে একান্ত আস্থাহীন করে। দৈহিক ভোগ সুখাদির জন্য উপরোক্ত উপায়ে শিক্ষা দিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন এরূপ শিক্ষক কোথায় পাওয়া যায় জানি না। তরবারি দ্বারা নখ কাটিবার প্রয়াস যেরূপ হাস্যকর, ঐহিক এবং দৈহিক ভোগের জন্য প্রাণায়ামাদির অভ্যাস তেমনি হাস্যোদ্দীপক। কেবল তাহাই নহে, সদ্‌গুরু ব্যতীত প্রাণায়ামাদি শিক্ষা বিশেষ "ক্ষতি-জনক একথা সর্ব্বজন বিদিত।

আর যদি বল ধর্ম্মজীবন গঠনের সাহায্যের জন্য উক্ত শিক্ষা প্রয়োজন, তবে সে সম্বন্ধেও আলোচনা করিবার অনেক কথা আছে।

প্রথমতঃ ধর্ম্মজীবন কাহাকে বলে ? ত্যাগই ধর্ম্মজীবনের আদর্শ—সন্ন্যাসীর ত কথাই নাই, গৃহস্থের পক্ষেও তাই। ত্যাগ অর্থে এক মহা-কঠোর ও সাধারণের পক্ষে অসম্ভব বিধিনিষেধাদির পালন নহে। নিম্ন ও দুঃখজনক প্রবৃত্তি সকলকে উচ্চ হইতে উচ্চতর ও আনন্দময় সোপানে উত্তোলন। "চিটে গুড়ের আস্বাদন ছাড়িয়া পরমান্নের আস্বাদ গ্রহণ।" ঈশ্বরের প্রেমে বা জ্ঞানে যে যতটা অগ্রসর হইয়াছে সে ততখানি ত্যাগী, তাহার ধর্ম্মজীবনও সেই পরিমাণে উন্নত।

দ্বিতীয়তঃ কিঞ্চিন্মাত্র হইলেও শারীরিক স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা ধর্ম্মজীবনের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য সহায়ক। "দেহটা মোহরের বাক্স"। মোহরের

তুলনায় বাক্সটির মূল্য সৎসামান্য সত্য, কিন্তু না হইলেও নয়; আর মোহরগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য বাক্সটি ও তাহার কলকব্জা বেশ শক্ত হওয়া চাই। নিতান্ত বাতুল ব্যতীত কেহই মোহরের হিসাব ভুলিয়া কেবল বাক্সের চাকচিক্য লইয়ায়ই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে শারীরিক স্বাস্থ্য অপেক্ষা মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন আরও অনেক বেশী। "অশুদ্ধমনে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে ইহপরকালের কোনই উৎকর্ষ সাধন যে অসম্ভব, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই বোধগম্য। সেইজন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনবরত শরীরের দিকে মুখ্যদৃষ্টি রাখিয়া অত্যল্প সময়ের জন্য বা গৌণভাবে ইষ্ট-চিন্তাদিতে লিপ্ত থাকিয়া হঠযোগী সাধুদের একরকম উচ্চদরের গুণ্ডা করিয়া তুলিয়াছে নয় কি? আবার নব অনুরাগী বা হঠাৎ অনুরাগী যুবক উচ্চভাবের উদ্দীপনীতে স্বীয় ক্ষমতার অতীত কঠোরতা করিতে গিয়া 'জড়' দেহটার কাছে এমন ধাক্কা খান যে তাঁর টাল সামলাইতে জীবনটাই কাটিয়া যায়। 'হঠযোগ প্রভৃতি প্রণায়ামাদি অন্যান্য সাধারণ উপায়ে আগে দেহটাকে দৃঢ় করা যাক, সাধন ভজনাদি পরে হইবে'—এরূপ নীতি ছাড়িয়া সাধন ভজনাদিতে যথাসাধ্য লিপ্ত থাকিয়াও দেহটাকে যে সুস্থ রাখিবার অবসর পাওয়া যায় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিবেন।

সুস্থদেহ কিরূপে অসুস্থ হয় সেটা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া দেখা যাক। মাতা অসুস্থ বা সুস্থ যে অবস্থাতেই থাকেন সন্তানের অসুখে রাত্রি জাগরণাদি অনিয়মাদি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হন না, এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কোন শাসনেও তাহা নিবারিত হইতে পারে না। এইরূপ আসক্তি সৎই হউক আর অসৎই হউক ক্রমাগত মনুষ্য দেহকে বিভিন্ন ছাঁচে গড়িয়া তোলে। পশু ও পশুতুল্য মানব যেমন সুস্থ ও সবলদেহী হয়, উন্নত মানব সেরূপ হইতে পারে না। মনটাকে বহুকালের অভ্যস্থ পথ হইতে টানিয়া আনিয়া উচ্চতর পথে চালাইতে হইলে কত অভ্যাস ও আয়াসের প্রয়োজন তাহা সকলেই জানেন। সেই প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া যায়, তাহার খবর রাখিবার

সাবকাশ থাকে না। কিন্তু বহুদিন পরে কালরূপী রোগ দেখা দিলে তখন ঔষধাদি প্রয়োগের প্রয়োজনে ডাক্তারেরা মাথা ঘামাইতে থাকেন, রোগটী এই নামের—কি ঐ নামের।

ঈশ্বরানুরাগী কোন সিদ্ধ সাধুকে দেহ বা দেহরক্ষার চিন্তায় বিব্রত হইতে হয় না। সুস্থ বা অসুস্থ উভয় অবস্থায়ই তাঁহারা তাঁহাদের কায করিয়া থাকেন। বহু প্রাচীন কাল হইতে স্বীয় ইষ্ট ও জগতের কল্যাণ-কামী সাধুরা হঠযোগের সাহায্যে দৃঢ় শরীরে দীর্ঘকাল দেহ ধারণ করিয়া থাকিতেন। আধুনিক সময়ে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু হঠযোগের কোনও সাহায্য না লইয়াও ভগবান লাভ করিয়া বহু মহাত্মা দীর্ঘকাল সুস্থশরীরে ধর্ম্মপ্রচারাদি লোককল্যাণ-কর কার্য্যে জীবন ব্যয় করিয়াছেন। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে দেহের ক্ষীণতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য ঈশ্বরলাভে ও ভ্রান্ত জীবের উদ্ধারের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় না। হয়ত অসুস্থ হওয়াটাও তাহাদের একটা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। সাধারণ মানুষের মত এমন কি তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ কষ্ট না ভুগিলে বোধহয় তাহাদের অন্তরে শান্তি-দান-করা শিক্ষা হয় না। অথবা হয়ত সাধারণ লোকের সহিত সহানুভূতিতে তাহাদের দুঃখ কষ্টই নিজ পবিত্র দেহে টানিয়া লন। তাঁহারা যোগবলে আধিব্যাধি নাশ করিতে পারেন কি না, অথবা পারিয়াও নশ্বর দেহের উপর ঈশ্বরার্পিত মনকে টানিয়া আনিতে তাঁহাদের কোনরূপ কুণ্ঠা হয় কি না, সে বিষয়ে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ সাধারণ ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার *জন্য* স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধান ভিন্ন জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে শরীরের স্থিতি ও সোয়াস্তির প্রয়োজন, ইহাই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান প্রয়োজন। কিন্তু উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ও পরিবর্ত্তিত হয়, অতএব প্রথম হইতেই প্রত্যেক লোককে তাহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্বাস্থ্যের বিধান করিতে হইবে। যে ব্যক্তি আজীবন ৩০৲ টাকা

মাহিয়ানাতে জীবন কাটাইতে প্রস্তুত, পোষ্যদিগকে রক্ষা করিয়া কোনও মতে দিনগত পাপক্ষয় করাই যাহার উদ্দেশ্য তাহার স্বাস্থ্য ও সাংসারিক বন্ধনশূন্য পরার্থে ও মোক্ষার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন যুবকের স্বাস্থ্য এক উপাদানে রক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। আবার অক্লান্ত পরিশ্রমী উদ্যমশীল ব্যক্তি ও ভাবপ্রবণ, কাব্যামোদী ব্যক্তি একই উপায়ে শরীর সুস্থ রাখিয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে পারেন না। এজন্য বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন অর্থসমর্থ ও বিভিন্ন মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে বিভিন্ন উপায়ালম্বনে স্বাস্থ্যের সজীবতা রক্ষা করিতে হয়। এই সকল বিভিন্নতা বিশ্লেষণ করিয়া শ্রেণীভুক্ত করিতে হইলে শাস্ত্রোক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আখ্যা প্রদান করাই সমীচীন। মানুষের অবয়বে যদি এমন কোনও সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকিত যাহাদ্বারা সত্ত্বপ্রধান, কি রজঃ প্রধান, কি তমঃ প্রধান প্রকৃতি সহজে বুঝা যাইত তবে কোন গোল ছিল না। শাস্ত্রোক্ত উপায়ে আপন আপন পন্থা বুঝিয়া চলিলেই চলিত। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে অপরের ত দূরের কথা নিজের প্রকৃতি নিজেই বুঝিতে পারা যায় না যে কতটা সত্ত্ব বা রজঃ বা তমঃ নিজেতে বর্ত্তমান। কার্য্যক্ষেত্রে সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি যে কেবল সাত্ত্বিক কার্য্যকলাপ লইয়াই জীবনযাপন করেন তাহা সচরাচর দেখা যায় না। বরং কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ মানব বিচিত্রতার মধ্যেই আপন আপন পথে অগ্রসর হয়। যে যেমন অবস্থায় পড়ে তাহা জয় না করিয়া উচ্চতর অবস্থায় উঠিবার সম্ভাবনা বিরল। তবে ঘোর তামসিক যখন সাত্ত্বিক বা উন্নত রাজসীক কার্য্য অবলম্বন করে, তাহার বিষময় ফল জগতে একটি দুর্দ্দৈব বলিয়াই ঘোষিত হয়। এরূপ দুর্দ্দৈব না ঘটিলে স্বাস্থ্যরক্ষা সমস্যার আলোচনার প্রয়োজন হইত না। কিছুকাল পূর্ব্বে বংশপরম্পরায় বাঙ্গালীজীবনে প্রাতে স্নানাহারাদি নিত্যকার্য্য, মধ্যাহ্নে ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও তৎপূর্ব্বে ও পরে সাংসারিক কার্য্যকর্ম্মাদি করিবার প্রথা ছিল। ক্রমে অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে তাহাকে ৯টা ১০টার মধ্যে আহারাদি যথাসম্ভব সম্পন্ন করিয়া ৫টা পর্য্যন্ত জামাজোড়ায় আবৃত হইয়া কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। রাজপুরুষেরা তাহাতে কোনও ক্ষতি বুঝিতে পারেন না, কেননা তাঁহারা ঐ নিয়মেই অভ্যস্ত।

এখন আমাদের উপায় কি? হয় ঐ বিধি উল্টাইয়া আমাদের উপযোগী নিয়মাদির পুনর্গঠন অথবা রাজপুরুষদের অনুকরণে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় দ্বারা চালিত হওয়া, নচেৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ, অকালমৃত্যু ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বহুমূত্র রোগটিকে উল্লেখ করিলেই হইবে। এ দেশস্থ পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ঐ রোগ খুব অল্পই দেখা যায়; কিন্তু পদস্থ ও উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহার ঐ রোগ নাই, তিনি ভাগ্যবান। কিন্তু ঐরূপ কর্ম্মচারী-দিগের মধ্যে যিনি নিরামিষাশী, দুধ ঘৃত ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণ অথবা বিশুদ্ধ না পান এবং পাইলেও হজম করিবার সাবকাশ নাই, আবার এই প্রাণান্ত পরিশ্রমের উপর যাঁহাকে একটি বিরাট সংসারের নানা দুশ্চিন্তায় নিয়ত বিব্রত থাকিতে হয় তিনি যে অসুস্থ হইবেন তাহার আর বিচিত্রতা কি?

সত্বপ্রধান ব্যক্তি যেরূপ কার্য্যেই লিপ্ত থাকুন না কেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া স্বীয় স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না। রাজসিক বা তামসিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে তাঁহাকে স্থূল দেহের সৌকার্য্যার্থে অন্ততঃ কতকটা রাজসিক আহারাদি করা উচিত। কারণ উহা রুচিসঙ্গত না হইলেও সুচারুরূপে বহুদিন হইতে অনুষ্ঠিত কর্ত্তব্যব্রতের জন্য ত্যাগস্বরূপ গণ্য হইবে। এতদ্ব্যতীত এই নির্দ্দিষ্ট সাংসারিক কাজ সমাপনান্তে স্বীয় উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার অবসর কি তাঁহার মিলিবে না? এই স্থানে সাত্বিক বৃত্তি পরীক্ষার উপায়ের অভাব নাই। বুদ্ধি ও সৎপ্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্তে শতগুণে বৃদ্ধি পায়। স্থূল সূক্ষ্ম আহার যোগাইবার জন্য ধ্যান, ভজন, সৎচর্চ্চা, পূজা ইত্যাদি অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে। সাত্বিক ব্যক্তি এই সূক্ষ্ম আহারে পুষ্ট হইয়া রাজসিক ও তামসিক রাজ্য অনায়াসেই জয় করিতে পারেন। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় যে সত্বপ্রধান হিন্দুসন্তান রজঃপ্রধান পাশ্চাত্যদিগের সহিত যে যে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তথায় তাঁহাদের প্রাধান্য বিকাশের বিলম্ব হয় নাই। তবে যে যে স্থলে তাঁহারা পাশ্চাত্যদের তুলনায় দীর্ঘজীবী, সুস্থ ও সবলদেহী হইয়া বাঁচিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহাদের

সত্ত্বসুলভ "হীনতার" জন্য নহে। সাত্ত্বিক বা সূক্ষ্ম আহারের অভাবই তাহার কারণ বুঝিতে হইবে। "সোণার ঘটী মাজিবার দরকার হয় না"। কিন্তু "সোণার ঘটী না হইলে, না মাজিলে কলঙ্ক পড়িবেই"। নিজের আদর্শ হইতে স্খলিত হইলেই দেহে ও মনে তাহার ছাপ পড়া অবশ্যম্ভাবী। কর্ম্মের ব্যপদেশে যদি একদিন হোটেলে খানা খাইতেই হয়, তা বলিয়া কি আমার নিত্য অনুষ্ঠিত জপ ধ্যানাদি ছাড়িয়া দিতে হইবে? বরং আরও বেশী মনকে উন্নত করিবার জন্য ভাবিতে হইবে আমি ঐ নিষিদ্ধ দ্রব্যাদির সংস্পর্শে আসিয়াছি, হীন ভোগেচ্ছায় নয়, বা কেবলমাত্র দেহরক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে নয়, আমার চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির সোপান মাত্র বলিয়া—বলবান অশ্ব যেরূপ আরোহীকে শীঘ্র গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, সেইরূপ এই রজঃ ও তমের মধ্য দিয়া তীব্রবেগে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবে এইরূপ দৃঢ়জ্ঞানে। আসল দিকে নজর না থাকিলে সামান্য বাধা বিঘ্নাদির আন্দোলনেই কাটিয়া যায়। আমিষ খাইব কি নিরামিষ খাইব, তাহাতে কিরূপ মশলা দিব, কয় ঘণ্টা বেড়াইব, কতবার ডাম্বল ভাঁজিব এরূপ সূক্ষ্ম বিচারে কেহ, কখন দেহ ও মন উভয়কে উন্নত করিতে পারে না। দারিদ্র্য দুঃখাদিক্লিষ্ট সাধারণ মানব ত এ সকল ভাবিবার সময়ই পায় না। অথচ তাহাদের মধ্যেই বলিষ্ঠ লোক বেশী দেখা যায়।

তথাপি দারিদ্র্যই আমাদের দেশের স্বাস্থ্যহীনতার সর্ব্বপ্রধান কারণ। আবার দারিদ্র্য কেবল এই দেশেই হীনতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হয় না। আমি অর্থহীন হইতে পারি, কিন্তু দীননাথের কৃপায় সাগর শুষ্ক নহে। অর্থের প্রাচুর্য্যে অজ্ঞান দূর হয় না। মানসিক বলহীনতা, অর্থহীনতা অপেক্ষা অনেক বেশী দুর্দ্দৈব। এই সহরেই অনেক গরিব গৃহস্থের সংসার যাত্রা দেখিলে অনেক ধনী নিজ নিজ অসুস্থতার কারণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। আমরা এইরূপ একটী দরিদ্র গৃহস্থের গৃহচিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিতেছি। প্রত্যূষে ভগবানের নাম লইয়া গাত্রোত্থান করিয়া গৃহিণী ও প্রৌঢ়ারা এবং কখন কখন যুবতীগণ পর্য্যন্ত প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলেন। ঐরূপ মাত্রে দেহ মন উভয়ই পবিত্র হয়, এই ধারণা যুগযুগান্তর

ব্যাপী অতএব দেহ ও মনের উপর ইহার প্রভাব বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কর্ত্তা নিজে ইতিমধ্যে বাজার হইতে তরিতরকারি কিনিয়া আনিলেন। বলা বাহুল্য নিজে দেখিয়া কিনিলে যেমন ভাল ও সস্তা হয় চাকর দ্বারা আনাইলে সেরূপ কখনই হয় না। ইতিমধ্যে দাসী ঘর দোর ধোয়া বাসনমাজা ইত্যাদি সারিতেছে। বালক-বালিকাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বাজার হইতে সদ্যভাজা মুড়ী কিনিয়া কনিষ্ঠদের সঙ্গে জলযোগ করিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিল। গৃহিণীরা স্নান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গৃহ-কর্ম্মে ব্রতী হইলেন। অতঃপর রন্ধন শেষ হইলে কর্ত্তারা আহার শেষ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। বয়ঃকনিষ্ঠ ও কনিষ্ঠারা উঁহাদের ভুক্তাবশেষ শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিলেন। গৃহিণী ও প্রৌঢ়ারা তখন পূজায় নিয়তা। যুবতীরা দেখে শেখে ও উপযুক্ত হইলেই তাহাতে অধিকার পায়। অতঃপর মধ্যাহ্নে অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ সেলাই ইত্যাদিতে অপরাহ্ন আসিল। তখন আবার বৈকালিক গৃহ কর্ম্মের সময়। ক্রমে সন্ধ্যা ও রাত্রে আপনাপন কর্ত্তব্যপালনপূর্ব্বক সকলে সুখে নিদ্রিত হইল। এই পরিবার মধ্যে কাহাকেও স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। এই বাহ্যিক ছবি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক অন্বেষণ ভিন্ন ইহার ভিতরের সঠিক চিত্র কেহ দেখিতে পাইবেন না।

আলস্য ও আরাম প্রিয়তা একটু ত্যাগ করিতে পারিলে যে কতটা সুখ ও স্বাস্থ্য লাভ করা যায় উক্ত পরিবার, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্বেষণে জানিবেন ঐ পরিবারের উন্নতির গোড়ায়, এক বৃদ্ধা আছেন। তিনি আলস্য ও ময়লা বরদাস্ত করিতে পারেন। কর্ত্তা হইতে শিশুদের পিছন পর্য্যন্ত অনবরত লাগিয়া থাকিয়া তাহাদের খাওয়া, শোয়া, নাওয়া ইত্যাদি সুনিয়ন্ত্রিত করেন ও মেয়েদের সকল বিষয়ে আপনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শিক্ষা দেন। এই আলস্যহীন বৃদ্ধা বহু দিন পর্য্যন্ত সুস্থশরীরে বাঁচিয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পর তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ইঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ভাবে

চলিতে থাকে। তিনি যেরূপ শাসন করিতে সুদক্ষা, ততোধিক সংসারের সকলকে তাঁবে রাখিতেও সমর্থা। অন্বেষণ করিলে আরও দেখা যায় ত্যাগই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। আর একটি কথা তিনি শত সহস্র কার্য্যের মধ্যেও জপ পূজা কখনও ভুলেন না।

রজঃপ্রধান মানুষ জনসাধারণের মধ্যে অনেক আছে, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের শক্তি সামর্থ্য একটা দিকে নিযুক্ত হইলে অপর বিষয়ে আর ততটা হুঁস থাকে না। ফলে অর্থোপার্জ্জন হয় ত শরীর হয় না; ফিটফাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সন্তানাদিতে অযত্ন ও শাসনে অক্ষমতার ফলে ভবিষ্যৎ উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিণাম। ব্যায়াম, কুস্তি ইত্যাদিতে শরীর দৃঢ় হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ পালোয়ান ও কুস্তিগির চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে পারে না, অথবা "নাহঙ্কারাৎ পরোরিপু" ও দম্ভের মূর্ত্তিমান স্তম্ভস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা প্রথমে বেশ উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করে, কিন্তু আগাছাগুলি এত বেড়ে ওঠে যে আসল শস্যকে চেপে ফেলে। এই রজঃশক্তি তমোমুখী, ইহাকে সত্বমুখী করিতে হইবে একটু ত্যাগের মালমসলা দিয়া। তাহার জন্য তাহাকে স্বাদু আহার ও উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ ত্যাগ করিতে হয় না, বরং উত্তম উত্তম অসন বসনাদি প্রভৃত যত্নে সংগ্রহ করিয়া সকলে মিলিয়া ভোগ করিতে হয়। এই পাঁচ জনের সঙ্গে ভোগে যে উচ্চতর আমোদ, ইহাই স্বার্থত্যাগের প্রথম সোপান। লোভবশতঃ আত্মসাৎ প্রিয় কেহই দেহ..ন সুস্থ রাখিতে পারে না, কিন্তু উত্তম আহারে ও পরিচর্য্যায় সুস্থ সবলদেহে অধিকতর সৎকার্য্যক্ষম হইব এইরূপ ভাবে ভাবিত ব্যক্তি ভোগের মধ্যেও তমোমুখী হয় না। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"।

"আমি ত্যাগী হ'ব ভাবিলেই কেহ ত্যাগী হয় না। জ্ঞান বুদ্ধি বা প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া দৃঢ় সংকল্পে অগ্রসর হইলেই ত্যাগী হওয়া তাহার পরিণাম। অসার বস্তুর জ্ঞান ও ভালবাসায় আকৃষ্ট হইলে রজঃশক্তি তমোমুখী হয় এবং সৎবস্তুতে হইলে সত্বমুখী হয়।

স্বাস্থ্যনাশের একটি প্রধান কারণ পরিচর্য্যার অভাব। যে সমস্ত দিন খাটিয়া ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে সে যদি একটু মানসিক ও দৈহিক শ্রান্তি না পায়, কোনরূপ ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া তাহার দেহ বলিষ্ঠ করিতে পারা যায় না। এই বিষয়টি অবশ্য স্ত্রীলোকদিগের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে, কিন্তু পুরুষরাই নিজে তাহার অবহেলা করিয়া নিজেরাই ক্ষতি গ্রস্থ হয়। যেখানে উপযুক্ত অভিভাবক নাই সেস্থলে যুবক নিজ স্ত্রীকে এই বিষয়ে বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষিতা করা উচিত। নচেৎ সামান্য অবহেলাতে রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইয়া দিনের পর দিন যাপন করিয়া, ভগ্ন স্বাস্থ্য, অসুখী ও অকাল বৃদ্ধ হইতে হইবে। গৃহিণীর সামান্য ত্রুটীতে যে কতদূর সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে তাহা উদ্ঘাটন করিলে অনেকে স্তম্ভিত হইবেন। ছেলে আফিষ থেকে আসিয়া শূন্য ঘরে লক্ষীটির মত রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না—এ বোধ অনেক বৃদ্ধা গৃহিণীর নাই। বউটি যদি ভাল করিয়া সাজগোজ করে ত তাহার জন্য তাহার টিট্‌কারির অবধি থাকে না। ময়লা, কয়লার গন্ধযুক্ত কাপড়ে ও ম্লানমুখে বউ আসিয়া কোন মতে অর্দ্ধ রাত্রিতে বিছানার কোলে পড়িয়া নিদ্রিতা হইল—এ সব খবর কে রাখে? কিন্তু তাহাতে যে কত মনোমালিন্যের, অসন্তোষ, স্বাস্থ্যভগ্ন ও অশান্তির সৃষ্টি হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। তমঃপ্রধান মানুষের মধ্যে ঐ বিষয় অনুরূপ অযথা ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ও তজ্জন্য যে স্বাস্থ্যহানী হয় তাহার উপায় ব্রহ্মচর্য্যের গুণবর্ণনাতে হয় না। তাহাকে রজঃশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; উত্তম ভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে তাহার হীনতা দূরীভূত হইয়া অধিকতর কার্য্যতৎপরতা আসে। ঐরূপ লোকের পক্ষে যাহার যেটি অভাব বোধ আছে, সেইদিকেই তাহাকে উৎসাহিত করা উচিত। কেননা অভাব বোধ না থাকিলে, তাহা পূরণের চেষ্টা হয় না। একজন মেধাবী গরিব লোককে যদি বলা যায় যে "তুমি যে অর্থকরী কার্য্যে লিপ্ত আছ উহা অসার, তুমি উহাতে অধিক মন না"

দিয়া, যতদূর পার ধ্যানধারণাতে সময় ব্যয় করিবে"। তাহাতে ফল হইবে এই যে সে ব্যক্তি অর্থাভাব অশান্তির মধ্যে, হাবুডুবু খাইতে থাকিবে, অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যটুকু হারাইবে। আর যদি তাহাকে বলা যায় যে "পৃথিবীর একপ্রান্ত অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত খুড়ে যেমন করে পার অর্থ সংগ্রহ করে আন ও বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব, অতিথি ও আতুর সেবায় যদি জীবন সার্থক করিতে পার তবেই তুমি মানুষ নামের যোগ্য, নচেৎ পশুতুল্য জীবন তোমার থাকুক বা যাক্, তাতে কিছু আসে যায় না"; সম্ভবতঃ এই উত্তেজনার বশে সে উপদেশের দশাংশের একাংশ করিলেও সফলতা লাভ করিবে এবং কালক্রমে তাঁহার উন্নতির পথও প্রশস্ত হইবে।

যাহার অর্থ আছে অথচ দেহের ও মনের বল নাই, তাহাকে সুস্থ সবল, গরীব ও সামাজিক সমবস্থাপন্ন লোকের সুখ ও শান্তির আদর্শে আকৃষ্ট করিয়া ধনগর্ব্বের অসারতা না বুঝাইলে কোন উপদেশই খাটিবে না। গাড়ী ছাড়িয়া হাঁটা যে প্রয়োজন, ডাল ভাত খাইয়াও যে শরীরর ভাল থাকে ও চাকর বাকর যে আলস্যের প্রশ্রয় দেয় এ শিক্ষা না যাইলে তার ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কিছুই হইতে পারে না।

"হে প্রভু! তুমি তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার সব আত্মীয়স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছিলে এবং শান্তচিত্তে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়াছিলে; তুমি আমাদিগকে বল দাও। এস প্রভু, এস হে আচার্য্য চূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস প্রভু, এস হে পার্থ-সারথি! অর্জ্জুনকে তুমি এক সময়ে শিখাইয়াছিলে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। যেন প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণের সহিত আমরাও দৃঢ়তা ও নির্ভরের সহিত বলিতে পারি—ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

—বিবেকানন্দ।

অচেনা বন্ধু।

(শ্রীসাহাজি)

হে অজানা, আজ্‌কে শেষের দিনে,
তোমার কথাই জাগছে ফিরে ঘুরে।
বন্ধু আমার, তুচ্ছ জানার মোহে,
ভুলেই ছিনু অচেনা বন্ধুরে।
এই যে চেনা, এই যে আমার জানা,
সবি হোত অন্ধকারে ফাঁকি,
পিছন হতে, অচিন রতন আমার,
তুমিই যদি না রহিতে জাগি।
জগৎ জুড়ে এই যে সুখের দানা,
হেথা সেথা প'ড়ে এক এক কণা,
বন্ধু তুমি, সিন্ধু সকল কণার,
তোমার মত আত্মীয় কোন্ জনা ?
এসেছিনু যেই অজানা হতে,
যাচ্ছি আবার, সেই অজানায় ফিরে,
ঘরের ছেলে, ফিরছি আপন ঘরে,
খুসির কথা এর চেয়ে আর কি রে ?
হে অচেনা, সকল চেনার চেনা !
বন্ধু আমার, * * * !
আসা যাওয়ায় দুবার শুধুই দেখা,
দুই দেখাতেই হৃদয় রহ জুড়ি।
পেটের ছেলে পেটেই মরে আহা !
সবাই বলে, জন্ম তাহার মিছে ;
লীলার মাঝে, তোমার স্বরূপ দেখা,—
মিট্‌ল যদি, ব্যর্থ সে কও কিসে ?
অরূপ রতন, স্বরূপ তোমার কিবা,
কইতে নারে দার্শনিকের খাতা,
অবুঝ বুঝে তোমার স্বরূপ কিছু,
ভক্তিতে যার, নুইয়ে পড়ে মাথা।

স্বরাজ পথিক।

(শ্রীননীগোপাল ব্রহ্মচারী)

(১)

বিষয় ও ইন্দ্রিয়।

বাহিরের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দাদি বিষয় জানিবার জন্য অদ্বিতীয় শিল্পী বিধাতা আমাদের দেহ-ঘরে জানালার মত চক্ষু ও রসনেন্দ্রিয় প্রভৃতি পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বা বহির্মুখ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। আর তাহার ফলে আমরা রূপাদি বিষয়-গুলির প্রত্যক্ষ করিতে পারি, কিন্তু বাহিরের রূপরস প্রভৃতি বিষয়গুলির মত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তবে উহাদের (জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের) অস্তিত্বটা অনুমান সিদ্ধ—পরোক্ষ প্রমাণ, অনুমানের সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়। সেই অনুমানটা এইরূপ—

আমাদের মনবস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের কুটীরে কুটীরে ভ্রমণ করিয়া কল্পনার সুকোমল নিপুণ তুলিকায় বাহিরের দৃশ্যাবলীর ছবিগুলি আমাদের উপর অঙ্কিত করে, তাহার ফলে রূপাদি বিষয়বুদ্ধিগুলি জন্মিয়া থাকে। আর যাহা জন্মিয়া থাকে বা উৎপত্তিশীল, তাহা কার্য্য, এবং প্রত্যেক কার্য্যই যখন সাধন সাপেক্ষ, তখন বুঝিতে হইবে যে, রূপাদি বিষয়ের বুদ্ধিগুলির যখন জন্ম আছে, তখন উহারাও কার্য্য বিশেষ ও কিছু না কিছু সাধন দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে বাধ্য। কারণ, কোনও একটি কার্য্য করিতে গেলে তাহার সাধনও কর্ত্তাকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ হিসাব অনুসারে যদিও মনবস্তু রূপাদি বিষয় বুদ্ধিগুলির সাধন হয়, তথাপি যে সকল বস্তুকে ছাড়িয়া মন রূপাদি বিষয়ের বুদ্ধিগুলি জন্মাইতে পারে না ও যাহাদের সাহায্য পাইলেই ওই বুদ্ধিগুলি জন্মাইতে পারে, তাহারাও রূপরস প্রভৃতি বিষয়ের বুদ্ধি বা জ্ঞানরূপ কার্য্যগুলির সাধনভূত বস্তু বিশেষ।

সেই বস্তু পাঁচটী, যথা—চক্ষু, রসনা, নাসিকা, ত্বক্ ও শ্রোত্র। ইহারা রূপাদি বিষয়ের বুদ্ধি বা জ্ঞান উৎপত্তির সাধনভূত ইন্দ্রিয় বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় আখ্যায় অভিহিত হয়॥

এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী যোগ্যতানুসারে রূপরসাদি বিষয় জ্ঞানের সাধন বটে কিন্তু বৃক্ষাদি ছেদন করিবার সাধন বিশেষ কুঠারাদির মত উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, যেহেতু উহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য বা অপ্রত্যক্ষ বা অতীন্দ্রিয়, নতুবা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের অস্তিত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য পরোক্ষ প্রমাণ অনুমানের অবতারণা করিবার প্রয়োজন ছিল না॥

আমাদের প্রত্যক্ষিভূত এই স্থূল শরীরের সহিত অপ্রত্যক্ষ আকাশ বস্তুর সংযোগটা, যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ দুইটা হস্তের সংযোগের মত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। আলোকাদির সাহায্যে প্রত্যক্ষিভূত রূপাদি বিষয়ের সহিত অপ্রত্যক্ষ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি রূ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সংযোগও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ করিবার অযোগ্য বা অতীন্দ্রিয়। তবে উহা (বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ) অনুমানসিদ্ধ অনুমানরূপ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে ও সেই অনুমান প্রমাণের আকার এইরূপ—

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, চক্ষু ইন্দ্রিয় আলোকের সাহায্যে সম্মুখবর্ত্তী একখানি চিত্রিত ছবির রূপের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মাইতে পারে। আর ঐ ছবিটাই যদি আবার নিজের পৃষ্ঠদেশে বা পশ্চাদ্ভাগে আনিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে চক্ষু পশ্চাদ্বর্ত্তী ঐ চিত্রিত ছবির রূপের গ্রহণ করিয়া তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। কেন পারে না? এইরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া বুঝিতে গেলে বুঝা যায় যে, আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী ছবির রূপের সহিত চক্ষুর সংযোগ নামে প্রসিদ্ধ একটা সম্বন্ধ বিশেষ হয় নাই বা জন্মে নাই, সেইজন্য চক্ষু পশ্চাদ্বর্ত্তী ছবির রূপের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানও জন্মাইতে পারে নাই। এবং ইতিপূর্ব্বে সম্মুখবর্ত্তী ছবির রূপের সহিত চক্ষু সংযোগ নামক সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল বলিয়াই চক্ষু চিত্রিত ছবির নীলাদি রূপের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানও জন্মাইয়াছিল—

যদি বল, রূপের সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না থাকিলেও ঐরূপের উপর মনের সঙ্কল্প ও আত্মার বা আমার অনুভূতি প্রবাহ বহিতে পারে, তাহা হইলে বলিব যে, যখন তোমার পৃষ্ঠদেশে একখানি নূতন ও মনোহর চিত্রিত ছবি রহিয়াছে, তখন তোমার চক্ষু ইন্দ্রিয়ে উক্ত ছবিররূপের সম্বন্ধ না থাকিলেও ওইরূপের উপরি তোমার মনের ভাল মন্দরূপে অথবা কোনও বিশেষরূপে সঙ্কল্প ও তোমার আত্মার অনুভূতি প্রবাহ বহিয়া যাউক ? কারণ, তোমার মতে নীলাদিরূপের সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না থাকিলেও যেহেতু রূপের সম্বন্ধে মানসিক সঙ্কল্প ও আত্মার বা জ্ঞাতা আমার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হওয়া সম্ভবে।

কিন্তু তাহা (উক্ত প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান) সম্ভবে না। অতএব বাধ্য হইয়া ইহা বলিতেই হইবে যে, রূপের সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ নামক একটা সম্বন্ধ বিশেষ জন্মিয়া থাকে ও তাহার ফলে আমরা চক্ষু দ্বারা নীল লাল সবুজ প্রভৃতি রূপেরও প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ও ঐ সংযোগের (রূপের সহিত চক্ষু সংযোগের) অভাবে কোনও প্রকার রূপেরই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। উল্লিখিত প্রকারে রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের দ্বারা নীলাদিরূপের সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগটার অস্তিত্ব যেমন বুঝিতে পারা যায়, শব্দাদি বিষয়ের সহিত শ্রোত্রাদি অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংযোগ নিরূপণ সম্বন্ধেও এইরূপ॥

পক্ষান্তরে, উক্ত সংযোগ সম্বন্ধকে অপেক্ষা না করিয়া মনের রূপ রস প্রভৃতি বিষয় গ্রহণের সামর্থ্য বা যোগ্যতা থাকিলে অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তির মত বিকলেন্দ্রিয় অন্ধাদি ব্যক্তির ও চাক্ষুষাদি জ্ঞানও তজ্জাতস্মৃতি জ্ঞানও সমুৎপন্ন হইয়া যায়। কাজেই বাধ্য হইয়া ইহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে যে, অন্ধাদি লোক সকল যেহেতু রূপাদির দর্শনাদি করিতে পারে না, সুতরাং উহাদের (অন্ধাদি লোক সকলের পক্ষে রূপ ও শব্দাদির জ্ঞান ও তজ্জাতস্মৃতি জ্ঞান ও উৎপন্ন হইতে পারে না। আর তাহাই যদি স্বীকার করিতে হইল, তবে ইহাও অবশ্যরূপে একটা স্বীকার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে যে, রূপাদি বিষয়ের সহিত চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সংযোগ নামক সম্বন্ধের সাহায্যেই জড়জগৎ বা বহির্জগৎ আমাদের মনেরও পরিচিত হইয়া থাকে।

পাঠক মহোদয়গণ! একবার প্রণিধান সহকারে ভাবিয়া দেখুন যে, আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক ও জিহ্বার সামনে এই জড় জগৎটার সহিত আমাদের মনের পরিচয় যে কিছু অসম্ভব, তাহা নহে। তবে যদি উহা অসম্ভব হইত তাহা হইলে এই প্রতীয়মান জগৎ বা বহির্জগৎ কোনও কালে আমাদের অনুভূতির কেন্দ্রে স্থান পাইতে পারিত না। কারণ, মনে করা যাউক, চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা কোনও অভিনবরূপ ও শব্দ আলোচিত বা সংগৃহীত হইলেই ঐরূপ ও শব্দের উপরী আমাদের মনের সঙ্কল্প স্রোতঃ বহিতে পারে। কিন্তু ঐ রূপ ও শব্দ চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা আলোচিত না হইলে অভিনব রূপও শব্দের উপরি মনের কোনও প্রকার সঙ্কল্পের স্রোতটাই যেমন বহিতে পারে না। মনের অগোচর বা মানসিক সঙ্কল্পের অগোচর বস্তুর উপরি ও তদ্রূপ অনুভবকর্ত্তা আত্মার বা আমার অনুভূতিগুলির সম্বন্ধধারা বহিতে পারে না, অর্থাৎ মনের অপরিচিত বা অসঙ্কল্পিত বস্তুসমূহ আমাদের অনুভূতির বিষয়রূপে উল্লেখ-যোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু এই বহির্জগৎটা যেহেতু আমাদের অনুভূতিগুলির বিষয়রূপে প্রতীয়মান হয়, সুতরাং পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বহির্জগৎ ও মনের পরিচিত বা সঙ্কল্পিত বিষয় বিশেষ, ও বহির্জগতের সহিত আমাদের মনের পরিচয় হওয়া সম্ভবে।

পক্ষান্তরে, রূপাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের স্বভাব-সিদ্ধ চিরন্তন প্রণয় বা উল্লিখিত সংযোগ রূপ সম্বন্ধ বিশেষের স্থাপনা বশতঃ রূপাদিমৎ বহির্জগৎ ও পরম্পরায় আমাদের মনের পরিচিত বা সঙ্কল্পিত হইয়া থাকে। মনে করা যাউক, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যেন রথ বিশেষ, আর ঐ রথের পরিচালক বা সারথি হইতেছে আমাদের মন বা অন্তঃকরণ। কারণ, মন যদি জ্ঞানেন্দ্রিয় রথে আরূঢ় বা সংযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সময় বিশেষে রূপাদি বিষয়ের সহিত চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেমন চক্ষুর সন্নিকৃষ্ট রূপাদি জ্ঞান হয় না*। মনও তদ্রূপ আত্মা বা অনুভভ কর্ত্তা স্বামি রূপ সারথি বিশেষকে অপেক্ষা

* যখন তুমি কোনও গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাক, তখন চক্ষু চাহিয়া থাকিলেও চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট প্রিয় বন্ধুরও রূপ ও আকৃতি জ্ঞান হয় না।

না করিয়া স্বয়ং কথনও অনুভব রূপকাদিগুলি জন্মাইতে পারে না, তজ্জন্য ঐ মনই আত্মার রথ বিশেষ। আর মনোরথে আত্মা আরূঢ় বা সংযুক্ত হইয়া মানসিক সকল প্রকার প্রবৃত্তিই অনুভব করেন। অর্থাৎ কাম ও ক্রোধাদিরূপ দোষের দ্বারা * মন প্রেরিত হইয়া চক্ষু ও কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় তাহার ফলে আত্মা বাহিরের বিষয় রূপ ও শব্দাদির অনুভব করিয়া থাকেন। আত্মাও আবার ঐ রূপাদি বিষয় বিশেষে আসক্ত অথবা দ্বেষযুক্ত হইয়া রূপাদিমৎ বস্তুর গ্রহণ ও পরিহারে উপদেশ ও অনুমতি দিবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে মনের সহিত মিলিয়া থাকেন। তজ্জন্য মন ও মনের বিষয়গুলি আত্মার বা আমার নিকটে অপরিচিত বা অননুভূত থাকিতে পারে না। অর্থাৎ মন যখন আত্মার পরিচিত বা সাক্ষাদনুভবগম্য বিষয় বিশেষ, তখন মনরূপ সোপানে আরূঢ় রূপাদি বিষয়গুলিও সুতরাং আত্মার পরম্পরায় পরিচিত মধ্যে গণ্য হইতে পারে। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বহির্জগতের সহিত আমার চিরন্তন পরিচয়টা যখন আমি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারি, ও বহির্জগতের সহিত আমার ঘাত-প্রতিঘাত রূপ কার্য্যটা যখন অনবরতই চলিতেছে, তখন এই দৃশ্যমান জগৎটাও আমার মনেরও পরিচিত বা সঙ্কলিত বিষয় হইতে বাধ্য, কারণ, মনের দ্বারা যাহা কিছু পরিচিত হয়, সে সমস্তই আত্মার যেহেতু অনুভব করিতে পারেন। তাহা হইলে উপস্থিত ইহা সিদ্ধ হইল যে, এই বহির্জগতের সহিত আমাদের মনের পরিচয় আছে। আমরা সচরাচর মনকে অন্তঃকরণ আখ্যায় অভিহিত করিব, তজ্জন্য মনের অন্তঃকরণ সংজ্ঞার যুক্তার্থতা প্রদর্শন করিতেছি। আমাদের স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে বায়ু পিত্ত ও কফ যেমন অবস্থিতি করে, স্থূল শরীরের ভিতরে মন নামেও ঐরূপ একটা বস্তু বিশেষ আছে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বক্ ও জিহ্বা রূপ জানালার সাহায্যে ওই মন শরীরের ভিতরে থাকিয়াই বাহিরের বিষয়গুলির গ্রহণ করে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে ছাড়িয়া দিয়া মন স্বভাবতঃ স্বতন্ত্রভাবে বাহিরের রূপাদি বিষয়গুলির গ্রহণ করিতে পারে

* কাম ও ক্রোধাদি চিত্তের মলিনতাদি দোষ আনয়ন করে বলিয়া ইহারা শাস্ত্রে দোষ নামে অভিহিত হয়।

না। এই কারণে (শরীরের অভ্যন্তরে বা ভিতরে থাকিয়াই বাহিরের বিষয় গ্রহণ করে বলিয়া) মনকে অন্তঃকরণ আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

অথবা, অন্তর্জগতের বিষয় সুখ ও দুঃখাদি মনের সাক্ষাৎ বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সাহায্য না লইয়াই মনবস্তু সুখাদি বিষয়ের গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্য (অন্তর্জগতের বিষয়গুলির গ্রহণ করে বলিয়া) মন অন্তঃকরণ আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

কিম্বা সূক্ষ্ম দেহের বা অন্তর্দেহের কারণ বা ইন্দ্রিয় বলিয়াও মনকে অন্তঃকরণ আখ্যায় অভিহিত করিতে পারা যায়॥

স্বীকার করিলাম, বহির্জগতের সহিত আমাদের মনের পরিচয় হওয়া সম্ভবে, ও উল্লিখিত কারণ বশতঃ মনকে অন্তঃকরণ আখ্যায় অভিহিত করিতে পারা যায়, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, মন ও মনের অস্তিত্বে প্রমাণ কি ? প্রত্যক্ষ ?—না অনুমান ? যদি বল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা মন ও মনের অস্তিত্বটা প্রতিপন্ন হয়, ইহা কিন্তু সম্ভবাতীত। কারণ, বাহিরের স্থূল ঘটাদিবস্তুর মত মনকে আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই প্রমাণিত করিতে পারি * অর্থাৎ মন যদি চাক্ষুষ রাসন শ্রাবণ ত্বাচ ও ঘ্রাণ প্রত্যক্ষের বিষয় হইত, তাহা হইলে আমরা রূপাদির মত ঐ মনেরও চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। যেহেতু তাহা পারি না, সুতরাং

---

* অন্ধকারপূর্ণ গৃহে প্রদীপ রাখিয়া দিলে ঐ প্রদীপ স্বীয় রশ্মিজালের দ্বারা গৃহস্থিত বস্তুগুলির প্রকাশ করিয়া ঐ গৃহে অবর্তমান বস্তুগুলির অসত্তা বা অভাবটাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ গৃহে অবর্তমান বস্তুগুলি যদি বর্তমান থাকিত তাহা হইলে প্রজলিত প্রদীপ গৃহে বিদ্যমান নব বস্তুগুলির মত অবিদ্যমান বস্তুগুলিকেও আমাদের অনুভূতির সামনে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইত, এইরূপে, প্রদীপ যেমন গৃহে বিদ্যমান বস্তুগুলির প্রকাশ করিয়া অবিদ্যমান বস্তুগুলিকেও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলিও ঐরূপ রূপাদি ও রূপাদির অস্তিত্বটা প্রমাণিত বা প্রকাশিত করিয়া মন ও মনের অস্তিত্ব বিষয়ে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অসত্তা বা অভাবটাও বুঝাইয়া দেয়।

মনকেও কখন চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে প্রমাণিত করা যায় না ও মনের অস্তিত্বে চাক্ষুষাদি পঞ্চবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রয়োজনটাও অপেক্ষিত হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

তপস্বিনী রাবেয়া।

(ব্রহ্মচারী আনন্দচৈতন্য)

মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন,—"বাহ্য আকৃতি বাস্তবিক কিছুই নহে, ধর্ম্মনিষ্ঠাই সার। মনুষ্য মানসিক ভালমন্দ অবস্থানুসারে শুভাশুভ ফল লাভ করিবে। ধর্ম্মজগতে স্ত্রী-পুরুষে ভেদাভেদ নাই।"

পূর্ব্বে তুরস্ক দেশের অন্তর্গত বাসোরা নগরে কোন দরিদ্রের গৃহে রাবেয়া নামে অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কন্যার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার জনক-জননী উভয়েই লোকান্তর গমন করেন। পিতামাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বাসোরা নগরে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাবেয়া আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এক দুর্বৃত্ত তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় দেখিতে পাইয়া কয়েকটী তাম্রমুদ্রার বিনিময়ে একজন ধনবানের হস্তে সমর্পণ করে। সেই ধনীব্যক্তির প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর ছিল, রাবেয়াকে সাধ্যাতীত পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করিত; তিনি কোনরূপে তাহা সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। অনেক সময় তাঁহাকে বিষম নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। পরম বিশ্বাসিনী ঈশ্বরানুরক্তা রমণী রাবেয়া এইরূপ নিগ্রহ সহ্য করিয়াও দিবাভাগে গৃহস্বামীর পরিচর্য্যায় ও রজনীকাল ধর্ম্মপুস্তক পাঠে ও উপাসনায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইভাবে গত হইলে একদিন রাত্রিতে গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া—রাবেয়া যেন কাতরকণ্ঠে কি বলিতেছেন শুনিতে পাইল। রাবেয়া

নিভৃত কুটীরে প্রণতঃ হইয়া ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতেছিলেন, 'প্রভো! দয়াময়, আমারি মনের যা অভিলাষ তা সব একমাত্র তুমিই জান। তোমার মন্দিরে তোমার সেবাতেই যদি আমি অহর্নিশি নিযুক্ত থাকিতে পারিতাম তাহা হইলে কতই না আনন্দ হইত। তুমি আমাকে পরাধীনা দাসী করিয়াছ; দিবসের কঠোর পরিশ্রমের পর তাই রাত্রির এই নিভৃত কোলে তোমায় ডাকি, কিন্তু ইহাতে আমার মনের সাধ মিটে না। প্রভো! এমন দিন কি হইবে, যখন দিবানিশি তোমার শ্রীচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া থাকিতে পারিব।' নিস্তব্ধ নিশীথে রাবেয়া দীনভাবে ঈশ্বরচরণে এই প্রার্থনা করিতেছেন। গৃহস্বামী ইহা শুনিয়া শয্যা পরিত্যাগ করতঃ রাবেয়ার এই ব্যাপার দেখিয়া কিছুকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সে দেখিতে পাইল, কি এক স্বর্গীয় আলোক রাবেয়ার মস্তকোপরে প্রজ্বলিত হইতেছে, যাহার ছটায় সমুদয় গৃহ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে গৃহস্বামীর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল এবং একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল; পরে সে স্থির করিল যে এতাদৃশী পূজনীয়া রমণীকে নিজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া রাখিবে না। তাঁহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। পরদিন গৃহস্বামী রাবেয়াকে বহু শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়া বলিল, আপনি আজ হইতে দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করুন। যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমার গৃহেই থাকিতে পারেন, আমি দাস হইয়া আপনার সেবা করিব।' রাবেয়া প্রভুর অনুমতি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ও কঠোর তপস্যাতে আপনার জীবনকে নিয়োজিত করিলেন।

ধর্ম্মপুস্তকের আলোচনা, উপাসনা ও সাধনাতে রাবেয়ার দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে তিনি এক নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। পরে তিনি মক্কায় আগমন করেন ও তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল মক্কাতেই অতিবাহিত হয়। চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সেবায় সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

রাবেয়া সাধনবলে এরূপ উন্নত ধর্ম্মজীবন ও স্বর্গীয় প্রেমে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নামে সকলে মস্তক অবনত করিত। তাঁহারা দর্শন ও উপদেশবাক্য শ্রবণের জন্য তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম হইত। সকলেই তাঁহার জীবনের প্রভাব দেখিয়া ও তাঁহার মুখবিনির্গত তেজোময় বাক্য শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইত। একদা এক সাধুপুরুষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আপনার কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন,—'আপনি শরীরের বিবাহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমার শরীর কোথায়? এ শরীর যে ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিয়াছি, শরীর তাঁহার আজ্ঞাধীন, তাঁহার কার্য্যে রত।'

একদা বসন্ত ঋতুতে তপস্বিনী রাবেয়া একটি কুটীরে স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচারিকা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "আর্য্যে, একবার বাহিরে আসিয়া প্রকৃতির মনমোহিনী সজ্জা দর্শন করুন"। রাবেয়া উত্তর করিলেন, 'তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার শোভা সন্দর্শন কর।' কেহ একবার রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনি যে ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহাকে কি দেখিয়া থাকেন? তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি তাঁহাকে না দেখিতে পাইলে কখনই পূজা করিতাম না।'

একবার কোন ব্যক্তি মস্তকে পটি বাঁধিয়া রাবেয়ার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। রাবেয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ইহা কেন মাথায় বাঁধিয়াছ?' সে বলিল, শিরঃপীড়া হইয়াছে এইজন্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বয়স কত?' সে বলিল ত্রিশ বৎসর। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতকাল তুমি সুস্থ না অসুস্থ ছিলে?' সে উত্তর করিল সর্ব্বদা সুস্থশরীরে ছিলাম। রাবেয়া বলিলেন, 'এতাধিককাল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন মস্তকে বাঁধিলে না, একদিন যেই অসুস্থ হইয়াছ, অমনি গ্লানির চিহ্ন মস্তকে ধারণ করিয়াছ!'

একজন যোগী একবার রাবেয়ার নিকটে সংসারের গ্লানি সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করেন। রাবেয়া বলিলেন, তুমি অত্যন্ত সংসারপ্রেমিক, যদি তাহা না হইতে, তবে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া সংসারের প্রসঙ্গ করিতে না। সংসার-বিরাগী সংসারের ভালমন্দ লইয়া আলোচনা করে না, সংসারকে স্মরণ

করে না। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার প্রসঙ্গ অধিক করিয়া থাকে।"

রাবেয়া অনুক্ষণ আর্ত্তনাদ করিতেন। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিত, আপনার কি কোন অসুখ করিয়াছে, এরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছেন কেন ? তিনি উত্তর করিতেন, 'হাঁ আমার পীড়া হইয়াছে, তাহা হৃদয়ের অভ্যন্তরের পীড়া। সংসারের কোন চিকিৎসক সে পীড়ার ঔষধ জানে না। আমার রোগের ঔষধ কেবল একমাত্র তাঁহার দর্শন।'

রাবেয়া তাঁহার পীড়ার ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জীবনের শেষভাগ দিবারাত্রি ঈশ্বরানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। কি কুটীরবাসী, কি প্রাসাদবাসী সকলেই তাঁহার মত ঈশ্বরপরায়ণার সঙ্গলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মজীবনের পবিত্র স্মৃতি এখনও মুসলমান ধর্ম্মাত্মাগণের হৃদয়ের শ্রদ্ধামন্দিরে আনন্দদায়িনী রূপে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীশ্রীসারদা-মন্দির প্রতিষ্ঠা ও জন্মতিথি পূজা।

পরমশুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু—

আগামী ৬ই পৌষ ইং ২১শে ডিসেম্বর, বুধবার, পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর একোনসপ্ততিতম জন্মতিথি। বেলুড়মঠে এবং কলিকাতার বাগবাজার পল্লীস্থ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাটীতে (১নং মুখার্জ্জি লেন) তদুপলক্ষে বিশেষ পূজানুষ্ঠান হইবে। ভক্তগণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণমঠ ভূমিতে নির্ম্মিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্যও ঐ দিবস সম্পাদিত হইবে। পুরুষ ভক্তগণ বেলুড়মঠে এবং স্ত্রী ভক্তেরা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর বাটীতে আগমনপূর্ব্বক ঐ দিবস ৺দেবীর পুণ্য দর্শন ও প্রসাদলাভে ধন্য হইবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীব্রহ্মানন্দ।

বেদান্ত চর্চ্চা।

(শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুরী।)

(প্রতিবাদ)

গত আশ্বিন মাসের উদ্বোধনে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, মহাশয় লিখিত "বেদান্ত চর্চা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে লেখকের অল্পমাত্রও মনোগত ভাব বুঝিতে না পারায় এই প্রতিবাদরূপ "বাদ" অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা জিজ্ঞাসু; সুতরাং কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি অস্মদাদির পক্ষে স্বাভাবিক।

তিনি লিখিয়াছেন—"যিনি যাহাই বলুন না কেন অবিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করাই যে মানব জীবনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য একটু ধীরভাবে বিবেচনা করিলে সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ হইবে না।" অবশ্য লেখক যদি সুখ লাভকে মানব জীবনের "মুখ্যতম" উদ্দেশ্য এবং উহাকে "ধীরভাবে বিবেচনার ফল" না বলিতেন, তাহা হইলে আমাদের কোনই আপত্তি ছিল না; কিন্তু ঐরূপ বলায় আমাদের বিশেষ আপত্তি এই যে, সুখ লাভই যদি মানব জীবনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য হইবে, তাহা হইলে শ্রুতি ঐ মুখ্যতম উদ্দেশ্যকে "নেতি নেতি" বলিয়া বুঝাইয়াছেন কেন? যাহা "বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যদ্" যেখানে শ্রুতি "কেন কং বিজানীয়াৎ" বলিয়াছেন; সেখানে সুখের উপলব্ধি হইবে কি প্রকারে? উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য বিদ্যমান থাকিতে যে কেবল সুখেরই উপলব্ধি হইবে—দুঃখের নহে—এ কথাই বা কি করিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? মুক্তিকামী পুরুষ মুক্তির কামনায় মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে বলিয়া কি মোক্ষকে কামনারহিত বলা হইবে না? আর লেখকও যখন উক্ত প্রবন্ধে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের "নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে যাইয়া নিজেকেই হারাইয়া ফেলিল, সমুদ্রের খবর আর দিবে কে" বাক্য প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া

তদবস্থায় উপলব্ধির অভাব স্বীকার করিয়াছেন, তখন কি প্রকারেই বা ঐ সুখ তাঁহার উপলব্ধ হইল এবং উহাকে "ধীরভাবে বিবেচনার ফল" বলিয়া স্থির করিলেন? মিষ্টান্ন প্রিয় পীড়িত অবোধ শিশুকে সুস্থ করিবার জন্য পিতা মাতা যেমন ঔষধ খাওয়াইতে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া থাকেন, শ্রুতিও কি তদ্রূপ সুখের দাস অজ্ঞান জীবকে মাত্র তাহার স্বরূপের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্যই ঐ সুখের প্রলোভন দেখান নাই—যাহা পরমার্থতঃ সুখস্বরূপ নহে? এখন উহাকেই যদি সুখ বলিয়া মনে করা হয়, তবে তাহা কি "ধীরভাবে বিবেচনার ফল"—না মনোরথ মাত্র? মরু মরীচিকায় সলিল বোধ হইলে কি তদ্দ্বারা যথার্থ সলিলের কাজ হয়—না তাহা যথার্থ সলিল? *

তিনি লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান যে পদ্ধতিতে বেদান্ত আলোচিত হইতেছে তাহা প্রকৃতই ভয়াবহ।" তবে কি অমৃত পানে অনধিকারী বলিয়া বিষ পান করিতে দিলেই ভয় দূর হইবে? প্রকৃত রহস্য ঠিক বুঝিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া কি নিজেকে অনধিকারী জ্ঞানে উহা হইতে বিরত হইলেই অভয়ত্ব লাভ হইবে? লেখকেরই উক্ত প্রবন্ধ মধ্যে লিখিত "ছান্দোগ্যোপনিষদে একটী গল্প দেখিতে পাই—কয়েকজন শ্রোত্রিয় গৃহস্থ ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া একস্থানে মিলিত হন। কিন্তু বহু আলোচনায়ও প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহারা এক ব্রহ্মজ্ঞের শরণাপন্ন হন এবং ঐ তথ্য উপলব্ধি করিবার জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার করেন। অবশেষে এক ক্ষত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ রাজার কৃপায় তাঁহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া পরমানন্দ অনুভব করেন" এই শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্য হইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ শ্রোত্রিয় গৃহস্থদের বহু আলোচনা কি ভয়াবহ হইয়াছিল—যাহার ফলে

* সাধারণ মানবের আদর্শ যাহাই হউক কিন্তু তাহার প্রতি প্রাণস্পন্দের উদ্দেশ্য সুখ লাভ, কারণ দুঃখকামী হইয়া কেহই কখন কোনও কর্ম্ম করে না। বেদান্ত চর্চ্চার লেখক 'সুখ' অর্থে ইন্দ্রিয়জ সুখ বুঝেন নাই। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য"—শ্রুতির এই অর্থে তিনি 'সুখ' শব্দের অর্থ বুঝিয়াছেন। অতএব তাঁহার ঐরূপ লেখায় দোষ হয় না।—উঃ, সঃ।

তাহারা প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া অবশেষে প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন? এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রের প্রায় অধিকাংশ স্থলেই কি ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যাঁহারা অনধিকারী অবস্থায় শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শেষে উপযুক্ত গুরুর নিকটে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতকৃত্য হইতেছেন? সুতরাং লেখক উহাকে যতটুকু ভয়াবহ মনে করেন, উহা কি বাস্তবিকই ততটুক্ ভয়াবহ? লেখক ঐ স্থানে ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের "সুরসাল আম্রকাননের শাখা পত্র গণনা করিতেই আমাদের শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষিত হইবে, আম্ররসাস্বাদন কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না" বাক্যটী প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া লেখকের যুক্তি তাঁহাতে যতটুকু ভয়ের আরোপ করিয়াছেন তিনি কি উহাতে ততটুকু ভীত হইয়াছিলেন—যিনি তাঁহার শিষ্য মুখে "আপনি নোরু নোরু (বিবেকানন্দ) করে অস্থির হন, দেখুনগে—নোরু আজ আবার ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে একটা মহা হৈ চৈ কচ্ছে" শুনে "করবে বৈ কি! যতদিন ভ্রমরাটা ফুলের মধুর আস্বাদ না পায় ততদিনই সে বোঁ বোঁ করে ছুটে ছুটে বেড়ায়; কিন্তু যেই সে মধুর আস্বাদ পায় অমনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে পড়ে" এই উত্তর দিয়াছিলেন। আর লেখকও তাঁহার "বর্ত্তমানে বেদান্ত আলোচনার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে" এবং "প্রবন্ধে বক্তৃতায় ঐ একই ধারা" বাক্যে যতটুকু ভয়ের কারণ দেখাইয়াছেন, তাঁহার উক্ত প্রবন্ধেই লিখিত "বস্তুতঃ বিচার লব্ধ জ্ঞান যদি একটা নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ প্রদান করিতে সমর্থ না হয় তবে উহা যতই যুক্তি তর্ক সম্মত হউক না, প্রকৃত কার্য্যকরী হইতে পারে না। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি সূর্য্যোদয় বা আপ্ত বাক্য দ্বারা স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেও যেমন তাহার একটা মানসিক অশান্তি থাকিয়াই যায় উহাও তদ্রূপ" এই অংশের মধ্যে "প্রকৃত কার্য্যকরী হইতে পারে না" এবং "স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেও" বাক্য দুটী দেখিয়া তাঁহার লেখার ভাবে যতটুকু ভয়ের কারণ অনুদিত হয়, ততটুকু ভয়ের কারণ কি তাঁহার মনোমধ্যে

স্থান পাইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে? লেখক উহাকে "প্রকৃত কার্য্যকরী" বলিয়া না বুঝুন "কার্য্যকরী" বলিয়া কি বুঝেন নাই? আবার লেখক "সাধন সম্পন্ন না হইলে তিনি কিছুতেই বেদান্তের সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না! তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারেন কিন্তু তত্ত্বদর্শী হইতে পারিবেন না। তত্ত্বজ্ঞানীর একটা লক্ষণ এই যে তিনি বিষয়টী অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, পক্ষান্তরে তত্ত্বদর্শী বাগ্‌বিন্যাসে পটু নহেন" ইহা অপরিহার্য্য বলিয়া বুঝা সত্ত্বেও, সেই অপরিহার্য্যার্থে এত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? অতত্ত্বজ্ঞ অপেক্ষা কি তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ নহেন? তত্ত্বজ্ঞানী কি শেষে পূর্ব্বকথিত শ্রোত্রিয় গৃহস্থদের ন্যায় অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিলেও তত্ত্বদর্শী হইতে পারিবেন না? "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" কথাটী কি ঠিক নয়? নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় সারাজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে শেষে ব্রহ্মসংস্থ না হইলেও, শাস্ত্র উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীকে মাত্র বিদ্যা শিক্ষার্থ কেন দ্বাদশ বৎসর গুরু গৃহে বেদাধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন?

তিনি লিখিয়াছেন—"আজকাল এমন অনেক বেদান্ত বিশারদ দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে একান্ত অপরিচিত, এবং উপনিষদের নাম মাত্র হয়ত শ্রবণ করিয়াছেন, অথচ বর্ত্তমান যুগের তাঁহারাই বেদান্তের আচার্য্য। জীবনে যাঁহারা বেদান্তের একটী তথ্যও উপলব্ধি করেন নাই তাঁহারাই আজ খট্টারূঢ় হইয়া বীরবাস্ফোট করিতেছেন।" যদি সংস্কৃত ভাষা ও উপনিষদের সহিত সুপরিচিত হইতে পারিলেই বেদান্তের তথ্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে, তাহা হইলে শ্রুতি "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া" বলিয়াছেন কেন? সংস্কৃত ভাষার সহিত যাঁহার মাতৃভাষার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, সেই সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ভগবান্ যিশু কি করিয়া বেদান্তের চরম সত্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" উপলব্ধি করিয়া "I and my father are one" বলিয়াছিলেন?—কোন্ উপনিষদের চরম সত্য উপলব্ধির ফলে তিনি "for if ye belive not that I am he, ye shall die in your sins" বলিয়াছিলেন? কি করিয়া নিরক্ষর ভগবান্

রামকৃষ্ণদেব বেদান্তের মহোচ্চ সত্যগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং আচার্য্যরূপে স্বীয় সঞ্চারিত শক্তি দ্বারা বিবেকানন্দের মত বেদান্ত কেশরীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ব্যাকরণাদি সংস্কৃত ভাষা ও উপনিষদাদি যাবতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে বিশারদ হইয়াও নারদ কেন বেদান্ত সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শেষে ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন? কেন সত্যকাম ও উপকোশল উপনিষদাদি শাস্ত্রের সহিত একান্ত অপরিচিত থাকিয়াও স্বয়ংই তত্ত্বদর্শন করিয়াছিলেন? আর উপনিষদাদি শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান থাকিলেও যে তত্ত্বদর্শন করিতে পারা যায় না, তাহা কি লেখক তাঁহার "একটী সমস্যা উপস্থিত হইলে এ বিষয়ে অমুক ভাষ্যকার কি বলেন, অমুক টীকাকার কি বলেন, অমুক বৃত্তিকার কি বলেন ইত্যাদি নিরূপণ করিতে পারিলেই যেন সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল" এই বাক্য স্বীকার করেন নাই? আবার শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকাও যে দরকার, লেখকের "নারদ পঞ্চরাত্র নামক পুরাণে কোন বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার একটী অতি সুন্দর উপায় বর্ণিত আছে। সন্দিগ্ধ বিষয়টী গুরুর অনুমোদিত, স্বীয় অনুভবের গোচরীভূত এবং শাস্ত্র বাক্য সম্মত হইলে উহা সত্য, অন্যথা নহে" এই বাক্য কি তাহার প্রমাণ নহে? তবে কি শাস্ত্রের ঐ বহু আলোচনাকে দোষাবহ মনে করা যাইতে পারে?

লেখক কি তাঁহার "বেদান্ত চর্চা" শীর্ষক প্রবন্ধে বেদান্ত চর্চার ফল ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বলিয়া স্থির করিয়াছেন? তা যদি হয়, তবে শ্রুতি গুরুর বিশেষণে "শ্রোত্রিয়ম" ও "ব্রহ্মনিষ্ঠম্" এই দুইটী শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন কেন? লেখক সাধন সম্পন্ন হইবার জন্য যে শঙ্করের দোহাই দিয়াছেন, সেই শঙ্করই বা কেন তাঁহার বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে "এতয়োর্ম্মন্দতা যত্র বিরক্তত্ব মুমুক্ষয়োঃ। মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভাণ মুখত্রতা" বলিয়াছেন? যদি প্রকৃতির নিকট ক্রমাগত প্রতারিত হওয়ার ফলে "ন জাতুঃ কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি" বুঝিতে পারিয়া স্বতঃই বৈরাগ্যোদয় হয়, তবে উক্ত বৈরাগ্যের প্রাবল্যে

অর্থাৎ "পরবৈরাগ্য" কালে ঐহিক ও পারলৌকিক সমুদয় বিষয়েই সম্পূর্ণ রূপে নিঃস্পৃহ হওয়ায় কি স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না? শ্রুতিও কি সেই জন্যই "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ" বলেন নাই? আর লেখকও কি সাধন চতুষ্টয় বুঝাইতে যাইয়া "নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক" হইতে আরম্ভ করিয়া "মুমুক্ষা"র শেষ পর্য্যন্ত উক্ত সাধন গুলিকে স্বতঃই লাভ হওয়ার কথা বলেন নাই? এখন স্বতঃপ্রাপ্ত বৈরাগ্যের পরাবস্থায় যদি স্বতঃই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় এবং শত বেদান্তাধ্যয়নেও তাহা না হয়, তবে বেদান্ত চর্চ্চার ফল কি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার? অথবা বেদান্ত চর্চ্চা করিতে করিতে ক্রমে সংসারের অনিত্যতা অনুভূত হইয়া আসিলে বৈরাগ্যোদয় হইতে পারে বলিয়া বেদান্ত চর্চ্চার ফল—বৈরাগ্য লাভ?

লেখক "বর্ত্তমান প্রবন্ধে, বক্তৃতায় সর্ব্বত্রই বেদান্তের ধারা" দেখিয়া "বেদান্ত একটা নেহাৎ ছেলেখেলা হইয়া দাঁড়াইবে" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন! বেদান্ত যদি ছেলেদের ছেলেখেলা হইতে অতি বৃদ্ধের শেষ জীবনের চিন্তায় কার্য্যকরী না হইয়া জন কতক অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীর জীবনেই কার্য্যকরী হয়, তবে সেই প্রাচীন যুগে রাজ্ঞী মদালসা তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুকে "ত্বমসি নিরঞ্জনম্" বলিয়া দোল দিতেন কেন? কার্য্যবহুল রাজপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কেন শ্রীরামচন্দ্রকে ঐ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন? কোলাহল পূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান বাসুদেব অর্জ্জুনকে ঐ তত্ত্ব জানাইয়াছিলেন কেন? রাজ কার্য্যের শত ঝঞ্ঝাট সত্ত্বেও কেন রাজর্ষি জনকের রাজ প্রাসাদে মধ্যে মধ্যে ঐ তত্ত্বের আলোচনা হইত? কেন সেই অতীতের যুগে জীবনের চরম দশায় উহা সকলেরই আলোচ্য বিষয় ছিল? বেদান্ত যদি জন কতকের নির্জ্জন অরণ্যবাসেরই ফল হয়, তবে উহাকে কি সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে?

এখন লেখকের এই সব ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত বিরুদ্ধ বাক্য সমূহ হইতে তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া লওয়া কি অস্মদাদির ন্যায় জিজ্ঞাসুর পক্ষে আদৌ অসম্ভব নহে। সুতরাং এই প্রতিবাদরূপ "বাদ" অবলম্বন কি স্বাভাবিক নয়?

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অপকারীর উপরেই যদি তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় তবে (স্বয়ং) ক্রোধের উপরেই তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না কেন? ক্রোধ ত (তোমার) ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধন বিষয়ে প্রধান বিঘ্ন ঘটাইয়া (তোমার অপকার করে।)

ফলান্বিতো ধর্ম্ম যশোঽর্থনাশনঃ।
সচেদপার্থঃ স্বশরীর তাপনঃ॥
ন চেহ নামুত্র হিতায় যঃ সতাং
মনাংসি কোপঃ সমুপাশ্রয়েৎ কথম্॥

ক্রোধ সফল হইলেও, (অর্থাৎ অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে পারিলেও) ক্রুদ্ধব্যক্তির, ধর্ম্ম যশ এবং অর্থের বিনাশ করিয়া থাকে। ক্রোধ নিস্ফল হইলে, (অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে না পারিলে) কেবল ক্রুদ্ধব্যক্তির শরীরকেই সন্তাপ দিয়া থাকে। যে ক্রোধ ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্থানেই হিতকর নহে, সেই ক্রোধ কেন সাধুদিগের মনকে আশ্রয় করিতে পায়?

নিজের প্রতি অপরের ক্রোধ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

ন মেপরাধঃ কিমকারণে নৃণাং, মদভ্যসূয়েত্যপি নৈব চিন্তয়েৎ।
ন যৎ কৃতা প্রাগ্ ভব বন্ধ নিঃসৃতি, স্ততোঽপরাধঃ পরমো নু চিন্ত্যতাম্॥

"আমি ত কোনও অপরাধ করি নাই, অকারণে লোকের আমার প্রতি অসূয়া (অপরের গুণে দোষাবিষ্করণ এস্থলে ক্রোধ) কেন হয়?" এইরূপ চিন্তাকেও কখন মনে স্থান দিতে নাই। তুমি যে পূর্ব্বে জন্ম-মৃত্যুর "বন্ধন হইতে আপনার উদ্ধারসাধন কর নাই, এই হেতুই তোমার বিষম অপরাধ হইয়াছে" ইহাই চিন্তা কর। *

* শরীর ধারণ করিলেই কাহারও না কাহারও কোপে পড়া অনিবার্য্য।

নমোস্তু কোপদেবায় স্বাশ্রয়জ্বালিনে ভৃশম্
কোপ্যস্য মম বৈরাগ্যদায়িনে দোষবোধিনে ॥

ইতি—যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ২১

যে কোপদেব নিজের আশ্রয়দাতাকে প্রবলভাবে দগ্ধ করেন এবং আমি কাহারও কোপার্হ (কোপের পাত্র) হইলে, আমাকে (স্বকীয়) দোষ বুঝাইয়া দিয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করেন, সেই কোপদেবতাকে প্রণাম।

ধনাভিলাষ ও ক্রোধকে যেরূপ বিবেক দ্বারা অপনীত করিতে হয়, স্ত্রীপুত্রাভিলাষকেও সেইরূপ বিবেক দ্বারা বিদূরিত করিতে হয়; তন্মধ্যে বশিষ্ঠ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বিচার এইরূপে দেখাইয়াছেন :—(বৈরাগ্যপ্রকরণ ২১ অঃ)

মাংসপাঞ্চালি কায়াস্তু যন্ত্রলোহঙ্গপঞ্জরে
স্নায়স্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্ ॥১।

শিরাকঙ্কাল গ্রন্থিশালিনী মাংসপুত্তলী রমণীর (শকটাদি) যন্ত্রবৎ চঞ্চল অঙ্গসমষ্টিরূপ শরীরে প্রকৃতপক্ষে শোভার বস্তু কি আছে?

ত্বঙ্মাংস রক্ত বাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনে
সমালোকয় রম্যঞ্চেৎ কিং মুধা পারিমুহ্যসি ।২॥

রমণীর লোচনদ্বয় ত্বক্, মাংস, রক্ত, ও অশ্রুজল বিশ্লেষ করিয়া দেখ, তাহা মনোরম কি না। তবে কেন বৃথা মুগ্ধ হও।

মেরুশৃঙ্গতটোল্লাসি গঙ্গাজল রয়োপমা
দৃষ্টা যস্মিনৃস্তনে মুক্তাহার সোল্লাসশালিতা ।৫।
শ্মশানেষু দিগন্তেষু স এব ললনা স্তনঃ
শ্বভিবাস্বাদ্যতে কালে লঘুপিণ্ড ইবান্ধয়ঃ ॥৬।

যে রমণী পয়োধরে সুমেরু-শিখরভূমি সঞ্চারিণী মন্দাকিনী জলধারার ন্যায় মুক্তাহারের অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর হইয়া থাকে, কালে সারমেয়গণ তাহাই (পল্লীসমূহের) প্রান্তভাগে অবস্থিত শ্মশানে, ক্ষুদ্র অন্নপিণ্ডের ন্যায় রুচিপূর্ব্বক উদরস্থ করিয়া থাকে।

কেশকজ্জল ধারিণ্যো দুঃস্পর্শা লোচন প্রিয়াঃ
দুষ্কৃতাগ্নিশিখা নার্য্যো দহন্তি তৃণবন্নরান্ ।১১।

নারীগণ দুষ্কৃতিরূপ বহ্নির শিখা স্বরূপ। বহ্নি যেমন শিরোদেশে কজ্জল ধারণ করে ইহারাও সেইরূপ শিরোদেশে কেশ ধারণ করে। ইহারাও বহ্নির ন্যায় দুঃস্পর্শা ও লোচনপ্রিয়া, আর দেখ বহ্নি যেমন তৃণকে, ইহারাও তদ্রূপ পুরুষদিগকে দগ্ধ করিয়া থাকে।

জলতামতিদূরেঽপি সরসা অপি নীরসাঃ
স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনামিন্ধনং চারু দারুণম্ ॥১২।

দূরে প্রজ্জলিত বহ্নির ইন্ধনভূত দীর্ঘ কাষ্ঠ যেরূপ নিকটপ্রান্তে (অগ্নিসংযুক্ত প্রান্তে) রসক্ষরণ হেতু সরস দেখায়, কিন্তু দূর প্রান্তে (অগ্নিঅসংযুক্ত প্রান্তে) একেবারে নীরস, দূরবর্ত্তী নরকাগ্নির ইন্ধনরূপিনী নারীও সেইরূপ সম্মুখে (আপাততঃ) মনোরম এবং অন্তে (পরিণামে) দারুণ (অর্থাৎ সংসার যন্ত্রণার কারণ)।*

কামনাম্না কিরাতেন বিকীর্ণা মুগ্ধচেতসাম্
নার্য্যো নরবিহঙ্গানামঙ্গ বন্ধন বাগুরাঃ।১৮॥

মদন নামক কিরাত রমণীদিগকে মূঢ়বুদ্ধি পুরুষ বিহঙ্গের অঙ্গবন্ধন বাগুরারূপে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

জন্মপল্বল মৎস্যানাং চিত্তকর্দ্দমচারিণাম্।
পুংসাং দুর্ব্বাসনারজ্জুর্নারী বড়ীশ পিণ্ডিকা।২০॥

পুরুষগণ সংসারপল্বলের মৎস্য, চিত্তরূপ কর্দ্দম তাহাদের বিহারক্ষেত্র, দুষ্ট বাসনা সেই মৎস্য ধরিবার বড়িশ সূত্র, এবং রমণীগণ সেই বড়িশলগ্ন পিণ্ড (মাংস বা অন্নের টোপ)।

সর্ব্বেষাং দোষরত্নানাং সুসমুদ্গিকয়ানয়া
দুঃখশৃঙ্খলয়া নিত্যমলমস্তু মম স্ত্রিয়া।২৩।

রমণী সর্ব্ববিধ দোষরত্ননিচয়ের উৎকৃষ্ট সমুদ্গিকা (কৌটা) এবং দুঃখপালের বন্ধন শৃঙ্খল। এ হেন রমণীতে আমার প্রয়োজন নাই।

* রামায়ণের টীকাকার ইন্ধনে সরসতার সম্ভাবনা কোনও প্রকারে ঘটাইতে না পারিয়া, বলিয়াছেন "লোচনপ্রিয়" অগ্নিরূপ কার্য্য দেখিয়া ইন্ধনকে সরস এবং দহনরূপ কারণের (ফলের বা পরিণামের) নীরসতা দেখিয়া তাহাকে নীরস বলা হইয়াছে। ইহা কিন্তু কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়।

ইতোমাংসমিতোরক্তমিতোঽস্থীনিতি বাসরৈঃ
ব্রহ্মন্ কতিপয়ৈরেব যাতি স্ত্রী বিশরারুতাম্ ॥ ২৫ । *

হে ব্রাহ্মন্ (বশিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া রামের উক্তি) কামিনী কতিপয় দিবসের মধ্যেই এথানে মাংস, ঐথানে রক্ত, স্থানান্তরে অস্থি এইরূপ বিশীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক ভোগভূঃ
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্তং জগত্ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ ।৩৫।

যাহার স্ত্রী আছে, তাহারই ভোগ কামনা আছে, স্ত্রীবিহীন ব্যক্তির ভোগের স্থান কোথায়? রমণী পরিত্যাগ করিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয়, এবং জগৎ পরিত্যাগ করিলেই সুখী হওয়া যায়।

পুত্র সম্বন্ধে বিচার, ব্রহ্মানন্দ † গ্রন্থে (পঞ্চদশী ১২।৬৫) এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে :—

অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্ ।
লব্ধোঽপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥৬৫

পিতামাতা পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইবার পর যদি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত, পুত্র না জন্মিলেন তবে তিনি (না জন্মিয়াই) পিতামাতাকে ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। আর যদি গর্ভে তাঁহাকে পাওয়া গেল, তবে গর্ভপাত ঘটাইয়া অথবা প্রসববেদনা দিয়া তিনি পীড়া দেন।

জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ কুমারস্য চ মূর্খতা,
উপনীতেপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে ॥ ৬৬

যদি জন্মিলেন তবে শৈশবে পেঁচোয় পাওয়া প্রভৃতি রোগের ভয়, কৌমারে বুদ্ধিহীন হইবার ভয়, উপনয়ন হইবার পর গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী হইবার ভয়, বিদ্যালাভ হইবার পর পণ্ডিত হইলে (উপযুক্ত) পত্নী না যুটিবার ভয়।

---

* এস্থলে মূলের "বিশরারুতাং" (বিশীর্ণতাম্), এই পাঠানুসারেই অনুবাদ প্রদত্ত হইল। ২য় সংস্করণের "বিষচারিতাম্" পাঠ দুষ্ট।

† পঞ্চদশী গ্রন্থের শেষ ৫ অধ্যায় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল এবং ব্রহ্মানন্দ বলিয়া বিরচিত ছিল। উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

যূনশ্চ পরদারাদিঃ দারিদ্র্যং চ কুটুম্বিনঃ।
পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো ধনী চেন্ম্রিয়তে তদা॥

যৌবনে পরদারাসক্ত হইবার ভয়, এবং স্ত্রীপুত্রাদিপরিবার বেষ্টিত হইলে দারিদ্র্য অর্থাৎ তাহাদিগকে পালনে অসমর্থ হইবার ভয়; আবার যদি ধনী হইলেন তবে মরিয়া যাইবার ভয়, অতএব পিতামাতার দুঃখের অন্ত নাই।

বিদ্যা, ধন, ক্রোধ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি বিষয়ক মলিন বাসনার যেরূপ বিবেক (বিচার) দ্বারা প্রতীকার করিতে হয়, সেইরূপ অন্যান্য মলিন বাসনারও, যথোপযুক্ত শাস্ত্রের সাহায্যে ও নিজের যুক্তি দ্বারা তাহাদের দোষ বিচার করিয়া, প্রতীকার করিতে হইবে। এইরূপ প্রতীকার করিলেই জীবন্মুক্তিরূপ পরমপদ লাভ করা যায়। বশিষ্ঠদেব সেই কথাই বলিয়াছেন যথা:—

বাসনা সম্পরিত্যাগে যদি যত্নং করোষ্যলম্। *
তাত্তে শিথিলতাং যান্তি সর্ব্বাধিব্যাধয়ঃক্ষণাৎ॥

(উপশম প্রকরণ ৯২।৯)

বাসনাসমূহকে সম্যকপ্রকারে পরিত্যাগ করিতে যদি তুমি যথোপযুক্ত যত্ন কর, তাহা হইলে, তোমার শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার ক্লেশই মুহূর্ত্তমধ্যে শিথিল হইয়া যায়।

পৌরুষেণ প্রযত্নেন বলাৎ সন্ত্যজ্য বাসনা।
স্থিতিং বধ্নাসি চেত্তর্হি পদমাসাদয়স্যলম্॥

(উপশম প্রকরণ ৯২।৩-৪) †

পুরুষকার নামক প্রযত্নের দ্বারা বলপূর্ব্বক বাসনাসমূহ পরিত্যাগ

---

* মূলের পাঠ ২য় চরণে "করোষি"; ৩য় চরণে "তত্তে"। রামায়ণের টীকাকার বলেন উক্ত টীকার দ্বারা এবং 'মনোনাশে' এবং 'তৎ' শব্দ দ্বারা "তাহা হইলে" এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

† এই শ্লোকটি উক্ত অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকের শেষ দুই চরণ ও ৪র্থ শ্লোকের প্রথম ও চতুর্থ চরণ লইয়া গঠিত হইয়াছে। তন্মে মূলের পাঠ "বাসনা" স্থলে 'বাসনাম্', "চেত্তর্হি" স্থলে "তত্ত্বজ্ঞ"॥

করিয়া যদি স্থৈর্য্যলাভ করিতে পার, * তবেই তুমি সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইলে।

এস্থলে 'পুরুষকার নামক প্রযত্ন' এই শব্দগুলির দ্বারা নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্ত বিষয় দোষ বিচারকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এই প্রযত্নের প্রয়োগ করিলেও, ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহের প্রবল বেগ দ্বারা ইহা অভিভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন :—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥—(গীতা ২।৬০)

হে কৌন্তেয়, যেহেতু, বিবেকশীল পুরুষ প্রযত্ন করিতে থাকিলেও (অর্থাৎ তত্ত্বের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বিচারপ্রবণ মনে অবস্থান করিলেও) বিক্ষোভকারী ইন্দ্রিয় সমূহ তাঁহার মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু ইত্যাদি (৬১ শ্লোক)।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতিপ্রজ্ঞাং বায়ুর্ণাবমিবাম্ভসি॥—(গীতা ২।৬৭)।

[অযোগযুক্ত ব্যক্তির কেন জ্ঞান হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যে মন, স্ববিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সমূহের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তাহা সেই অযোগ-যুক্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞাকে হরণ করিয়া থাকে; বায়ু যেরূপ জলমধ্যস্থিত নৌকাকে গন্তব্য পথ হইতে বিতাড়িত করিয়া অন্য পথে প্রবর্ত্তিত করে সেইরূপ। তাহা হইলে এই কারণে বিবেক উৎপন্ন হইবার পর তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রিয় সমূহের নিরোধ করিতে হইবে। তাহাই তৎপরবর্ত্তী দুই শ্লোক দ্বারা বুঝাইতেছেন :—

তানি সর্ব্বানি সংযম্যযুক্ত আসীতমৎপরঃ
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।—(গীতা ২।৬।৬১)

(সেই হেতু) সেই ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়া সাধক সমাহিত হইয়া অবস্থান করিবেন এবং আমি বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহি এইরূপ

* মূলের পাঠানুসারে টীকাকারের ব্যাখ্যা—"তৎপদার্থের শোধন দ্বারা তাহার চরমাবস্থায় যে অখণ্ডৈকরস অবশিষ্ট থাকে তাহার সহিত শোধিত "ত্বম্" পদার্থের একতা সম্পাদন পূর্ব্বক চিত্তের নিশ্চলতা ঘটাইতে পার।

ধ্যান করিতে থাকিবেন। এইরূপে অভ্যাস দ্বারা যে যতির ইন্দ্রিয় সমূহ বশে আসিয়াছে, তাঁহারই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তস্মাদস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮।

সেইহেতু হে মহাবহো! যিনি শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করিতে পারিয়াছেন তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—[ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞত্ববিষয়ক সাধনের উপসংহার]।

অন্য স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো যতিঃ।
ন চ বাক্‌চপলশ্চৈবমিতি শিষ্টস্য লক্ষণম্॥

যাঁহার হস্তপদ চঞ্চল তিনি যতি নহেন, যাঁহার দৃষ্টি চঞ্চল তিনিও যতি নহেন, যিনি বাক্যপ্রয়োগে অসংযত তিনিও যতি নহেন। এইরূপে (অর্থাৎ হস্তপদাদির স্থৈর্য্য এবং বাক্‌সংযম দেখিয়া) শিষ্ট ব্যক্তিকে চিনিতে হয়।

এই কথাই স্থানান্তরে * স্বল্পকথায় বিবরণ সহ স্পষ্ট করিয়া বুঝান হইয়াছে,—

অজিহ্বঃ ষণ্ডকঃ পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।
মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড় ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ॥

যে ভিক্ষু জিহ্বাশূন্য, পুরুষত্ববিহীন, পঙ্গু, অন্ধ, বধির এবং বুদ্ধিহীন, তিনিই এই ছয়টি গুণের দ্বারাই মুক্ত হয়েন; তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতে
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে॥

* এই কয়েকটি শ্লোক গ্রন্থকার মাধবাচার্য্য কর্তৃক ব্যাখ্যাত পরাশর সংহিতার আচার কাণ্ডে দ্বিতীয়াধ্যায়ে (বোম্বাই সংস্করণের ১৮৫ পৃষ্ঠায়) মেধাতিথি বিরচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই মেধাতিথি মনুসংহিতার টীকাকার কি না তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। উক্ত টীকাকারের কোনও গ্রন্থময় গ্রন্থের উল্লেখ এযাবৎ কোথাও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু এই শ্লোকগুলি নারদ পরিব্রাজকোপনিষদে (৩।৬২-৬৮) দৃষ্ট হয়।

যিনি ভোজন করিয়াও—'এই বস্তু আমার অভিলষিত, ইহা আমার অভিলষিত নহে' এইরূপে কোনও ভোজ্য বস্তুতে আসক্ত (বা তাহার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত) হয়েন না, এবং যিনি হিতবাদী, সত্যবাদী ও মিতভাষী তাঁহাকেই জিহ্বাশূন্য কহে।

সৎকথা।

(স্বামী অদ্ভুতানন্দ)

ভগবানে দৃঢ় ভক্তি চাই! সংসারে ত সুখ-দুঃখ আছেই—ঐ দিক না ভুললেই সব দিক মঙ্গল।

কলিতে অন্নগত প্রাণ—খাওয়া পরা চাই। মন কিন্তু ভগবানের দিকে দেবে—এ কথা পরমহংস দেব বলতেন।

বিবেকানন্দ-ভাইকে নিয়ে এত কাণ্ড ও উন্নতি, তিনি বলেছিলেন—'ঠাকুরছাড়া উপায় নাই—তাঁর জীবন দেখে এত উন্নতি।'

শরীর নিয়ে সকলের সাথে সম্বন্ধ! শরীর সুস্থ থাকলে সব ভাল লাগে।

সংসারে একটা-না-একটা বখেড়া লেগেই আছে; ভগবানের কৃপায় ভালয় ভালয় মিটে গেলেই ভাল।

গুরু-স্তোত্র রোজ পাঠ করা খুব ভাল।

ভগবান ভিন্ন কোন উপায় নাই। তাঁর শরণাগত হওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে?

সংসার করলে নানা ঝঞ্জাট বইতে হয়।

রামলীলা বুঝা বড়ই কঠিন! ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্তশুদ্ধ না হ'লে বুঝা যায় না।

উদ্ধব-সংবাদ খুব ভাল। শ্রীভাগবতে যেখানে বৈরাগ্যের কথা আছে, সেই সব যারা পড়বে, তাদের কল্যাণ হবে।

সকল সময় ত ধ্যান, জপ করা যায় না—ঐ সব সৎ পুস্তক পড়া খুব ভাল।

যখন জন্ম হয়েছে, তখন সুখ-দুঃখ আছেই। তবে ওরই মধ্যে যতটা হয় ;—ভগবানের নাম নেওয়া ভাল।

সংসারের কায-কর্ম্ম দেখা আর পড়া-শুনা—এক সঙ্গে হয় না।

লাল কাপড় পরা, একটা ঢেউ উঠেছে ; কিন্তু কর্ম্ম নাই। *

কাশীতে লাল কাপড় পড়া কত—(কিন্তু) কর্ম্ম নাই।

কলিতে এরূপ ব্যায়ারাম (রোগ) হবে—পুরাণে আছে। †

বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকলেই তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) হুকুম মান্‌লেন,—আর বল্‌লেন, 'এই দেখেও যদি বিশ্বাস না হয়, তার নাম কর্ম্মফল।'

দেহ-মনের সুখ দুঃখ ত আছেই—তবুও জীব তাঁকে দুঃখ জানায় না।

জীব ভগবানকে শুধু ভালবাসা বশতঃই ডাক্‌বে—এরূপ খুবই বিরল—সন্দেহ নাই।

দুঃখ জানাতে শুনেছি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। তাঁর ধন জনের কিছুরই অভাব ছিল না, বাকী কি যে অভাব বোধ করতেন—তা আমরা কি বুঝ্‌ব!

তাঁর আদেশ পালন করেছিলেন—শ্রীকেশব সেন। বিজয় গোস্বামী, আর উপস্থিত কর্‌ছেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

তাঁকে দুঃখ জানাবে বৈ কি! সংসারত তিনিই লাগিয়েছেন। তাঁর সংসারের জন্য খাট্‌ছ—এইরূপ মনে করবে। তাঁকে দুঃখ জানাতে দোষ কি!

সংসারে ত অভাব ঘুচ্‌বে না—বেড়েই যাবে ; ওর জন্য ভেবে লাভ কি!

"শ্রীশ্রীরামচন্দ্র বলি দেন নাই। তাঁর হুকুম শুন্‌লে কল্যাণ হবেই হবে। * * * পূজার সময় হাত জোড় ক'রে শ্রীরামচন্দ্র প্রভুকে, মা দুর্গাকে দুঃখ জানাবে ; মা'ত সব জানেন। বলির কথা নিবেধ

* সাধন ভজন, ত্যাগ-তপস্যাদি আধ্যাত্মিক কর্ম্ম—নাই।

† ব্যায়ারাম (রোগ) শব্দটি অদ্ভুতানন্দজী ব্যবহার করিতেন।

করবে ; শুনে ভাল, না শুনে তুমি কি করবে। আপনার দুঃখ আপনি আনবে—তোমার কি ! বলির সময় ওখানে না-থাকলেই হ'ল—বলিতে কষ্ট হবার কথা। তিনি বুঝিয়ে দেন ত আনন্দের সহিত আপনিই বন্ধ ক'রে দেবে। মা দুর্গার কাছে জানাবে—'মা, আমিত নিষেধ করলাম, না-শুনলে আমি কি করব।' *

৺বিশ্বনাথের কৃপায় কাশীতে এসে বুঝে গেছ ত—সংসারে কোন সুখ নাই, কেবল, অশান্তি। খবরদার, বিশ্বনাথকে ভুল না ; বাবা বিশ্বনাথ দুঃখ বোঝেন। *

ধর্ম্ম-টর্ম্ম আর ত কিছু নয়। হিংসে যাবার জন্য ! হিংসার জন্য ভগবান কি জিনিষ বুঝতে পারে না ! অর্জ্জুন অত বড় ভক্তবীর শ্রীকৃষ্ণের কাছে থেকেও তাঁর উপর সংশয় ছিল, তা জীবের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম করাইয়া সংশয় দূর করেছিলেন, দুর্য্যোধনের কর্ম্ম করে সংশয় হয়েছিল।

ভগবান যাকে বাঁচান সেই বাঁচে।

বড় হইলেই কি বড় হওয়া যায় ! নিজে বড় হলে কি হয়। ভগবান যাকে বড় করেন সেই বড় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলেছেন আমি যা করবো তাই হবে, আমি ভগবান, আমার হুকুম তামিল হবেই। শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম আর অর্জ্জুনের কর্ম্ম এক হতে পারে ! অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের হুকুম প্রতিপালন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।

যার দ্বারা খেতে পাচ্ছো, তাকেই অগ্রাহ্য করে, ঘৃণা করে—সে ভগবানের কোথায় হুকুম মানিল—তার কাছে ধর্ম্ম কোথা। সে ভগবানের কাছে দোষী। এই জন্য অবতারেরা শরীর ধারণ করে জীব-শিক্ষার জন্য বাপ্ মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে দেখিয়ে গেছেন, হে জীব ! আমরা যখন বাপ্ মাকে ভক্তি করি, তোমরাও কর তা হলে তোমাদের কল্যাণ হইবে। তিনি বলতেন সাধু যতদিন থাকে ততদিনই জগতের কল্যাণ। সাধুর মহিমা ভগবান বুঝেন।

* ইহা দুর্গাপূজার সময় জনৈক ভক্তকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

ফুস মন্ত্রে কি হবে! একটা মন্ত্র বৈত নয়। সেই মন্ত্রের উপর বিশ্বাস না হলে ভগবানকে কোনকালে দেখা যায় নাই, তার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা হওয়া একি কম কথা! বাপ্ মাকে দেখেই ভক্তি হয় না।

দীক্ষাগুরু-শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু একজন হয়, আর শিক্ষাগুরু অনেক হয়। এমন দীক্ষা-গুরু আছেন যে তাঁর কৃপায় ভগবানের উপর ভালবাসা, বৈরাগ্য হয়।

যে ধর্ম্মপথে—ভগবানের পথে বাধা দেয়, তার মত শত্রু নেই। মায়া এমনি জিনিষ যে সত্যকে মিথ্যা বলে বোধ হয়, আর মিথ্যাকে সত্য বলে বোধ হয়। সব মায়ার খেলা। সকলেই যদি রাজা হবে তবে প্রজা হবে কে। সকলেই যদি সাধু হবে গৃহস্থ হবে কে! কেবল লাল কাপড় পরলেই হলো! ঠিক ঠিক বৈরাগ্য চাই। আদর্শ গৃহী এবং খাঁটি সাধু এক। যাহারা ঠিক ঠিক ভগবানকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন তাদের ইহজন্মেই ভগবৎদর্শন বা আত্মদর্শন হবে।

সর্ব্বদা গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে সংশয় রূপ অসুর ধ্বংশ হয়ে যায়!

অদ্বৈতভাব এলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না। আমার গুরু বড়, তোমার গুরু ছোট বলে ঝগড়া বিবাদ থাকে না। যত গোলমাল অদ্বৈতভাব না থাকা পর্য্যন্ত। অদ্বৈতভাব এলে দেখা যায় যে তোমার গুরু আমার গুরু তফাৎ নয়।

ধর্ম্ম এক শরীরে হয় না, এ শরীরে কিছু হলো পরে কিছু হলো।

সকলেই কি ভগবানকে জানতে পারে! ভগবান যাকে জানান সেই জানে।

তেজী লোকের দোষ ধর' না শুক ভগবান বলেছেন—তেজী লোকের দোষ ধরা অন্যায় কারণ সে কি ভাবে কোন কোন কাজ কচ্ছে তা কে বলবে। তাই তেজীলোকের দোষ ধরতে নাই।

যার দ্বারা কল্যাণ হয় তাকেই মানা উচিৎ। সেই হলো সর্ব্বস্ব। তা সে বড় লোকই হউক আর গরীব লোকই হউক না কেন? উপকারীই হলো [illegible]।

সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়।

কর্ম্ম-কল্পতরু—১ম ও ২য় ভাগ—শ্রীতমোনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। হিন্দুসমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের সহিত যাঁহারা সাধারণ ভাবে এবং সহজ ভাষায় পরিচিত হইতে চান তাঁহাদের এই পুস্তক অবশ্য পাঠ্য। ১ম ভাগের মূল্য আট আনা এবং দ্বিতীয় ভাগের মূল্য বার আনা। বজ্রযোগিনী সারস্বত সমিতি হইতে প্রকাশিত।

বিদ্যাসাগর—ইংরাজী পুস্তক শ্রীঅনন্তকুমার রায় প্রণীত। ইহাতে সরল ইংরাজী ভাষায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাল্যজীবন, পাঠ্যাবস্থা, এবং তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে গৃহীত হইতে পারে। মূল্য এক টাকা, আট আনা। প্রাপ্তিস্থান ৩৮নং পঞ্চানন ঘোষের লেন, কলিকাতা।

রাজনীতি—শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত। হিন্দুর রাজনীতি সম্বন্ধে এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্বে আর বাহির হয় নাই। হিন্দুরা কি উচ্চ আদর্শ ও মনুষ্যত্ব লইয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালন করিতেন এবং বর্ত্তমান স্বার্থলোলুপতায় পূর্ণ পাশ্চাত্য সমাজ ও রাষ্ট্র নীতি উহার তুলনায় কত নিম্নস্থান অধিকার করে তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে মন্ত্রী, সভাসদ্, রাষ্ট্রীয় শাসনের আদর্শ, রাজগুণ ও রাজ্যাধিকারী সম্বন্ধীয় ভারতীয় মতাদর্শের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্লেট, এরিষ্টটল প্রভৃতি প্রাচীনকালের, হবস, স্পিনোজা, লক প্রভৃতি মধ্য যুগের এবং হেগেল, কোম্‌ট, স্পেনসার প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় নীতিবাদীদের মত আলোচনা করা হইয়াছে। পরে তৃতীয় অধ্যায়ে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম, রাজার ব্যক্তিগত নিয়ম, যুদ্ধ ঘোষণার কাল, যুদ্ধযাত্রার বন্দোবস্ত, যুদ্ধকালে সাধারণ কর্ত্তব্য, মিত্র ও উদাসীনের গুণ, শত্রু, আভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা, ভূমির অধিকারী,

রাজার অধিকার, শাসনতন্ত্র, কর্ম্মচারী, ব্যবস্থা ও বিচার বিভাগ, কর্ম্মচারীর বেতন, চর নিয়োগ, জনহিতকর কার্য্য, লোকের প্রতি ব্যবহার—দণ্ড বা শাস্তি প্রদান, শিক্ষা প্রভৃতির ভারতীয় মতানুশাসনে বিশেষত্ব দেখান হইয়াছে।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাং চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥" মনু ৭।১৭।

অর্থাৎ "রাজদণ্ডই রাজা, পুরুষ, নেতা এবং শাসক; সেই রাজদণ্ডই চতুর্ব্বর্ণের, আশ্রমের এবং ধর্ম্মের প্রতিভূ।" কিন্তু,—

অধর্ম্মদর্শী যো রাজা বলাদেব প্রবর্ত্ততে।
ক্ষিপ্রমেবাপসাতোঽস্মাদুভৌ প্রথমা মধ্যমৌ॥ ৮
অসৎ পাপিষ্ঠ সচিবো বধ্যো লোকস্য ধর্ম্মহা।
সহৈব পরিচারেণ ক্ষিপ্রমেবাবসীদতি॥ ৯

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম পর্ব্ব—বামদেব গীতা—৯২ অধ্যায়।

অর্থাৎ "যে রাজার মন্ত্রী অসৎ ও পাপিষ্ঠ, যে রাজা ধর্ম্মনাশকারী, সে রাজা বধ্য।" ভারতীয় ঐতিহসিক যুগারম্ভেও যে এই মত প্রবর্ত্তিত ছিল তাহা আমরা পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ চন্দ্রকীর্ত্তি বাক্যে দেখিতে পাই, "গণদাসস্য তে গর্ব্বঃ ষড়ভাগেন ভৃত্যস্য কঃ।" আপনি গণদাস। আপনি দেশের লোকের ভৃত্য, ছয় ভাগের এক ভাগ আপনার মাহিয়ানা; আপনার এত গর্ব্ব কেন?" মেধাতিথি তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "দণ্ডেনৈব নিহন্যতে প্রকৃতি কোপেনাদৃষ্টেন বা দোষেণ" অর্থাৎ দণ্ড দ্বারাই নিহত হন—প্রজার পাপে অথবা অদৃষ্টদোষে। বৃদ্ধ মনু দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বেণ, পিজবন পুত্র সুদা, সুমুখ ও নিমি রাজা নীতি ভঙ্গ দোষে নষ্ট হন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। রাজার প্রধান কর্ত্তব্য,—

রাজ্ঞোহি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠা।
ভৃত্যাঃ ভবন্তি প্রায়েন তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥
যে কার্য্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্নীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্॥ মনু ৭।১২৩।১২৫।

"রাজভৃত্য, কর্ম্মচারিবর্গ প্রায়ই পরস্ব গ্রহণশীল এবং বঞ্চক হয়। তাহাদের কুত্যাচার হইতে সর্ব্বদাই প্রজাগণকে রক্ষা করিবে। যাহারা বাদি-প্রতিবাদিগণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব রাজসরকারে 'বাজেয়াপ্ত' করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে।" শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"সাধূন্ সন্মানয়েদ্ রাজা বিপরীতাংশ্চ ঘাতয়েৎ।
উৎকোচ জীবিনোহীনদ্রব্যান্ কৃত্বা বিবাসয়েৎ॥"

অর্থাৎ "রাজা সাধুর সন্মান এবং তদ্বিপরীতের নাশ এবং উৎকোচ-গ্রাহীর সর্ব্বস্ব 'বাজেয়াপ্ত, করিয়া বিতাড়িত করিবেন।"

"অধর্ম্ম-দণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তি নাশনম্।
অস্বর্গ্যং চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

মনু। ৮।১২৭

"অধর্ম্ম পূর্ব্বক—অন্যায় পূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিলে ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তিনাশ হয় এবং পরোলোকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব ইহা পরিত্যাগ করিবে।"

"অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাং শ্চৈবাপ্য দণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকং চৈবগচ্ছতি॥"

"অদণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে ও প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ড না দিলে অযশ ও নরক প্রাপ্তি ঘটে। 'অধর্ম্ম দণ্ডনং' এই বাক্যের অর্থ,—ধর্ম্ম-শাস্ত্র না মানিয়া কেবল রাজার ইচ্ছায় অথবা রাজদ্বেষ বশে শাস্তি প্রদান করা।"

রাজার অতি যত্নের সহিত প্রজা পালন করা কেন কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—

"অরক্ষ্যমানাঃ কুর্ব্বন্তি যৎ কিঞ্চিত কিল্বিষং প্রজাঃ।
তস্মাত্তু নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্ গৃহ্ণাত্যসৌ করান্॥"

"প্রজা অরক্ষিত হইয়া যে পাপ অনুষ্ঠান করে, নৃপতি সেই পাপের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হন। কারণ নৃপতি প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন।"

যে রাজ্যের অধিনায়ক এই মূল সূত্রগুলি না মানিয়া চলেন হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী তাহা রাজ-তন্ত্র বা প্রজা-তন্ত্র কিছুই বলা যাইতে পারে না—উহাকে দস্যুতন্ত্র আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ রাজা কখন প্রজার উপরি কোনও প্রকারের জুলুম করিতে পারেন না। এ বিষয়ে শ্রীকাত্যায়ন বিধান দিতেছেন,—

ভূস্বামী তু স্মৃতো রাজা নান্য দ্রব্যস্য সর্ব্বদা।
তৎ ফলস্য হি ষড়্ভাগং প্রাপ্নুয়ান্নান্যথৈব তু॥
ভূতানাং তন্নিবাসিত্বাৎ স্বমিত্বং তেন কীর্ত্তিতম্।
তৎ ক্রিয়া বলিষড়্ভাগং শুভাশুভ নিমিত্তজম্॥

"রাজা ভূস্বামী, কিন্তু অন্য দ্রব্যের স্বামী নহেন অর্থাৎ ভূমি জাত বস্তু সকলের মালীক নহেন। উৎপন্ন দ্রব্যের ষড়ভাগ রাজার প্রাপ্য; অন্য কিছুই নহে। প্রাণীগণই (প্রজাগণই) ভূমির নিবাসী ও ভূমিজাত তাহাদেরই অধিকার। তাহাদের রক্ষক বলিয়াই রাজা স্বামী ও উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশভাক্।" মেধাতিথি ঋষি মনুর ভাষ্যে বলিতেছেন,—

"সর্ব্বজনোপভোগ্যা কেবলং রাজানোরক্ষানির্দ্দেশমাত্রভাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ" "ভূমি প্রজার! ভূমি সর্ব্বজনোপভোগ্য। রাজা কেবল রক্ষক।"

পুস্তকের মূল্য দেড় টাকা। প্রাপ্তি স্থান—সরস্বতী পুস্তকালয়, ৯নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ কার্য্য।

খুলনার বস্ত্রাভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্নাভাবও ভীষণতর হইতেছে। অন্নাভাবে লোকে নানাপ্রকার কদর্য্য শাক সবজি ও নদীর ছোট ছোট কাঁকড়া সিদ্ধ করিয়া খাওয়ায় উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত পরিবার কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, এখন তাহারা খাদ্যাভাবে কর্ম্মাভাবে নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছে। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র

নাই, তাহার উপর শীতের প্রকোপ, ইহাতে যে খুলনার নর নারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বস্ত্রাভাব এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, অনেক স্ত্রীলোক পরিধানে কোনরূপ বস্ত্র না থাকায় বাটীর বাহিরে আসিয়া চাউল লইতে পারিতেছে না। যে সমস্ত বিপন্ন নর-নারী সাহায্য কেন্দ্র হইতে চাউল লইতে আসিতেছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শতগ্রন্থি বস্ত্র পরিয়া আসে। ইহাদের সাহায্যার্থে আমরা বহু নূতন ও পুরাতন বস্ত্র পাঠাইয়াছি ও বর্ত্তমানে ১২ই অক্টোবর হইতে শ্যামনগর থানার অন্তর্গত ৭৬ খানি গ্রামে ২৭৪৯ জনের মধ্যে ১৩৭ মণ ১৮ সের চাউল বিতরণ করিতেছি। পূর্ব্বে আমাদের প্রতি সপ্তাহে ৬০০ শত টাকা খরচ হইতেছিল, এখন গ্রামসংখ্যা ও লোক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রতি সপ্তাহে ৮০০ শত টাকা ব্যয়িত হইবে। আশা করি যে সহৃদয় জনসাধারণ এই দুঃস্থ নর-নারীবর্গের সাহায্যকল্পে নূতন বা পুরাতন বস্ত্র ও অর্থ প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

নিম্ন লিখিত ঠিকানায় সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে।

১। উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখার্জ্জির লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়, হাওড়া।

স্বাঃ—সারদানন্দ, সেক্রেটারী।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে জানাইতেছি যে নিম্নলিখিত সহৃদয় ব্যক্তিগণ খুলনা দুর্ভিক্ষকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। জুন ১৯২১ সাল।

	টা	আ	পা
শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, রাঙামাটি,	[illegible]	[illegible]	[illegible]
" " শরৎচন্দ্র বসু, কলিকাতা	২০	০	০
" " কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	৬	০	০
" " রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নৈহাটি	৫	০	০
সেক্রেটারী, পুওর ব্রাদার্স ক্লাব, বড়বাজার	২২	০	০
" ফ্রেণ্ডস, " " শিয়ালদহ	১১	৪	০
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ ব্যানার্জি, কলিকাতা	[illegible]		

সেক্রেটারী, বেঙ্গল পুওর রিলিফ্ ফণ্ড, বর্ম্মা	২৩	২	০
শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, রাঙ্গামাটি	২০	০	০
" " পতিতপাবন পাল, কলিকাতা	৭৫	০	০
" " ত্রৈলোক্য নাথ দে, ময়মনসিংহ	৩	০	০
বগুড়া পাবলিক্	৩০	০	০
মোট—	২৪০	৬	০

জুলাই ১৯২১ সাল

	টা	আ	পা
জনৈক ভৃত্য	১	৫	৬
এম্, এল গোঁসাই, পেগু	৪	০	০
বগুড়া পাবলিক,	৫	০	০
তারকনাথ বসু, ডায়মণ্ড হারবার	৫	০	০
কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী, কলিকাতা	৫	০	০
বগুরা পাবলিক্	৮	০	০
ডি, আঢ্য, আলিপুর	১০	০	০
বগুরা পাবলিক্	১৫	০	০
মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, রাঙ্গামাটী	২০	০	০
টি, দাস, রামপুর	১০	০	০
ডি, পাল, কলিকাতা	৫	০	০
বিহারীলাল বসু, কলিকাতা	০	১২	০
সুরবালাদেবী, রাজসাহী	৫	০	০
স্বরাজ সহায় সমিতি, কলিকাতা	৬	০	০
এ, সি, দত্ত, কৃষ্ণনগর	৩০	০	০
ধর্ম্ম দাস, সাকার	৫০	০	০
কৃষ্ণপদ দত্ত, বার্ম্মা কোং, হাওড়া	৩৪	৩	০
নগেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত	১৫	০	০
কে, মুখার্জ্জি, পোর্টব্লেয়ার	১০	০	০
দীনেশ গাঙ্গুলী, [illegible]	১	০	০

এন্, কে, সেনগুপ্ত	৫০	০	০
বগুড়া, পাবলিক্	১০	০	০
সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মানভূম	১৪	০	০
ভুবনমোহন বসু, বৰ্দ্ধমান	৩৮	০	০
বগুড়া পাবলিক্	১০	০	০
ইউ, কে, মিত্র, কলিকাতা	২	০	০
শিবনন্দন লাহাড়ী, সাহাবাদ	২	০	০
বগুড়া পাবলিক	১০	০	০
পি, এন, রায়, মুর্শিদাবাদ	২	০	০
পঙ্কজকুমার আইচ	২	০	০
বগুড়া পাবলিক্	৭	০	০
মোট—	৩৮০	৪	৬

আগষ্ট ১৯২১ সাল।

	টা	আ	পা
শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস মল্লিক, কলিকাতা	৫	০	০
" " এম্, এল্ গোঁসাই, পেগু	১০	০	০
" " শিবনন্দন লাহোলী, সাহাবাদ	৩	০	০
জনৈকা দাসী	২৫	০	০
" " দুর্গাপদ বানার্জি, বহুবাজার	[illegible]	০	০
" " মনোরঞ্জন ঠাকুর, ময়মনসিংহ	১	০	০
" " সজীবেন্দ্রভূষণ মুখার্জ্জি, কলিকাতা	৫	০	০
" " চণ্ডীদাস মুখার্জি, কলিকাতা	[illegible]	০	০
" " আশুতোষ ঘোষ, বগুরা	৬	[illegible]	০
" " এ, সি লাহিড়ী, কাইক্লাট	৮৯	০	০
" " কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ	৫	০	০
" " হৃষীকেশ ঘোষ, শ্যামবাজার	২০	০	০
" " হেমন্তকুমার মজুমদার	২০	০	০
মোট—	[illegible]৫০	০	[illegible]